শনিবারের চিঠি

রবীন্দ্র-সংখ্যা

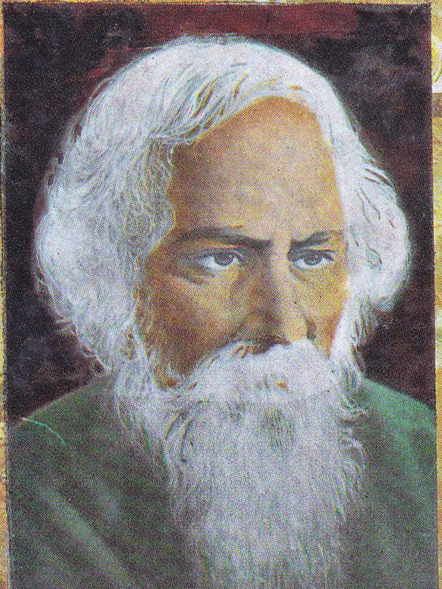

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

স্ক্যান ঃ রূপালী গোশাভী

হার্ডকপি ও এডিট ঃ সুজিৎ কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

শনিবারের চিঠি

রবীন্দ্র - সংখ্যা

শনিবারের চিঠি

রবীন্দ্র-সংখ্যা

শনিবারের চিঠি

রবীন্দ্র-সংখ্যা

সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত

রবীন্দ্র-সংখ্যার পুনর্মুদ্রণ

নাথ পাবলিশিং ।। কলকাতা

প্রচ্ছদপট ।। গৌতম রায়

নাথ পাবলিশিং-এর পক্ষে সমীরকুমার নাথ ২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস কলকাতা ৭০০০২৯ কর্তৃক প্রকাশিত এবং গৌতম রায়, পারফেক্ট প্রিন্ট ও প্রসেস, ১/১বি ড. অমল রায়চৌধুরী লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।

৪০ টাকা

প্রকাশকের কথা

তিপ্পান্ন বছর আগে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে রবীন্দ্র-প্রয়াণের দু মাস পরে শনিবারের চিঠির রবীন্দ্র-সংখ্যা সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। অনেক বেশী সংখ্যায় ছাপা হলেও পাঠক ও সংগ্রহকারীদের আগ্রহে অতি দ্রুত তা নিঃশেষ হয়ে যায়। দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনেকে সংখ্যাটি সংগ্রহের জন্য পত্রিকা-কর্তৃপক্ষের কাছে নানাভাবে খোঁজ করতে থাকেন। কিন্তু পুনর্মুদ্রণ করা আর সম্ভব হয়নি। তারপর অর্ধশতাব্দীকাল পার হয়ে আরও তিনটি বছর কেটে গেল—এতদিন পরে আমরা এই কাজ সম্পন্ন করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দবোধ করছি। রবীন্দ্র-বিয়োগের পর শনিবারের চিঠির এই সংখ্যাটি তত্ত্ব ও তথ্যের দিক দিয়ে বিচার করে সমস্ত পত্র-পত্রিকার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। বিদগ্ধ মনীষিদের রচনায় সমৃদ্ধ রবীন্দ্র-সংখ্যা শনিবারের চিঠি এ যুগের পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে বলে আমরা নিঃসন্দেহ।

পাঠকেরা অবগত আছেন শনিবারের চিঠির যাবতীয় রচনার মধ্য থেকে গল্প প্রবন্ধ ব্যঙ্গরচনা কবিতা ও সংবাদ-সাহিত্য বাছাই করে আমরা এক একটি সংকলন প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছি। কিন্তু রবীন্দ্র-সংখ্যার রচনাগুলিকে এই সংকলন-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না বলেই এটির হুবহু পুনর্মুদ্রণ করা হল।

সমীরকুমার নাথ

সূচী

রবীন্দ্র-সংখ্যা

ক্ষণিকা	৭৩৮
লেখন	৭৪১
আবহাওয়া	৭৪২
তর্পণ	৭৪৬
রবীন্দ্রনাথের একটি দান	৭৫০
মানস-হংস	৭৫৬
রবীন্দ্রনাথ	৭৫৭
মৃত্যুর আলোকে রবীন্দ্রনাথ	৭৬০
চিত্রশিল্পীর রবীন্দ্রনাথ	৭৭৮
মর্ত্ত্য হইতে বিদায়	৭৮৫
লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথ	৭৯৪
২২এ শ্রাবণ, ১৩৪৮	৮০৬
তর্পণ	৮০৯
শেষ কথা	৮১১
একটি দিনের ঘটনা	৮১২
'গল্পগুচ্ছে'র এক দিক	৮১৬
রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ	৮২২
রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী	৮২৬
ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ	৮৩৩
যজ্ঞভস্ম	৮৫৩
চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ	৮৫৫
রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী	৮৬৪
রবীন্দ্রনাথ ও সেন্সাস	৮৯১
রীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-সৃষ্টি	৮৯৩
রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ	৮৯৭
অন্তরীক্ষে	৯২৬
চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ	৯৪৯
রবীন্দ্রনাথের ছবি	৯৫১
বিজ্ঞপ্তি	৯৫২

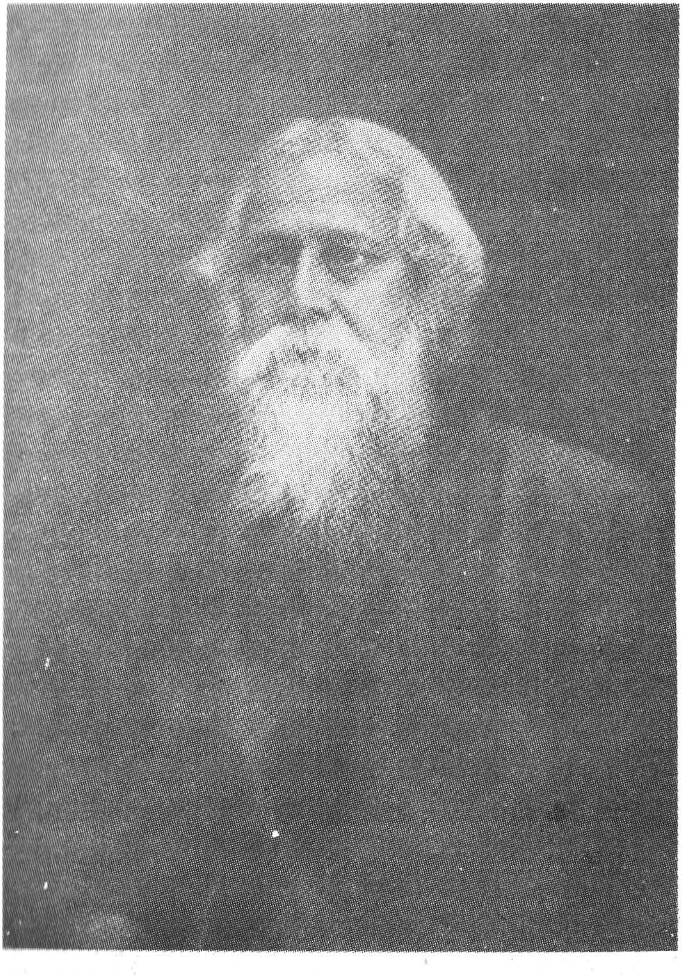

শিলাঙ, বিজয়া দশমী, ১৩২৬

'চিত্রাঙ্গদা'র ছবি সম্বন্ধে পরামর্শরত রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ
(১২ আগষ্ট ১৮৯২)

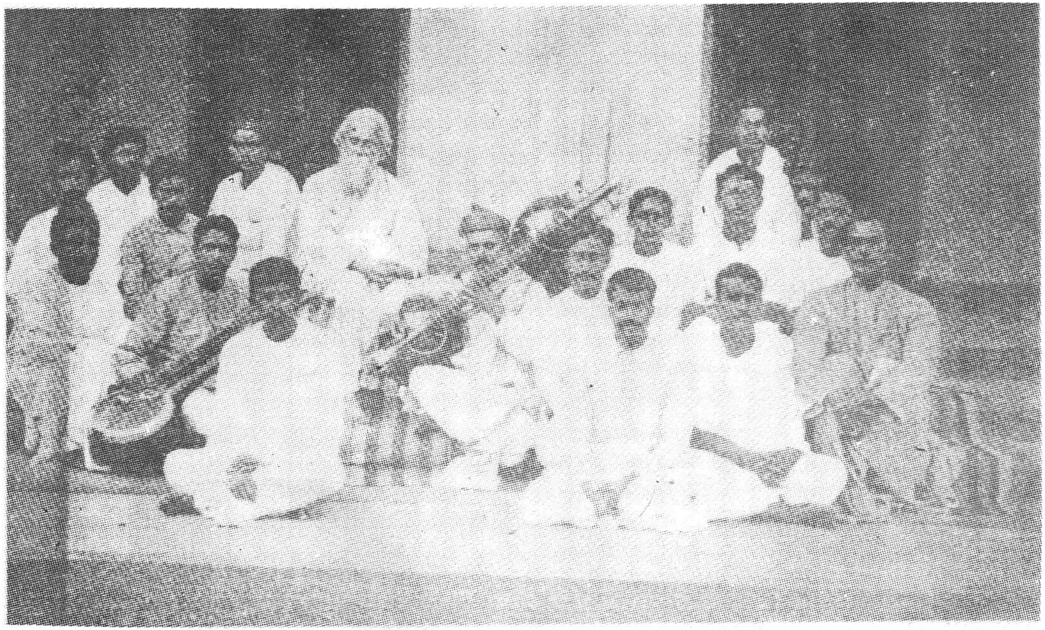

শান্তিনিকেতনে গানের দল

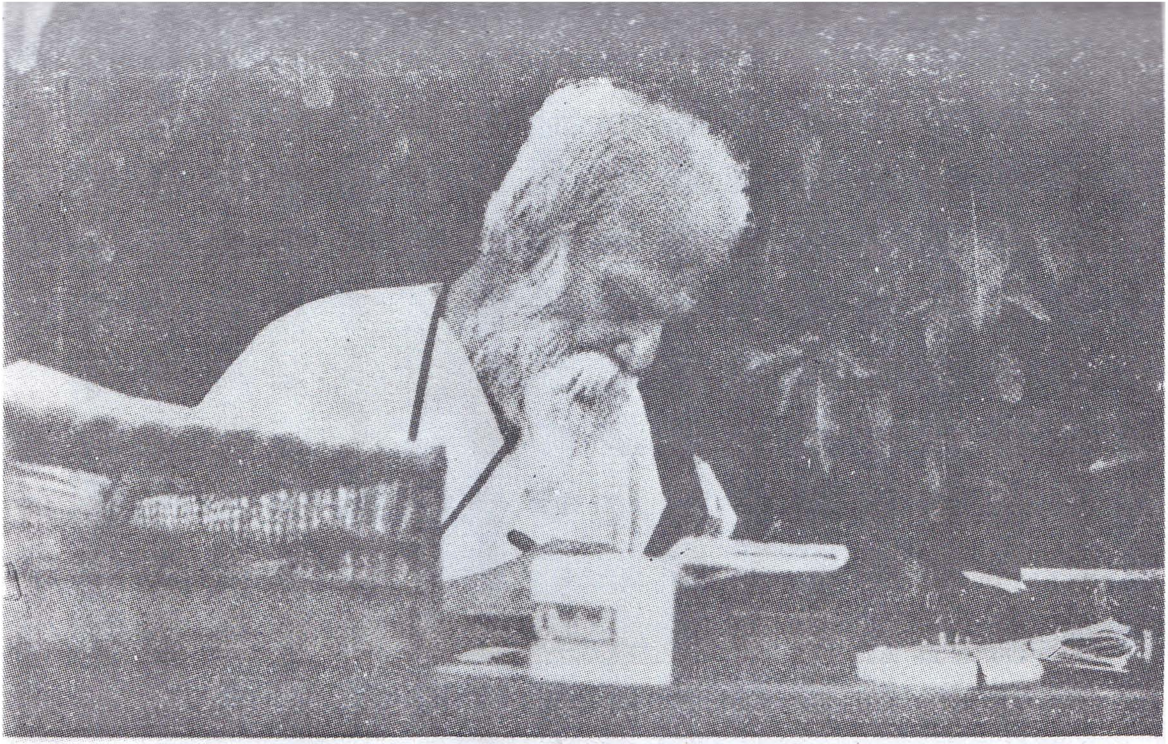

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

রামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথ

"প্রথম আলোর চরণধ্বনি"

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্যের সৌজন্যে

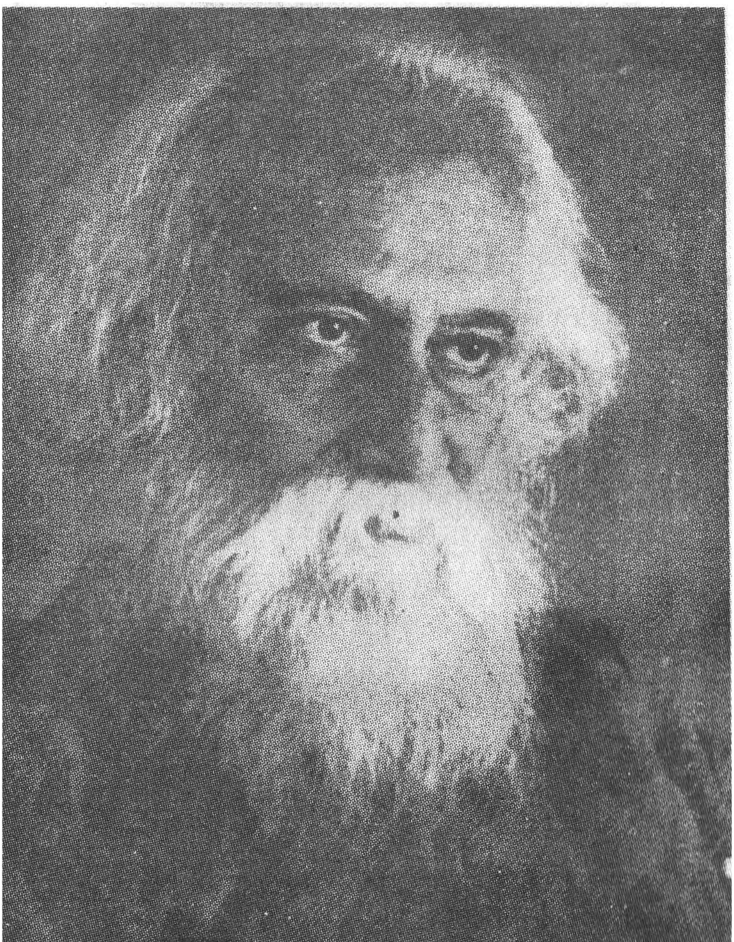

শ্রীশম্ভু সাহার সৌজন্যে

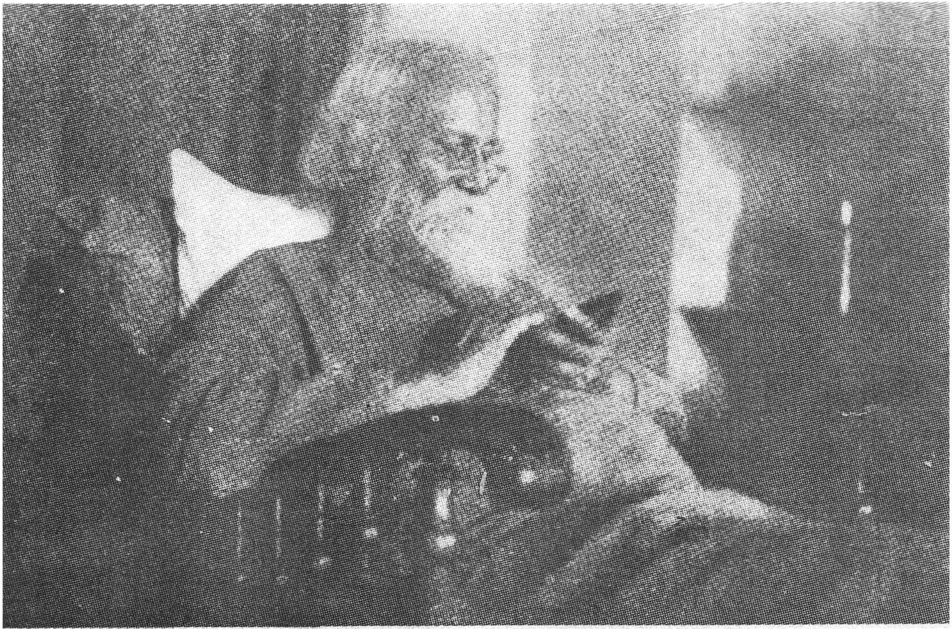

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্যের সৌজন্যে

চন্দননগর সাহিত্যসম্মিলনে রবীন্দ্রনাথ

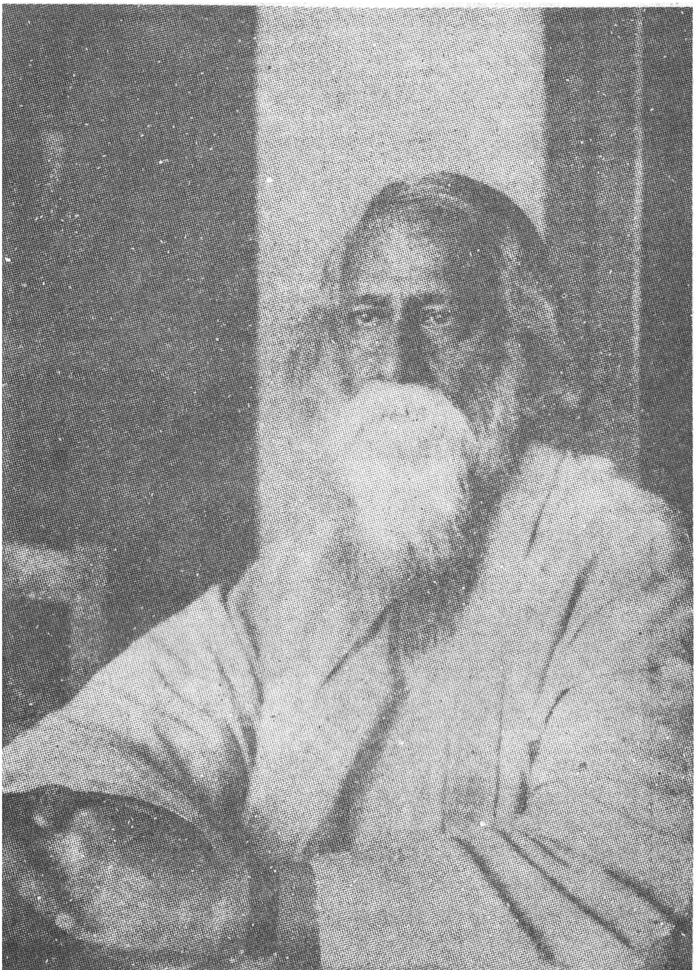

১২ জুন ১৯২০ তারিখে লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রাবাসে রবীন্দ্র-স্বাগত-সভা

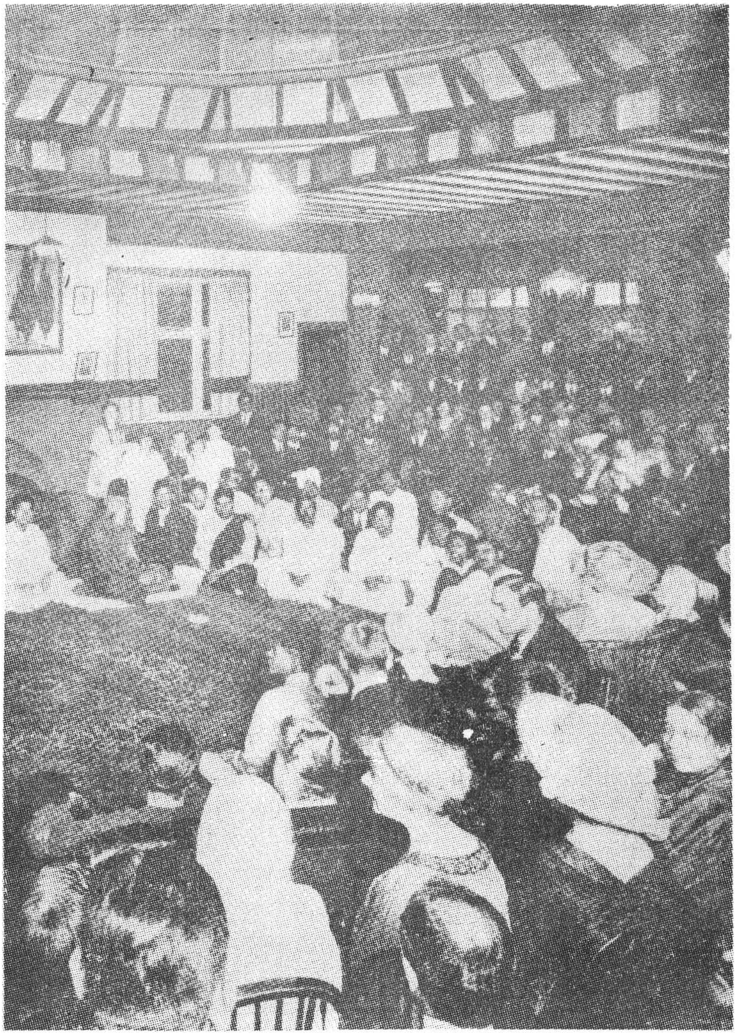

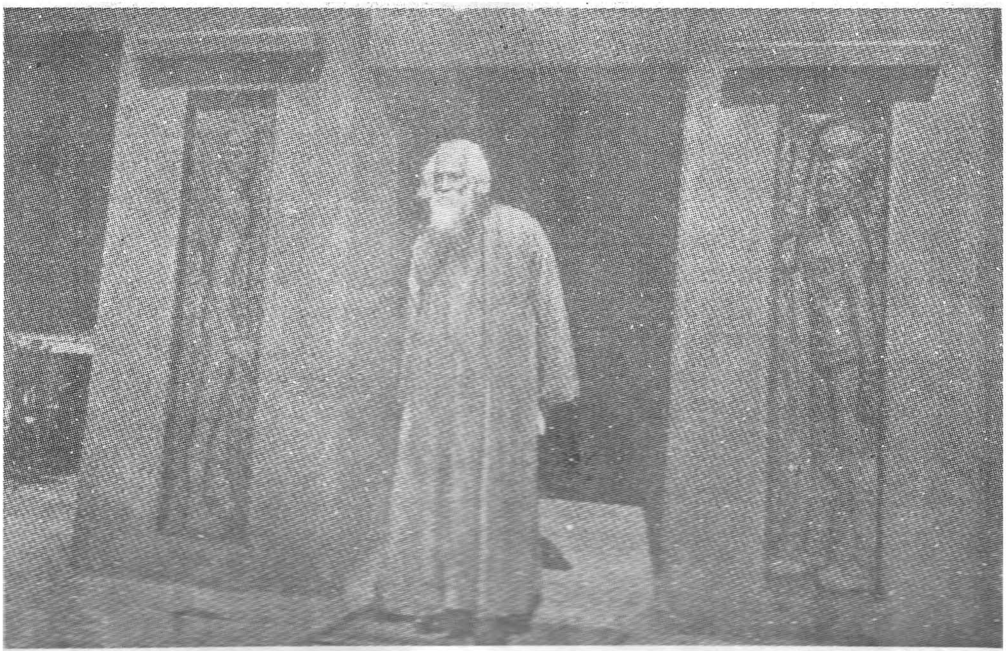

श्यामलीर सम्मुख रवीन्द्रनाथ

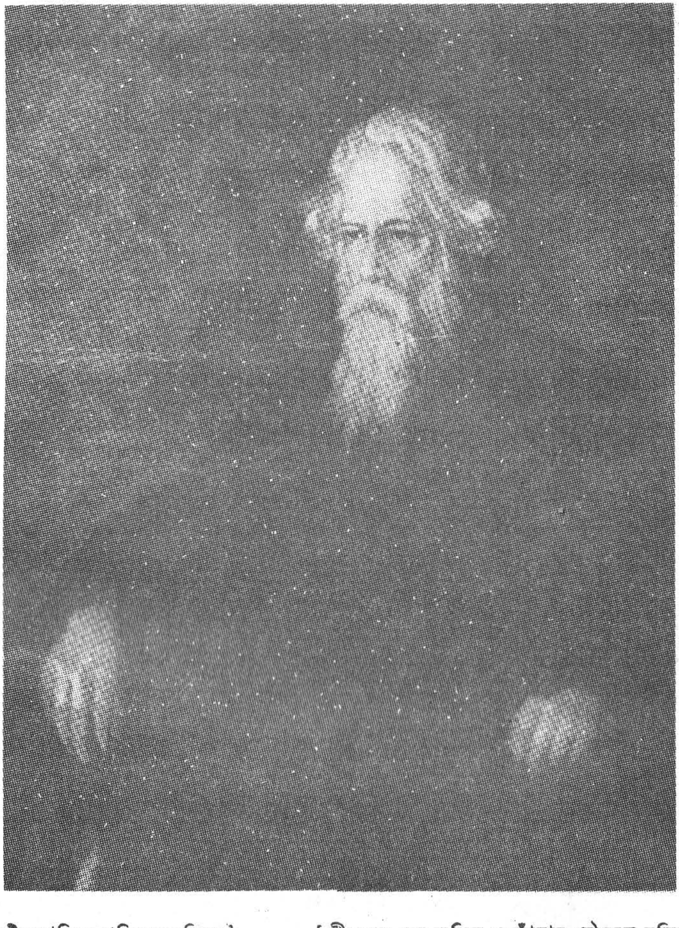

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত]　　[শ্রীঅতুল বসু অঙ্কিত ও তাঁহার সৌজন্যে মুদ্রিত

"হায়, গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা।
ওগো তপন, তোমার স্বপন দেখি যে,
করিতে পারিনে সেবা।"
শিশির কহিল কাঁদিয়া,
"তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া
হে রবি, এমন নাহিক আমার বল,
তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন
কেবলি অশ্রুজল।"

"আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি,
বাসিতে পারি যে ভালো।"—
শিশিরের বুকে আসিয়া
কহিল তপন হাসিয়া,
"ছোটো হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি;
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব
হাসির মতন করি।"

ক্ষণিকা

[প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত পত্র]

ওঁ

শিলাইদহ

ভাই

তোমার সঙ্গে কাজের কথা না কয়ে থাকবার যো নেই অতএব সে কথা সেরে রাখাই ভাল। ২০,০০০ যদি ৮ পার্সেন্টে এবং অন্ততঃ বছর তিনেকের মেয়াদে এবং অত্যধিক খরচা ব্যতিরেকে পাওয়া যায় তাহলে মাড়োয়ারীকে শুধে দিয়ে ভার লাঘব করা যায়। কি বল? যদি সুবিধা থাকে ত কিংকর্ত্তব্য লিখো। লোকেনের দেনা শুধতে যদি দেনা করি তাহলে লোকেন নিশ্চয়ই বিরক্ত হবে, সেই জন্যে আমি কাপিরাইট বেচতে প্রস্তুত হয়েছি। নিজের বই এবং নিজের দেহটা ছাড়া সম্প্রতি আর কিছু বিক্রেয় পদার্থ আমার আয়ত্তের মধ্যে নেই—বই কেনবার মহাজন পাওয়া দুর্লভ, এবং নিজেকে বিক্রয় করতে গেলেও খরিদ্দার পাওয়া যেত কি না সন্দেহ। কোন ছাপাখানাওয়ালা মহাজন যদি গ্রন্থাবলী কেনে তাহলে ঠকে না এটা নিশ্চয়।

সুরেন ইতিমধ্যে Newmanদের ওখানে মোলিয়েরের অর্ডর দিয়ে এসেছে তারা পাঁচ ছ দিনের মধ্যে পাঠাবে এমন আশ্বাস দিয়েছে। বেলাকে Nursing সম্বন্ধে দুই একটা বই পড়াতে ইচ্ছা করি—যদি সে সম্বন্ধে কোন ভাল বই চক্ষে পড়ে তাহলে আমার হয়ে অর্ডর দিয়ো—একটা Nursingএর বই সে পড়েছে—একটু বড়সড় গোছের রীতিমত শিক্ষার উপযোগী বই যদি পাও তাহলে ভাল হয়।

Chunder Brothersদের কাগজের কথাটা বলেচ বোধ হয়। কাগজের নৌকা বোঝাই করে আমার গল্পগুলিকে কালসাগরে ভাসিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছি—অতএব ২৪ পাউণ্ড ডিমাই কাগজের বন্দোবস্ত করে দিয়ো।

কবির আশ্রমে আসতে গেলে যে পণ্ডিতের সহায়তা নিতান্তই আবশ্যক আমি তা বোধ করি নে—অতএব বিদ্যার্ণবের যদি বিলম্ব থাকে তুমি তাঁর অপেক্ষায় থেকো না—পথ অত্যন্ত সুগম সরল।

তুমি ক্ষণিকা সমালোচনা করচ শুনে আমি খুসি হলুম, সে কথা গোপন করতে চাইনে। তার একটু বিশেষ কারণও আছে;—ওর ভাষা ছন্দ প্রভৃতি এতটা অধিক নতুন হয়েছে যে, যারা স্বাধীন রসগ্রাহী লোক নয়, তারা কিছুতেই ভেবে পাচ্চেনা এটা তাদের ভাল লাগা উচিত কি না—সুতরাং পনেরো আনা পাঠক ইতস্ততঃ করচে—আর যদি অধিককাল তাদের এই দ্বিধার মধ্যে ফেলে রাখা যায় তাহলে তারা চটেমটে বইটাকে গাল দিতে আরম্ভ করবে—একটা সমালোচনা পেলে তারা আশ্রয় পেয়ে বাঁচবে। আমি লোকেনকে লিখেছি ক্ষণিকায় আমার মনের ভাবগুলিকে এক ঝাঁক বনের পাখীর মত নানা খোপ-খাপের ভিতর থেকে ছেড়ে দিয়েছি, তারা গানও গাচ্চে এবং উড়চেও। তাদের কণ্ঠে সুর এবং ডানায় লঘুতা দিয়ে দিয়েছি। ঐ লঘুতাটার জন্যে একদলের বিরাগভাজন হব; যারা আকাশের পাখীর স্বাভাবিক গানের চেয়ে খাঁচার পাখীর কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম তক্তপোষে বসে শুনতে চায়—আমার ছাড়া পাখাগুলি অত্যন্ত লঘুতাবশতঃ তাদের দাঁড়ের উপর ধরা দেবেনা বলেই তারা চটবে। এক একটি সমালোচকের নিজের নিজের এক একটি দাঁড় আছে—সেই দাঁড়ের উপরে শিকলি দিয়ে কবিতাকে না বাঁধতে পারলে তারা তীর এবং

বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে। ক্ষণিকার ভাগ্যে সেই রকম অপঘাত মৃত্যুর আয়োজন ঘটার সম্ভব বলে তোমার সমালোচনার সংকল্পে আমি একটু বিশেষ খুসি হয়েছি।

আজকের সুনির্ম্মল দিনটি যেন শ্রাবণের ঘনপল্লবিত লতায় একটি ভরা গুচ্ছ আঙ্গুরের মত আকাশ থেকে দোদুল্যমান হয়েছে, পুঞ্জীকৃত সৌন্দর্য্যে এবং রসে পরিপূর্ণ, দেখলে আশঙ্কা হয় এমন দিন আর পাব না।

প্রভাতকুমারের কাছ থেকে আশ্বিনের চিরকুমার সভার তাগিদ এসেছে—ভাদ্রেরটা পাঠিয়ে দিয়েছি। অতএব ইতি ২৪শে শ্রাবণ ১৩০৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

['ক্ষণিকা' ১৩০৭ সালের শ্রাবণ মাসের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়। ইহা লোকেন্দ্রনাথ পালিতের নামে উৎসর্গীকৃত। প্রিয়নাথ সেন 'ক্ষণিকা'র সমালোচনা শেষ পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলেন কি না জানা যায় নাই। উহা কোথায়ও প্রকাশিত হয় নাই। এ পত্রে যে কাপিরাইট বিক্রয়ের কথা আছে, শেষ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে তাহা করিতে হইয়াছিল। তিনি হিতবাদী কার্য্যালয়কে তাঁহার কয়েকখানি গদ্য পদ্য গ্রন্থাবলীর স্বত্ব দুই হাজার টাকায় বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুরেন—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর; বেলা—জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার ডাক-নাম। কবির আশ্রম—শান্তিনিকেতন আশ্রম তখনও স্থাপিত হয় নাই, উদ্যোগ চলিতেছে; বিদ্যার্ণব—পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব, পরে আশ্রমের সহিত ইনি যুক্ত ছিলেন। প্রভাতকুমার—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তখন 'ভারতী'র সহিত যুক্ত ছিলেন; 'ভারতী'তে 'চিরকুমার সভা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছিল।

এই মূল্যবান পত্রটি আমরা প্রিয়নাথ সেনের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত প্রমোদনাথ সেন ও কবি-যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সৌজন্যে প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহাদের বিশ্বাস, ইহা অন্য কোথায়ও মুদ্রিত হয় নাই।—স. শ. চি.]

লেখন

[অপ্রকাশিত]

প্রথম আষাঢ়ে রামগিরি হতে
বহি বিরহের বাণী
গিয়েছিল দূত নীলঘনমেঘ
সে কথা সবাই জানি।
প্রথম আষাঢ়ে জোড়াসাঁকো হতে
মিলনের দূত চলে
পীতবাস-পরা নবরবিকর
প্রভাত গগনতলে।

সাতাশ বছর তুমি ভোগ দিলে মোরে
আমারে এবারে এসে দিতে হবে তোরে।
ভাঁড়ার হয়েছে খালি; দই আর ঘোলে
মিশাল করে যা হয় কী তাহারে বলে?
খুশিতের ফাঁকি দেওয়া ছিল না ভরসা,
বিধাতার দিয়েছি ফাঁকি তাই এই দশা॥

৩/১/৩৩ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নীচের কবিতাটি শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সনৎকুমারের "স্মরণ-বহি" হইতে গৃহীত]

আবহাওয়া

সেকালের আবহাওয়া একালে বদলে গেছে; এখনকার মানুষই যেন অন্য রকম হয়ে জন্মাচ্ছে। সে মজলিস নেই, মজলিসী লোকও নেই। কিন্তু সেকালে আমাদের কি ছিল? এই বাড়িতেই দেখেছি, যখন যেখানে যেমনটি প্রয়োজন ঠিক তেমনটি পাওয়া যেত; সব যেন আগে থেকে তৈরি হয়ে আছে। বৈজ্ঞানিক হিসেবের সঙ্কীর্ণতায় প্রাণবস্তুর কাটছাঁট তখনও শুরু হয় নি। নানা প্রয়োজন এবং বাহুল্যের সরবরাহ ক'রে মজলিসকে বাঁচিয়ে রাখা যাদের কাজ ছিল, সেই চাকর-বাকররাও ছিল তেমনই, মজলিসের রস তাদেরও ছুঁয়ে যেত। আজকাল মজলিস নাম দেয় বটে, কিন্তু তাতে মজলিসত্ব কিছু নেই; তফাত বুঝতে পারি না—আনন্দসভায় আর শোকসভায়; সেই সভাপতি, সেই উদ্বোধন-সঙ্গীত, সেই বক্তৃতা, সেই সমাপ্তি-সঙ্গীত। সবই আছে, মজলিসের প্রাণটুকুই শুধু নেই।

সেকালের বৈঠকেরও এই দুর্গতি হয়েছে। সে আমলে এই মজলিস আর বৈঠক ছিল সত্যি, জীবন্ত; আমরাও তার শেষ রেশটুকু দেখেছি। ও বাড়িতে বসত বড় জ্যাঠামশাইদের বৈঠক সকালে; বাবামশাই, বড় জ্যাঠামশাই সবাই বসতেন দক্ষিণের বারান্দায়। বড় জ্যাঠামশাই 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লিখছেন, তাই নিয়ে অবিরত চলছে সাহিত্য-আলোচনা; দার্শনিকেরা আসতেন, পণ্ডিতেরা আসতেন, নিজের নিজের সটকা নিয়ে আসর জমিয়ে সবাই বসতেন; অবাধে বইত সাহিত্যের হাওয়া। ছেলেবেলায় উঁকিঝুঁকি মেরে আমিও দেখেছি এই বৈঠকের চেহারা।

সন্ধ্যেয় বসত জ্যোতিকাকামশাইদের বৈঠক। এ বৈঠকের চেহারা ছিল আর এক রকম; সেখানে আসতেন তারক পালিত, ছোট অক্ষয়বাবু, কবি বিহারীলাল। রবিকা বয়সে ছোট হ'লেও এই বৈঠকেই যোগ দিতেন। এখানে মেয়েদেরও প্রবেশাধিকার ছিল। নতুন কাকীমা অর্থাৎ জ্যোতিকার স্ত্রী ছিলেন এই বৈঠকের কর্ত্রী। এখানে চলত গান, বাজনা, কবিতার পর কবিতা পাঠ।

এ বাড়িতে বাবামশাইয়ের ছিল আলাদা বৈঠক, এখানে পাড়া-পড়শীরা এসে বসত, তামাক, গান-বাজনা, খোশগল্প চলত; অক্ষয় মজুমদার টপ্পা গাইতেন; অম্বুরী তামাকের গন্ধে আসর মাত হয়ে থাকত। সেখানে আমাদের প্রবেশাধিকার ছিল না।

সে যুগের তিন রকম মজলিসের ছবি দিলুম। এই আবহাওয়ার মধ্যে রবিকা বড় হয়েছেন। তখন সব দিকে সামঞ্জস্য বজায় ছিল, শিল্প সাহিত্য গানের অফুরন্ত বিকাশের মধ্যে তিনি মানুষ। সে যুগে এমন বিদ্বদ্জনসমাগম আর কোথাও হ'ত না। বঙ্কিমবাবু আসতেন। মনে আছে, একবার রবিকার 'কাল-মৃগয়া' নাটকটি আগাগোড়া গান গেয়ে তাঁকে শোনানো হয়েছিল। আবছা মনে পড়ছে আমাদের উপর ভার ছিল ফুলদানি সাজাবার। সহবৎদুরস্ত ভাল কাপড় জামা প'রে হাজির হবার হুকুম হ'ল আমাদের উপর। একালের মত এলোমেলো অগোছালো ভাবে ছেলেরা যেখানে সেখানে যেতে পারত না। এই জীবনযাত্রার মধ্যে যিনি মানুষ, তিনি যে সকলবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রতি নিষ্ঠা দেখাবেন, সে আর বিচিত্র কি? আমাদের এই বাড়ির জীবনযাত্রা পুরাতন চালে অনেক দিন চলেছিল। আমাদের আমলেও এর জের ছিল কিছু। তারপর আস্তে আস্তে আজকালকার ক্লাবের সৃষ্টি হ'ল, পুরাতন চাল বিদায় নিলে।

যেমন বাইরে, অন্দর মহলেও তেমনই। দেখেছি গুরুজনের সম্পর্ককে সমীহ ক'রে চলার রেওয়াজ; খাওয়া-দাওয়া, সাজ-পোশাকে তাঁদেরও একটু বেচাল হওয়ার জো ছিল না।

একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। অরুদা একবার চা-বাগান থেকে ফিরে এলেন, একেবারে পুরোদস্তুর সাহেব—কোট-প্যাণ্ট হ্যাট-টাই, কুলী খাটিয়ে মেজাজও হয়েছে সাহেবী। ইংরেজী ফ্যাশান-দুরস্ত সাজ প'রে তিনি একদিন বাইরে বেরুচ্ছেন, দেউড়ির বাইরে এসেছেন, উপরের বারান্দা থেকে বড় জ্যাঠামশাইয়ের নজরে প'ড়ে গেলেন। অমনই শুরু হ'ল হাঁকডাক। জ্যেঠামশাই উপর থেকেই বললেন, অরু, এই অভব্য বেশে তুমি চলেছ রাস্তায়? একটা বিপর্য্যয় ব্যাপার ঘটে গেল। চাকর ছুটল, দরোয়ান ছুটল, অরুদার আর পাত্তাই পাওয়া গেল না। সাজ-পোশাকের দস্তুর তখন মেনে চলতেই হ'ত—এক ছোটে বেরুনো বারণ ছিল। বে-আইনী পোশাকে ছোট ছেলেদেরও কাউকে যদি সদরে দেখা যেত, অমনই তলব পড়ত চাকরদের, কঠিন শাস্তি পেতে হ'ত তাদের। আজ আর আমার কিছু বলবার নেই। আমি লুঙি প'রে ব'সে আছি, আমাদের ছেলেরা হ্যাট-কোট পরছে।

যা বলছিলুম। ইদানীং দেখছি, সব তফাত হয়ে গেছে। ছোট-খাটো স্মৃতি-সভা, টাউন-হলের সভা, গান-বাজনার আসর সবই যেন এক রকম। বিয়ের বাসর আর মৃত্যু-বাসর সবই এক। এগুলো আমাদের বড় চোখে লাগে। রবিকাকে একবার বলেছিলুম, রবিকা, একটা ব্যবস্থা কর দেখি, এ রকম তো আর দেখতে পারি নে। সব অনুষ্ঠানগুলো তালগোল পাকিয়ে এক হয়ে গেল! তিনি জবাব দিলেন না, চোখ বুজে রইলেন। রবিকা এই যে ঋতুতে ঋতুতে উৎসব করতেন, তাঁর মনের মধ্যে ঋতু অনুযায়ী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ঠিক রূপটি ধরা পড়ত।

শান্তিনিকেতনেও যে সব অনুষ্ঠান হ'ত, তার সমস্ত আয়োজন তাঁর ব্যবস্থামত হ'ত। কার পর কি হবে, কোথায় কি থাকবে, কে কোথায় বসবে, আগে থাকতে সব ছ'কে দিতেন। একবার কলকাতাতে তাঁর জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটির শিল্পীরা ওঁকে সম্বর্দ্ধনা করেছিল। উৎসবের একটা ভাল রকম ব্যবস্থার জন্যে আমি ওঁকেই গিয়ে ধরলুম। সমস্ত অনুষ্ঠানের এমন একটা রূপ দিয়ে দিলেন যে, বিস্মিত হতে হ'ল। এই আমাকেই চেলীর জোড় পরিয়ে ক্ষিতিমোহনবাবুর বাছাই করা বৈদিকমন্ত্র পড়িয়ে তবে ছাড়লেন। আমি নিজে শিল্পী হয়ে তাঁর শিল্প ও সুষমা বোধের পরিচয় পেয়ে অবাক না হয়ে পারলুম না। এখন বুঝতে পারি, এই সব অনুষ্ঠান ঠিক ঠিক করবার জন্যে কর্ত্তার যে শক্তি দরকার, তা তাঁর মধ্যে ছিল। তাঁর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে সে শক্তিও বিদায় নিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, বাংলা দেশ থেকে অনুষ্ঠান জিনিসটাও বিদায় নেবে।

রবিকা কোন জিনিস এলোমেলো অগোছালো ভাবে হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না—এই শিক্ষা তিনি পুরানো যুগের আবহাওয়া থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। কোন অনুষ্ঠানে পান থেকে চুন খসবার জো ছিল না। সব ঠিক ঠিক হতেই হ'ত।

রবিকার সঙ্গে সঙ্গে এই সব অনুষ্ঠান, পুরানো যুগের সব স্মৃতি বিদায় নিলে। রবিকা বলতেন, "দেখ, আমরা চলতে বলতে এক ভাবে শিখেছিলুম, তাই এ যুগের লোকের সঙ্গে আর তাল মেলাতে পারি না।" তিনি মুখে এ কথা বললেও নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল এবং তাঁর জীবনে তাল না-মেলবার দুঃখ তাঁকে পেতে হয় নি। পুরানো আনুষ্ঠানিক আবহাওয়া তিনি যথাযথ বজায় রেখেছিলেন তাঁর সব অনুষ্ঠানের মধ্যে। নিজের জোরে নতুনের সঙ্গে পুরাতনকে মিলিয়ে নিয়েছিলেন।

২৬।৮।৪১ শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তর্পণ

১

মরিতে চাহি না আমি এই চিরসুন্দর ভুবনে—
প্রাণের কামনা সেই নিবেদিলে কবে না সে জানি!
তার পর ফুরাল না সেই গান সারাটি জীবনে,
মৃত্যুও মধুর হেসে বার বার গেল হার মানি'।
সেই এক মন্ত্রে তুমি জীয়াইলে বাঙ্‌লার বাণী—
ভুবন সুন্দর, তাই সুদুর্ল্লভ মানব-জীবন;
আকাশে তারায়-ভরা নিশীথের নীল ফুলবন,
তারো চেয়ে ভাল লাগে পৃথিবীর পান্থশালাখানি!

২

ভুলিতে পার নি তবু, একদিন আসিবে মরণ;
যেতে নাহি দিবে ধরা—তবু তার বাহুপাশ খুলি'
বাহিরিতে হবে দূরদীর্ঘ পথে; কাঁপিবে চরণ,
নয়নে নামিবে ধীরে দিক্‌হারা দিনান্ত-গোধূলি।
সে দিনের কথা ভাবি' বার বার বীণা ল'য়ে তুলি'
রচিলে রাগিণী জিনি' জ্যোৎস্নালোকে পিক-কুহরণ,
বিরহেরি ব্যথা হ'তে মিলনের মধু আহরণ
করিলে যে সুরে সুরে—তৃণ হতে তারারে আকুলি'!

৩

ফাগুন করিল হাহা সেই সুরে ফুলেদের বনে,
করুণ কপোত-কণ্ঠে নিদাঘ যে গাহে মূলতান !
বহুযুগ-পার হ'তে আষাঢ় ঘনায়ে আসে মনে,
মালবিকা, রেবা-নদী—মনে পড়ে কবেকার গান !
শরতে শেফালি-মূলে সেই সুরে বিলাইয়া প্রাণ
মালা গাঁথা ভুলে গিয়ে ব'সে থাকে কোন্ দেয়াসিনী !
সোনার-আঁচল-খসা, তন্দ্রালসা, সন্ধ্যা মায়াবিনী
না জ্বালাতে মণি-দীপ—হেমন্তের দিবা অবসান !

৪

'মরিতে চাহি না' বলি', ভুবনের বাসর-ভবনে
মরণেরে পরাইলে জীবনের স্বয়ম্বর-মালা !
শ্রাবণের মেঘ হয়ে নামিল সে তমালের বনে,
নীলকান্ত-রূপে তার নিশীথিনী হ'ল যে উজালা !
উষার অঞ্জলি হ'তে সন্ধ্যা ভরে আবীরের থালা,
একই রঙে রাঙা হয় অস্ত আর উদয়-সরণি !
গাহিলে কি সুর তুমি মরণের পরাণ-হরণী—
ভরিল সে নিজ হাতে জীবনের রসের পেয়ালা !

৫

এত দিন পরে আজ যেতে হ'ল তেয়াগি' তাহারে—
যার শুধু দরশনে অঙ্গে জাগে দিব্য-পরশন !
যাহার কুন্তল-গন্ধ বন্ধ করি' আঁখি অন্ধকারে

অতুল পুলকে ভরি' তুলেছিল স্বপ্ন-জাগরণ!
সারাটি জীবন ধরি' যে কাননে করি' বিচরণ
চয়ন করিলে কত নামহারা রূপের মঞ্জরী,
মাঠে বাটে আঙিনায় কুড়াইলে কত সাধ করি'
মাটির সে মিঠা-মূল—অমৃতের ক্ষুধা-নিবারণ!

৬

প্রাণের সে রাজপাটে এক-ছত্র গানের শাসন
সম্বরি' চলিলে আজ কোন্ মহানীরবতা-কূলে!
কোন্ দূর জ্যোতির্লোকে—জন্মমৃত্যু-তিমির-নাশন—
লগ্ন হবে ভৃঙ্গ সম পূর্ণস্ফুট পূর্ণিমা-মুকুলে!
মধু তার পান করি' জুড়াবে কি মরমের মূলে
সুচির গানের দাহ? সেথা কোন' ভুবন সুন্দর
জাগাবে না মৃত্যুভয়? অনিমেষ-আঁখি, অকাতর,
নেহারিবে কোন্ বিভা আলোকের যবনিকা তুলে'!

৭

তবু যে হয় নি ব্যর্থ সেই তব কামনা প্রাণের—
চেয়েছিলে তুমি, কবি, 'মানবের মাঝে বাঁচিবারে';
এত দিন বুঝি নাই, আজ বুঝি মর্ম্ম সে গানের,
শত-শিখা হয়ে সেই প্রাণ জ্বলে শত দীপাধারে!
গান হয়ে গুঞ্জরিছে অশ্রু আর হাসির মাঝারে,
মুকুলে মুঞ্জরি' ওঠে অলক্ষিতে শতেক শাখায়,

শতেক নয়নে সে যে স্বপনের কুহক মাখায়,
বাণী হয়ে ফিরিছে সে হৃদয়ের দুয়ারে দুয়ারে !

৮

তোমার কীর্ত্তির চেয়ে, বলিব না, তুমি যে মহৎ—
বলিব না, সৃষ্টি হ'তে স্রষ্টা আছে উর্দ্ধে, বহু দূরে।
জানি, সে কায়ার ছায়া মিলাইয়া যাবে স্বপ্নবৎ,
অজর অমর যাহা—বেঁচে রবে এই মৃত্যুপুরে।
সেই তব মূর্ত্তিখানি, ছায়া যার আলোক-মুকুরে
পড়িলে সরে না কভু, যত দূরে দেহ যাক সরি'—
মহান্ তাহার চেয়ে আছে কিবা? জন্ম জন্ম ধরি'
কে লভিবে হেন প্রাণ, হেন রূপ, স্বর্গমর্ত্ত্য ঘুরে?

৯

ফুটে আছে সেই প্রাণ—বিকশিত বিশ্ব-চেতনার
অরবিন্দ সম—তব কবিতার অকূল সায়রে!
নাহি তার নাম-ধাম, সে তো নহে কেবলি তোমার—
তোমা চেয়ে বড় যেই সেই সেথা নিয়ত বিহরে।
ছিল যাহা বিন্দু তাই রূপ নিল বাণীর সাগরে!
তোমার ও কীর্ত্তি মাঝে তুমি শুধু হও নি অমর,
হয়ে আছ অন্তহীন রূপ আর ভাবের নির্ঝর,—
অমৃতের হাসি সে যে চিরজীবী মৃত্যুর অধরে!

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

রবীন্দ্রনাথের একটি দান

(১)

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর বিলাতের সুবিখ্যাত 'টাইম্‌স' পত্রিকায় তাঁহার চরিত্র আলোচনা করিয়া লেখা হয় যে, তিনি অভিজাত-বংশে জন্মগ্রহণ করেন, নিজেও অভিজাত-প্রকৃতির (aristocratic) লোক ছিলেন এবং সমস্ত জীবন জনসাধারণ হইতে দূরে নিঃসঙ্গ একাকী দাঁড়াইয়া থাকিতেন।

এ কথার অর্থ এরূপ নহে যে, রবীন্দ্রনাথ নিজকে নবাবজাদা মনে করিয়া সমস্ত দেশবাসীদের ঘৃণা করিতেন, তাহাদের অস্পৃশ্য বলিয়া তাহাদের সুখদুঃখ, ঘরকন্নার কথা নিজের মনে কখনও আনিতেন না। সকলেই জানেন যে, তাঁহার জীবনে এবং সৃষ্ট সাহিত্যে ধনের গর্ব্ব, বিলাসিতা বা কৌলিন্য-অভিমান কিছুই ছিল না; বরং তাঁহার জীবন-যাত্রা, চালচলন, লোকের সঙ্গে মেশামিশি ঠিক আমাদের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী পরিবারের মত সাদাসিধা; কেবলমাত্র তাঁহার ঘরবাড়ি কলাবিদ্যার শ্রেষ্ঠ চর্চ্চার (নকল brumagem নহে) দ্বারা এক নূতন সুন্দর আলোকে উদ্ভাসিত ছিল, যাহা তোমার আমার মত ব্যস্ত চাকুরের ঘরে হয় না। তাঁহার এইমাত্র বৈশিষ্ট্য। ভুলি নাই যে, তিনি একবার আত্রেয়ী গ্রামের "পাটের হাটে মথুর কুণ্ডু শিবু শা"র সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া পাটের দোকান খোলেন, যদিও অবশেষে বহু অর্থক্ষতি দিয়া পলাইয়া বাঁচেন। এটা ঠিক অস্ত্রজীবী রাজ্য-শাসনকারী সামন্ত (aristocrat) জাতের কাজ নহে। আরও তাঁহার রচনার মধ্যে এমন একটি ছত্রও নাই যাহাতে দেখা যায় যে, তিনি কোন লোককে অস্পৃশ্য অবজ্ঞার পদার্থ বলিয়া মনে করিতেন। বরং তিনি সমাজের দলিত, রাজশক্তির লাঞ্ছিত, মূক অসহায় জনসাধারণকে নিজের

লোক বলিয়া হৃদয়ে টানিয়া লইয়াছেন, জাতিভেদকে অর্থ-দম্ভকে ধিক্কার দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কখনও টাকার গরম ছিল না, কারণ জমিদার-পুত্র হিসাবে তাঁহার ভাগে অতি কম টাকাই পড়ে, এবং কবি-হিসাবে তিনি রাজার গলা হইতে হীরার হার লাভ করেন নাই, মূল্যহীন পুষ্পমালাটাই গৃহে আনেন।

তবে, কি 'টাইম্‌স'-এর উক্তিটি মিথ্যা? তাহা নহে। জগতের সকল দেশেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষীগণ একা, তাঁহাদের একটিও বন্ধু নাই যাহার সঙ্গে সমান-সমানভাবে চিন্তা ও ভাব আদান-প্রদান করিতে পারেন। তাঁহাদের ভাল করিয়া বুঝিতে পারে, এমন লোকও তাঁহাদের জীবিতকালে পাওয়া যায় না; তাঁহাদের মৃত্যুর অনেক পরে তাঁহাদের কাব্যের যথার্থ ব্যাখ্যা হয়, তাঁহাদের বাণী ফলপ্রদান করিতে আরম্ভ করে। এইরূপ একটি নিঃসঙ্গ মনীষী ছিলেন দান্তে, এবং তাহার অনেক পরে আসেন মিল্টন—তাঁহাদের ললাট চিন্তায় ভরা, দুঃখে অন্ধকার, মুখ নীরব, ওষ্ঠ দুইটি চাপা। আর, শেক্সপিয়রও বাদ যান না; সত্য বটে তিনি পরিবার সন্তান লইয়া বাস করিতেন, থিয়েটারে তাঁহার অনেক বন্ধু ও শত্রু ছিল, বেশ টাকা জমাইয়া নিজ শহরে "কোঠা বাড়ি" খরিদ করেন। কিন্তু এসব বাহ্য; তাঁহার মুখে সদা হাসি সত্ত্বেও তাঁহার অন্তর ছিল নিঃসঙ্গ, একেলা। একজন আধুনিক ইংরেজ কবি এই সত্যটা ধরিয়া ফেলিয়াছেন এবং শেক্সপিয়রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন "তুমি চিরদিন অচেনা রহিবে…"

> Others abide our question. Thou art free,
> ...Thou didst walk on Earth unguess'd at.

রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর মনীষী।

আর এক শ্রেণীর কবি আছেন, তাঁহারাও প্রতিভাশালী, তাঁহাদের

দানও জগতে মূল্যবান। কিন্তু তাঁহারা এই কয়টি চিরধবল নিস্পন্দ মাউন্ট এভারেস্ট বা কাঞ্চনজঙ্ঘার মত মানস-জগতের সর্ব্বোচ্চ চূড়া নহেন। তাঁহারা অধিকতর আপাত-ফলপ্রদ, অতি শীঘ্র জনসাধারণের মন অধিকার করিতে পারেন, কারণ তাঁহারা ঠিক তোমার আমার মত লোকদের মনের ভাব ও আকাঙ্ক্ষা সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করেন, লক্ষ লক্ষ লোকের সঙ্গে মিশিয়া এক দলে অগ্রসর হন,—জয়ধ্বনি করিয়া, শোকগীতি গাহিয়া, অথবা মানব-প্রগতির শত্রুদের বিরুদ্ধে সমর-অভিযান লইয়া। এই দ্বিতীয় শ্রেণীটির ভাল দৃষ্টান্ত রুসো, ভিক্টর হুগো, লর্ড বায়রন।

"দলের-অনুভূতি"তে ইঁহাদের কাব্য অনুপ্রাণিত; ইঁহারা সব মানুষকে একত্র করেন (comrades), আমাদের সকলেরই যে সমান স্বার্থ, সমান বিপদ, একই পন্থা—এই বিশ্বাস লক্ষ লক্ষ সাধারণের মনে জাগাইয়া দেন; এই কবিরা যে আমাদের "জনগণকর্ম্মঅধিনায়ক," সংগ্রামে যে একাধারে তূর্য্যবাদক ও ধ্বজাধারী, তাহা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারি। একবার "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ" এই গানটি স্থির হইয়া শুনুন; আর একদিন "অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী" গান করান। তাহার পর একাকী চুপ করিয়া ধীরভাবে প্রত্যেক গানটি শোনার পর আপনার মনোভাবের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া দেখুন। তখন বুঝিবেন যে, এই দুইটি গানে আপনার হৃদয়ে দুইটি অতি বিভিন্ন ভাব জাগাইয়া দিয়াছে, সে পার্থক্য শ্রেণীগত, সেটা কম-বেশির বা ভাল-মন্দর কথা নহে।

রবীন্দ্রনাথ কখনও জনতার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নেতৃত্ব-লোভে হুঙ্কার—অর্থাৎ বীণার সপ্তমে চড়া সুর বাদন—করেন নাই; এরূপ ধস্তাধস্তি-কাজের পক্ষে তাঁহার আন্তরিক অসামর্থ্য ছিল। যে দাঁড়িপাল্লায়

মণে মণে কয়লা ওজন হয়, তাহার কাজ বৈজ্ঞানিক গবেষণাগৃহের কেমিক্যাল ব্যালান্সে করিতে পারে না। তিনি একবার স্বদেশপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া কিছুদিন সংবাদপত্র চালাইবার ইচ্ছা করেন, তাহার ফল ও স্থায়িত্ব ঠিক সেই আত্রেয়ী গ্রামে পাটের ব্যবসার মতই হয়। ফলত যদি এই দেশে এবং এই যুগে সফল খবরের কাগজ চালাইতে চাও, তবে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ অথবা পাঁচকড়িবাবুর মত সম্পাদক লাগাইয়া দাও, কারণ তাঁহাদের "আকাশ ঘিরে জাল ফেলে তারা ধরাই ব্যবসা" নহে, এবং অভিজ্ঞতাও অনুরূপ।

(২)

এতক্ষণে বোধ হয় বুঝাইতে পারিয়াছি যে, বঙ্গ-সাহিত্যে এবং বাঙালীর আধুনিক চিন্তাজগতে রবীন্দ্রনাথের অদ্বিতীয় দানটি কি! যে মনোভাব হইতে এই দান সৃষ্ট হয়, তাহা তাঁহার একটি ছোটগল্পে অল্প কথায় অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে :—

মৎস্যপুচ্ছের তাড়নায় জলের মধ্যে যে গূঢ় আন্দোলন চলিতে থাকে, সরোবরের পদ্ম যেমন তাহার প্রত্যেক আঘাত অনুভব করিতে পারে, শেখর তেমনি তাঁহার চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী সভাস্থ জনের মনের ভাব হৃদয়ের মধ্যে বুঝিতে পারিলেন।...

শেখর প্রান্তভাগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কেবল এই ক-টি কথা বলিলেন—বীণাপাণি শ্বেতভুজা, তুমি যদি তোমার কমলবন শূন্য করিয়া আজ মল্লভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইলে, তবে তোমার চরণাসক্ত যে ভক্তগণ অমৃতপিপাসী, তাহাদের কী গতি হইবে?—"জয় পরাজয়"

আমি এই পার্থক্য কী উপমা দিয়া বুঝাইব? যেন এক দিকে বিশারদের কর্ণভেদী ঢক্কানিনাদ অথবা পাঁচকড়িবাবুর দৈনিক হ্রেষারব, আর অপর দিকে রবীন্দ্রনাথের সংযত মিহি সুর। অথবা এক দিকে হাতকাটা শার্ট, খাকী শর্ট এবং ফুটবল-বুট পরা যুবক, আর অপর দিকে শান্তিপুরে মিহি ধুতি, ধোলাই মলমলের চুড়িদার পাঞ্জাবি এবং

কারুকার্য্যমণ্ডিত গ্রীসিয়ান স্লিপার পরা তরুণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ই বলি, আহিরগ্রাম পত্রিকা আর জাহিরগ্রাম পত্রিকা।

রবীন্দ্রনাথ যে গুণটি বঙ্গ-সাহিত্যে প্রথম আনিয়া দেন, এবং যাহার অনুশীলনে কেহই এ পর্য্যন্ত তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই, তাহার ইংরেজী নাম—refined delicacy, এবং তাহার বিপরীতটির নাম—vulgarity of taste. 'কোমলতা' বা 'মার্জ্জিত রুচি' বলিলে এটিকে ঠিক বুঝাইবে না, কারণ "কোমল" কথাটা প্রায়ই আমাদের মনে আনে—মেরুদণ্ডহীন দুর্ব্বলতা বা অস্থিহীন মাংসপিণ্ডের ছবি, যেমন বৈষ্ণবসাহিত্যে "প্রেমরসগলিতং" বলিলে বুঝায়। আবার 'মার্জ্জিত রুচি' বলিলে সাধারণত অশ্লীলতার বিপরীত মাত্র বুঝায়। আমি চাই এমন একটি কথা, যাহাতে কবিশেখর এবং দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পুণ্ডরীকের মধ্যকার মানসিক পার্থক্য বুঝাইতে পারে। বঙ্গ-সাহিত্যের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগের কবিশেখর।

তেমনই, "ইতুরে" বলিলে vulgar শব্দটির ঠিক অনুবাদ হয় না, কারণ অভিজাত-কুলের ছেলে এবং হঠাৎ-লক্ষপতিও রুচিহিসাবে vulgar হইতে পারেন, এবং আমেরিকায় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

৺লালমোহন ঘোষ এবং ৺এন. এন. ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য আমার জীবনে ঘটে। এরূপ আর কেহ কি বাঁচিয়া আছেন? যদি থাকেন, তবে তাঁহারা ঐ দুইটি মহাত্মার বক্তৃতার ধরন ও ভাষা এবং আজকার রাজনৈতিক মঞ্চে কোন বিখ্যাত নেতার হুঙ্কার ও আস্ফালন তুলনা করুন।

অথবা, পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর আগেকার বাংলার পেশাদার থিয়েটারে যে "পেটেণ্ট করা গলার স্বর" (রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব উক্তি) চলিত, তাহার সহিত ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে উচ্চশিক্ষিত শখের অভিনেতাদের গলা ও ভঙ্গি—অথবা "বিচিত্রা"য় 'ডাকঘর' প্রভৃতির অভিনয়-প্রণালী,—তুলনা করুন। একবার আমি প্যারীচরণ সরকার স্ট্রীটে একজন সাধারণ লোককে দেখি, তাহার গায়ে গেঞ্জির উপর একটি ওয়েস্টকোট মাত্র, কিন্তু সেই ওয়েস্টকোটের সামনের ভাগ উজ্জ্বল লাল সাটিনের এবং পিছনের অর্দ্ধেক উজ্জ্বল সবুজ রঙের। (সে ফুটবল-প্লেয়ার ছিল না!)

অনেক উচ্চশ্রেণীর লোকেরও গলার টাইয়ের (স্ত্রী-পক্ষে রিবনের) রং এবং কারুকার্য্য সেইমত প্রকৃত আভিজাত্য ও ইতুরে ভঙ্গির পার্থক্য দেখাইয়া দেয়।

ক্ষীরোদবাবুর একখানা নাটক আর রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' বা 'নটীর পূজা' পাশাপাশি রাখুন। দুই নাট্যকারই প্রশংসনীয়, আমি ক্ষীরোদ-বাবুকে নগণ্য বলিতেছি না, অথবা দুইজনের প্রতিভা তুলনায় ওজন করিতেছি না। কিন্তু তাঁহাদের প্রণালী ও সুর দেখায় যে, তাঁহারা দুই ভিন্ন-জাতীয় লোক। ক্ষীরোদবাবুকে "ইতুরে" বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে, তবে তিনি ধারাবাহিক "সাধারণ" প্রণালীর অনুসরণকারী ছিলেন।

চারিদিক দেখিয়া বহুজনের সহিত মিশিয়া (অথচ এক হইতে না পারিয়া), মর্ম্মপীড়িত রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে সেই মার্জ্জিত রুচি, সেই আত্মসংযত মিহি সুর চালাইবার চেষ্টা করেন। আকাশের রবি সহস্রকিরণ; আমাদের রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও শতধারা জাহ্নবীর মত শতমুখী। অনেক ক্ষেত্রে অনেক শিষ্য তাঁহার কোন বিশেষ প্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন, এবং কম-বেশি সফলও হইয়াছেন। যেমন, ৺ রায় বাহাদুর রমণীমোহন ঘোষ আমার সহিত এক ছাত্রাবাসে থাকিতেন এবং দুই তিন বৎসর নীচের ক্লাসে পড়িতেন। তিনি স্বয়ং কবি এবং খুব রবি-ভক্ত ছিলেন; আর আমি ছিলাম কবি-মাংসাশী জানোয়ার অর্থাৎ সমালোচক। রমণীমোহন স্বরচিত পদ্য আমাকে শুনাইলে আমি চেঁচাইয়া উঠিতাম, Stop thief! Stop thief! এবং রবীন্দ্রনাথের যে সব কথা বা ভঙ্গি অনুকরণ করা হইয়াছে তাহা দেখাইয়া দিতাম। তিনি উত্তর দিতেন, "এটা চুরি নহে, এটা unconscious cerebration of an admirer." এমন আরও অনেকে আছেন।

কিন্তু আজ আমাদের বিশ্বকবির যে গুণটি বলিলাম, তাহার প্রসার বঙ্গ-সাহিত্যে, বাঙালীর চিন্তার প্রণালীতে ও ভাবপ্রকাশে কোনই বিভূতি লাভ করে নাই। ইহাই বাঙালীর সর্ব্বাপেক্ষা বেশি দুর্ভাগ্য।

শ্রীযদুনাথ সরকার

মানস-হংস

মানসের রাজহংস বক্ষে বহি' শুভ্রতার বাণী,
ধরণীর নীলাকাশে বিদ্যুতের দিব্যদীপ্তি হানি'
উড়ে' চলে' গেল দূরে—পূর্ব্ব হ'তে উত্তরের তীরে ;
দিনান্তের রক্ত-চিতা নিবে' গেল রাত্রির তিমিরে।

কেহ বলে, কি অপূর্ব্ব ! এত দীপ্তি—পৃথ্বী আলো করে !
কেহ বলে, নীলাপদ্ম—সরস্বতী হস্তে যাহা ধরে !
অতি দূর ঊর্দ্ধ হ'তে অস্ফুটে যে গান এল কানে,
কেহ-বা শুনিল তাহা ; কেহ-বা চাহিল শূন্যপানে ;
সবাই বিস্ময় মানে—কোন্ দিকে, গেল কত দূর ?
কারো চক্ষে ভাসে চিত্র, কারো কর্ণে জাগে শুধু সুর !

বীণাটি করিয়া কোলে সারদা বসিয়া পদ্মাসনে
নিম্নে মহাশূন্যপথে মর্ত্ত্য শোভা হেরেন নয়নে ;
চারিধারে পদ্মগন্ধ—হংসদল ফিরে দলে দলে,
ফিরিল মানস-হংস, বাণীর চরণপদ্মতলে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথকে ভবিষ্যবংশীয়েরা কি চোখে দেখবে, তাঁর সম্বন্ধে কি ধারণা কল্পনায় মনে আনবে, সে কথা ভেবে দেখতে চেষ্টা করব না। তবে নিশ্চয় জানি, আমাদের যেমন তিনি ছিলেন চিরবিস্ময়, তাদের মনেও তিনি জাগাবেন সেই বিস্ময়। তাঁর কাব্য-সৃষ্টিতে যে মহার্ঘ অজস্রতা, বৈচিত্র্যের যে বর্ণছত্র তা মনকে যেমন কাব্যের আনন্দে ভ'রে দেয়, শক্তির বিরাটত্বে বুদ্ধিকে তেমনই অভিভূত করে। এবং কবিতা তাঁর সাহিত্যের সার হ'লেও সর্ব্বস্ব নয়। গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, সমালোচনায়, ব্যাকরণ থেকে আরম্ভ ক'রে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রায় সকল দিকের আলোচনায় যে সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করেছেন, তাতে সকল রসের যে সমাবেশ, সকল ভঙ্গির যে প্রকাশ—তাকে এক মানুষের রচনা ব'লে বিশ্বাস করা কঠিন। এই সৃষ্টির ক্ষমতার সামান্য অংশও যার থাকে জীবন ও অনুভূতির আর সব দিক বঞ্চিত ক'রে সে সৃষ্টির আগুনকে জ্বালিয়ে রাখতে হয়। এর বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। সৃষ্টির এই বিরাট শক্তি ও আকৈশোর তার অতন্দ্রিত প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের জীবনের কোনও দিক শীর্ণ করে নি; তাঁর অনুভূতির সৌকুমার্য্য কোথাও কর্কশ করে নি। মানুষের যা কিছু মহৎ, তাঁর পূজা পেয়েছে। যা কিছু হীন, তাঁকে বেদনা দিয়েছে। বিশ্ব-মানবের মৈত্রী তাঁর জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। সব ঘরে যে তাঁর ঠাঁই—সে কেবল তাঁর কাব্যের কল্পনা নয়। যে দেশ তাঁর জন্মভূমি, তার অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশা কবিকে করেছে কর্ম্মী। তাঁর সমস্ত দৈন্য ও হীনতা তিনি যেন নিজের বিরাট মহত্ত্ব দিয়ে লোপ করতে

চেয়েছেন। প্রাচীন যেখানে বড়, কোনও নবীন তাঁর মনের শ্রেষ্ঠত্ব-বোধকে টলাতে পারে নি; নবীন যেখানে সত্য, কোনও প্রাচীনের মোহ তা গ্রহণ করতে তাঁকে বাধা দিতে পারে নি। সমস্ত মানব-সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের ও মহত্ত্বের তিনি ছিলেন প্রতীক। একাধারে এই মহাকবি ও মহামানব বাস্তবে দেখা না দিলে কল্পনায় সম্ভব হ'ত না।

আমরা যারা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী ও সমসাময়িক—অসম্ভব নয় যে দূরভবিষ্যতে আমাদের একালের প্রধান পরিচয় হবে যে এটা রবীন্দ্রনাথের যুগ। আজকার দিনের তুচ্ছ ঘটনা, ক্ষুদ্র চেষ্টা, স্বল্প সাফল্য যখন সুদূরের দৃষ্টিতে অলক্ষ্য হবে, তখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দীপ্তিতেই ভাবী কাল আমাদের কালকে জানবে। আমাদের সুখ-দুঃখ, নিরাশা-আনন্দ তাদের চিত্তকে স্পর্শ করবে তাঁরই কাব্য থেকে। আমাদের সম্বন্ধে তাদের ঔৎসুক্য হবে জানতে, আমরা কি ভাবে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছিলাম, আমাদের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কতটা ব্যাপক ও গভীর ছিল, আমাদের জীবনের পারিপার্শ্বিক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে কতটা প্রভাবান্বিত করেছে! তাঁর কাব্য ও সাহিত্যে আমাদের একাল অমর হয়ে থাকল। সব কালের ভাগ্যে এ সৌভাগ্য ঘটে না।

ভবিষ্যৎ কালের লোক মানুষ-রবীন্দ্রনাথকে জানবে ইতিহাসের সমুজ্জ্বল পৃষ্ঠায়, কিন্তু কবি-রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম স্পর্শ তারা পাবে তাঁর কাব্যে, যেমন আমরা পেয়েছি। আজ হতে বহু শত বর্ষ পরে তাদের বসন্ত-দিনও রবীন্দ্রনাথের বসন্ত-গানে ধ্বনিত হবে, তাদের আষাঢ়ের সজল মেঘের উপর তাঁর বর্ষা-কাব্যের নীল অঞ্জন নেমে আসবে। প্রেয়সী নারীর নয়ন অধর তাঁর কাব্যের মধুতে মধুময় হবে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তারা নিরাশায় উৎসাহ, শোকে সান্ত্বনা পাবে।

সেই অনাগতকালের সমমর্ম্মীদের আমাদের অভিবাদন জানাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-পাঠে তাদের আনন্দই এর প্রত্যভিবাদন।

কিন্তু মহাকবির কাব্য চিরকালের হ'লেও বিশেষ ক'রে তাঁর সমকালিকদের। যে চিরন্তন নর-নারীর হৃদয়-স্পন্দন তাঁর কাব্যে রূপ পায়, তাঁর সম-কালের নর-নারীর হৃদয় তার উপকরণ। সেই বিশেষের মধ্যেই বিশ্ব-মানব নিজেকে প্রতিফলিত দেখে। আর কবির সমকালিকেরা তাঁর কাব্যে নিজেদেরই পায় এমন পূর্ণ ও নিবিড় ক'রে, যা ভিন্ন কালের মানুষের সম্ভব নয়। আমরা যারা আকৈশোর দিনের পর দিন রবীন্দ্রনাথের নূতন কাব্য পড়েছি, যার অদ্ভুত বৈচিত্র্য আমাদের মনের সামনে গ'ড়ে উঠেছে ও আমাদের মনকে গড়েছে—চিরকালের রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ক'রে আমাদের। বাংলার উদার আকাশ ও অবারিত মাঠে আমাদের চিত্তের প্রসার এসেছে তাঁর কাব্য থেকে। শুভ্র বালুচরের নীচে পদ্মার কালো জল তাঁর কাব্যের কথাই আমাদের কানে কানে বলে। ভোরের প্রথম আলোতে তাঁর কাব্যের মোহ, গোধূলির রক্তরাগে তাঁরই কাব্যের রং। বাংলার নর-নারী আমাদের অন্তরতর তাঁর কাব্যের বন্ধনে। সকল যুগের লোকের এ সৌভাগ্য ঘটে না। মহাকবির যারা সমসাময়িক এ দুর্লভ সৌভাগ্য তাদেরই। রবীন্দ্রনাথের সমকালে জ'ন্মে আমরা ধন্য হয়েছি।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

মৃত্যুর আলোকে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ অবশেষে এই মর্ত্ত্যের মলিনতামুক্ত হইয়া সেই লোকে প্রস্থান করিলেন—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'; যেখানে চন্দ্রতারকার ভাতিও ম্লান, বিদ্যুৎ দ্যুতিহীন, অগ্নির তো কথাই নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে মর্ত্ত্যমমতার কথা আমরা জানি, তাঁহার উদয়কালের সেই 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' হইতে অন্তকালের—

> একদা কোন্ বেলাশেষে মলিন রবি করুণ হেসে
> শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার মুখের পানে চাবে—

—পর্য্যন্ত, প্রাণের আকূতি ও দীর্ঘশ্বাসের গীতি স্মরণ করিলে আমরাও যেমন সেই জ্যোতির্ম্ময় পরপারের দিব্যস্বপ্নে আশ্বস্তবোধ করি না, তেমনই খেয়াপারের সেই ক্ষণটিতে রবীন্দ্রনাথও কেমন বোধ করিয়াছিলেন, তাহাই ভাবিতে ইচ্ছা হয়। এ ভাবনা দুর্ব্বল মানব-চিত্তের ভাবনা—মানুষ আমরা, এবং এতকাল রবীন্দ্রনাথের অতিগভীর মানবতার কাব্যদুগ্ধধারে আমাদের প্রাণ পুষ্ট হইয়াছে, তাই, আজ মৃত্যুর আলোকে সেই মহামানবের মূর্ত্তি একবার আমাদের চোখ দিয়া দেখিতে চাই। আমরা জানি, মৃত্যুর দ্বারপথে রবীন্দ্রনাথ কোন নূতন পথে প্রবেশ করিলেন না—চিররাত্রির সেই তিমিরাবরণ তিনি অনেক আগেই ছিন্ন করিয়াছিলেন, তিনি এই পারে থাকিতেই তমসার ওপার পর্য্যন্ত সেতু রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু জানার ভিতর দিয়া তিনি যে অজানাকে জানিয়াছিলেন, মৃত্যুর আবির্ভাবে যখন সেই অজানাকে তাহার সাক্ষাৎরূপে জানিলেন, তখন তাঁহার প্রাণ কি একটুও চমকিত হয় নাই? তিনি অরূপ-অসীমকে রূপের সীমায় দেখিবার সাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সকল দেখাই রূপরঞ্জিত ছিল; এক্ষণে তিনি সেই অরূপকে সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিত অবস্থায় কিরূপ দেখিলেন? মৃত্যুর সে রূপ কি একটুও ভিন্ন নহে? রবীন্দ্র-কাব্যে, জীবন ও মৃত্যুর স্বারূপ্য-সাধনার যে অপূর্ব্ব গীতিসুর বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিঃশ্বসিত হইয়াছে, আজ সেই সুর আমাদের প্রাণে নূতন করিয়া আরও গভীর-ভাবে বাজিয়া উঠিতেছে; আজ রবীন্দ্রনাথ যে মৃত্যুকে বরণ করিলেন সে মৃত্যু কি সেই জীবনের দাবি স্বীকার করিয়াছে—রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রাণ সেই ভাবের শরীরে শরীরী হইয়াই কি দিব্যধামে

পৌঁছিয়াছে ! এ প্রশ্ন হয়তো অন্য সময়ে অবান্তর, এমন কি অশোভন— তাঁহার একান্ত নিজস্ব আত্মিক উপলব্ধি সম্বন্ধে আমাদের কোনও কৌতূহল যেমন অনাবশ্যক, তেমনই নিরর্থক ; রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট ব্যক্তির ব্যক্তিচেতনার সেই অপর পৃষ্ঠে—তাহার গূঢ়তম সত্তায়—কোন্ বিশ্বাস, কোন্ ধ্রুব-জ্ঞান কি ভাবে বিদ্যমান ও বিকাশমান ছিল, সেই অপ্রকাশকে জানিবার শক্তিও আমাদের নাই—অধিকারও নাই। কিন্তু আমরা তাঁহার জীবনের যে প্রকাশের দিকটি দেখিয়াছি, যাহা আমাদের এই মর্ত্ত্যসংস্কার-মলিন প্রাণকেই আশ্বস্ত ও উজ্জীবিত করিয়াছে, সেই জীবনের অবসান ও পরপারের সেই জ্যোতির্ময় লোকে প্রবেশ, এই দুইয়ের মধ্যে—লোকান্তরের মত—ব্যক্তিত্বেরও একটা রূপান্তর কল্পনা করিয়া, মর্ত্ত্যের সহিত অমর্ত্ত্যের ব্যবধান বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না ; সে মৃত্যুর ছায়া রবীন্দ্র-কাব্যের আলোকে আলোকিত আমাদের চিত্তপ্রাঙ্গণে পড়িয়া যে ভাবের উদ্রেক করিতেছে, আজ তাহারই কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

২

সেদিন কবির শ্রাদ্ধবাসরে যখন সেই ঋষিমন্ত্র পাঠ হইতেছিল—'মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ'—তখন কবির নিজের রচিত আর একটি মন্ত্র আমাদের প্রাণে আর এক ভাবের উদ্রেক করিতেছিল—

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার হউক অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর নব জীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়,
তোমারি হউক জয়।

—এখানে, পৃথিবীর মলিন আলোক অপসারিত করিয়া, অপ্রকাশের তিমির-তোরণ ভেদ করিয়া যাহার প্রকাশকে কবি বন্দনা করিতেছেন, তাহা যে এই বায়ু জল, ওষধি ও পার্থিব রজঃ প্রভৃতিকে মধুমৎ করিয়া তুলিবার সেই একই অমৃত আলোক-ধারা, এ আশ্বাস আমাদের প্রাণে

জাগে না। এ গান শুনিয়া মনে হয়, জীবনের কক্ষে শতদীপ জ্বালিয়া আমরা বাহিরের অন্ধকার রাত্রিকে যতই ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করি না কেন, জীবনের সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রমণের পথে, সেই মৃত্যু, দুর্জ্ঞেয় রহস্য-পুরীর প্রাকারতলে, নক্ষত্রশলাকাখচিত বিরাট তোরণদ্বার রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তখন যে তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়ের প্রার্থনা আত্মার আর্ত্তরবের মতই উত্থিত হয়—'মৃত্যুর হোক লয়' বলিয়া মৃত্যুর যে রূপকে স্বীকার করিতে হয়, মনে হয়, তাহা হইতে ঋষি অথবা কবি কাহারও নিষ্কৃতি নাই। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রস্থান-গীতিও চিরযুগের মৃত্যুভয়-পীড়িত মানুষের অন্তিম আকূতি-স্বরে ভরিয়া উঠিয়াছে। জীবনের যে উৎসবশালায় তিনি স্বহস্তে অসংখ্য দীপ জ্বালিয়াছেন, স্বরচিত বিচিত্র কুসুমমাল্যে আমাদের ললাট ভূষিত করিয়াছেন, সেই উৎসবশালা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যখন তিনি বাহিরের অন্ধকারে পদক্ষেপ করিলেন, তখন তাঁহার দূরাগত কণ্ঠের আর এক যে গীত আমরা এখানে বসিয়া শুনিলাম—

ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চির সাথী
লও লও ক্রোড় পাতি
    অসীমের পথে জ্বলিবে
    জ্যোতির ধ্রুবতারকা।
হয় যেন মর্ত্ত্যের বন্ধন ক্ষয়
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
    মহা অজানার।

—তাহাতে আমাদের উৎসবশালার এই দীপাবলী আর তেমন উজ্জ্বল বোধ হয় না; তখন আমাদের সেই উৎসবনায়ক রবীন্দ্রনাথকে সেই মহা-অজানার সম্মুখে যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অন্তরের অভয় কামনা করিতে শুনি, তাহাতে মনে হয়, জীবনেই মৃত্যুকে জয় করিবার যে সাধনাই করি না কেন, জীবিতের পক্ষে মৃত্যুর আবরণ ঘোচে না—মৃত্যুর সেই জ্বলজ্জটাকলাপ জীবনের আলোককে উপহাস করিয়া, আমাদের চক্ষু ধাঁধিয়া দিয়া, অন্ধকারকেই অন্ধতর করিয়া তোলে; মর্ত্ত্যের বন্ধন ক্ষয় না হইলে, অসীমের পথে সেই অন্ধকার পার হইবার

ধ্রুবতারাটির সন্ধান মেলে না। কবি যে 'বন্ধন-ক্ষয়ে'র কামনা করিলেন, তাহাতে কি ইহাই বুঝিতে হইবে না যে, দেহের ইন্দ্রিয়-বেষ্টনীর মধ্যে তাঁহার মনের সেই মণিপদ্ম, রূপ-রস-স্পর্শের—বর্ণ গন্ধ ও মধুর—যে অশেষ আনন্দে দলে দলে বিকশিত হইয়াছিল, তাহার সকল সংস্কার, মৃত্যুর সহিত মুখামুখী হইবার কালে, তিনি মোচন করিতেই চাহিয়াছিলেন? একদিন যে গাহিয়াছিলেন—

> তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ,
> তার অণু পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ।
> আছে কত সুরের সোহাগ তার স্তরে স্তরে লগ্ন,
> সে যে কত রঙের রসধারায় কতই হ'ল মগ্ন।
> সে যে সঙ্গিনী মোর আমারে যে দিয়েছে বরমাল্য,
> আমি ধন্য সে মোর অঙ্গনে যে কত প্রদীপ জ্বাললো।

—আজ এই মুহূর্ত্তে সে কথা কি তিনি বিস্মৃত হইতে পারিলেন? কবির প্রাণ কি তখন 'কান্নাহাসির দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনে'র সকল মোহ দূর করিয়া—নিজের সেই অপরিমেয় প্রাণ-বহ্নির নির্ব্বাণ কামনা করিয়া—স্নিগ্ধ শীতল শান্তি-পারাবারে তরী ভাসাইবার জন্য, মুক্তিদাতা কর্ণধারকে ডাক দিল—তাহারই ক্ষমা ও দয়া ভিক্ষা করিল! এত সাধ ও সাধের জীবন পিছনে পড়িয়া রহিল; যে কণ্ঠ অন্ধকারের বক্ষ চিরিয়া গানে গানে আলোকের উৎস অবারিত করিয়াছিল, সে কণ্ঠ শুধুই নীরব হইল না—গানের সেই সুরও ভুলিয়া গেল!

রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসরে গম্ভীর বেদগাথার মতই উদ্গীত তাঁহার সেই স্বরচিত গানগুলির মধ্যে, অনন্তের পথে সেই দেহমুক্ত আত্মার যে যাত্রী-বেশ মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইলাম, তাহা জীবনের নিকট বিদায় লওয়ার বেশ; মহাভারতকার যুধিষ্ঠিরাদির যে মহাপ্রস্থান-বেশ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাও সেই বেশ। এই মহাযাত্রার পথে পশ্চাতের আকর্ষণ এতটুকু থাকিবার যো নাই—সকল স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে হয়, সকল মমতা, সকল মোহ জয় করিতে হয়। কবি এইখানে থাকিতে যে আলো দুই চক্ষে ভরিয়া লইয়াছিলেন, সে আলোকে মৃত্যুর পথ আলোকিত হইল না; গানের সহস্র ফুলে যে মালা গাঁথিয়াছিলেন, সেই মালার কথাও মনে রহিল না; পৃথিবীর আর কোন কবির জীবনে

যে আনন্দ এমন নিরবচ্ছিন্ন গীতময় হইয়া উঠে নাই, সেই আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডারও এই খেয়াপারের কড়ি যোগাইল না। যখন, সেই চরম মুহূর্ত্তে, কবির মুখ হইতে, সকল যুগের সকল মানবের সেই এক আর্ত্ত আবেদন, কম্পিত কণ্ঠে, নিরাভরণা বাণীর বেশে, বাহির হইয়া আসিল—

মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।

তখন, শোকস্তব্ধ হৃদয়কে বারবার কেবল এই কথাই বলিলাম—

সকল অভ্যাসহারা সর্ব্ব আবরণ ছাড়া
সদ্য শিশু সম
নগ্ন মূর্ত্তি মরণের নিষ্কলঙ্ক চরণের
সম্মুখে প্রণম'।

৩

আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন-সাধনায় মৃত্যুকে কখনও ভোলেন নাই, বরং জীবন ও মৃত্যুর যে দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হইবার সাধনাই তাঁহার কবিজীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। মানুষ যাহার কথা চিন্তা করিতে ভয় পায়, আমাদের যাবতীয় মর্ত্ত্যসংস্কার যাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, যাহার বর্ণনায় সকল কালের সকল কবির কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ, এবং গান রোদন হইয়া উঠিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ সেই মৃত্যুকে বারংবার যে সঙ্গীতে অর্চ্চনা করিয়াছেন, তাহাতে ব্যথাও সুখ হইয়া উঠে, হর্ষ ও বিষাদ একই অশ্রুজলে বিগলিত হয়। কবি জীবনকে ভালবাসিতেন বলিয়াই —যে-মৃত্যু সেই জীবনেরই পরিণাম, তাহাকে একটা সর্ব্বনাশ বা মহাশূন্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, করিলে জীবন অর্থহীন হইয়া পড়ে। জীবনকে শুধুই ভোগ করা নয়—সেই ভোগ যে একটা মোহ, তাহার মূলে যে কেবল অন্ধ ইন্দ্রিয়-চেতনাই আছে, ইহা বিশ্বাস করিতে বাধিত বলিয়াই তিনি জীবনের সহিত মৃত্যুর সঙ্গতি-সাধনে এমন উৎসুক ছিলেন। এই ভাব-সাধনায় তিনি জীবন ও মৃত্যুর অভেদ উপলব্ধি করিতেই প্রয়াস পাইতেন; কখনও বা, জীবন হইতে জীবনে আত্মার প্রয়াণ-লীলায়, মৃত্যু একটা ক্ষণচ্ছেদ মাত্র, ইহাই মনে করিয়া

আশ্বস্ত হইতেন। জীবনের দেবতা যিনি, মরণের দেবতাও তিনি—ইহা না হইয়া পারে না; অতএব জীবনে যিনি এত স্নেহময়, এত সুন্দর, মরণে তিনি অন্যরূপ হইবেন কেমন করিয়া?—

যবে মরণ আসে নিশীথে গৃহদ্বারে
যবে পরিচিতের কোল হ'তে সে কাড়ে
যেন জানি গো সেই অজানা পারাবারে
এক তরীতে তুমিও ভেসেছ।

কিংবা—

বিচ্ছেদেরি ছন্দে লয়ে
মিলন ওঠে নবীন হ'য়ে।
আলো অন্ধকারের তীরে,
হারায়ে পাই ফিরে ফিরে,
দেখা আমার তোমার সাথে
নূতন ক'রে নূতন প্রাতে।

অথবা—

জীবনে ফুল-ফোটা হ'লে মরণে ফল ফল্‌বে

এবং—

মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণ-পুটে
উতরিবে যবে নব-প্রভাতের তীরে—
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।

এত বড় আশ্বাস ও বিশ্বাস যাহার, মৃত্যু তাহাকে বিচলিত করিবে কেমন করিয়া? যদি বা তাহার সেই আঘাত, দেহ-বিচ্ছেদের সেই যাতনাও স্বীকার করিতে হয়, তাহাও ক্ষণিক—

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে কবির এই যে মনোভাব, ইহার কারণও খুব স্পষ্ট। অতি গূঢ় ও গভীর জীবন-রস-পিপাসাই এই মনোভাবের কারণ। কবির নিকটে মৃত্যুর কোন পৃথক সত্তা নাই এইজন্য যে, আত্মার অমরত্ব জীবনের বাহিরে, মৃত্যুনামক কোন সীমানার অপর পারেই আরম্ভ হয় না। যে-চেতনা অমরত্বের অনুষঙ্গী তাহা কোন নির্ব্বিকল্প কৈবল্যের অবস্থা নয়—সীমা ও অসীমার মিলন-ভূমি এই অপরূপের নাট্যশালায় সেই অমরত্বের নিত্য আস্বাদন হইয়া থাকে; আত্মা অমর

এই অর্থে যে, সে রূপ হইতে রূপান্তরে, এই রস-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইবে না। সেইজন্যই জীবনের শেষ নাই ; এই রূপের খেলাও যেমন অনন্তকাল চলিতে থাকিবে, তেমনই, সেই খেলার সঙ্গী বা চেতন-সহচর-রূপেই আত্মার আত্ম-চেতনার কখনও লয় হইবে না। ইহার কোন দার্শনিক ব্যাখ্যা না করিয়া, একটা স্থূল অর্থ করিলেই চলিবে এবং সহজ মানবতার দিক দিয়া তাহা সত্যও বটে। সে অর্থ এই যে, কবি এই জগৎ-দৃশ্যের বাহিরে কোন অস্তিত্বের কামনা করিতেন না ; সেইজন্য, সেই কামনারই রঙে রঙিন হইয়া মৃত্যুও তাঁহার নিকটে মনোহর হইয়াছিল। জগতের রস-রূপ এতই মনোহর যে, এ রূপের সঙ্গ ত্যাগ করিতে কখনও তাঁহার মন সরে নাই। যে ব্যক্তিত্বের বৃন্তবন্ধনে রূপের এই মধুসৌরভময় সহস্রদল ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই ব্যক্তিত্বের লয় যদিও বা মনে উদয় হইত, মহানির্ব্বাণের বর্ণহীন তাপহীন জ্যোতিঃ-সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবার ইচ্ছা হইত, তথাপি, তখনও সেই অকূল পারাবার অপেক্ষা জীবনের এই তটভূমি, এই জগৎ, সুন্দরতর বলিয়া মনে হইত, এবং মৃত্যুকেও জীবনের সুহৃদ বলিয়া মনে করিতে বাধিত না। যখন—

আমি বলে, মিলাই আমি
আর কিছু না চাই,

তখন—

ভুবন বলে, তোমার তরে
আছে বরণ-মালা,
গগন বলে, তোমার তরে
লক্ষ প্রদীপ জ্বালা।
প্রেম বলে যে, যুগে যুগে
তোমার লাগি আছি জেগে,
মরণ বলে, আমি তোমার
জীবন-তরী বাই।

এই কামনাকে, এই প্রেমকেও, তিনি শোধন করিয়া লইয়াছেন—পরমার্থ লাভের সহায়রূপে ; এই রূপরসচর্য্যাকেই তিনি আত্মার সহিত মিলন বা আত্মোপলব্ধির একমাত্র পন্থা বলিয়া বার বার নিজেকে আশ্বস্ত করিয়াছেন—

তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
যুগে যুগে বিশ্ব ভুবন তলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে
চির স্বয়ম্বরা।

কিন্তু যে প্রবল কামনা মৃত্যুকেও জয় করিতে চাহিয়াছে—সে কামনা জগতেরই এই রূপরস-সম্ভোগের কামনা। মৃত্যুও সেই কামনার জোরে অমৃত হইয়া উঠিয়াছে। আর একটি গানে কবির সেই কামনা, ব্যর্থতার করুণ সুরকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টায়, যে স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহাতে প্রাণ যেন মৃত্যুকে স্বীকার করিয়াও করিবে না। পৃথিবী হইতে বিদায় লওয়ার—একেবারে গত হওয়ার—যে বেদনা, তাহাই আকাশ ও পৃথিবীর শোভাকে যেমন মমতায় মেদুর করিয়া তুলিয়াছে, তেমনই, সেই বেদনাই শান্তিলাভ করিতে চায় এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন-কল্পনায়—

যখন পড়বে না মোর চরণ-চিহ্ন এই বাটে,
বাইবো না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে
* * *
ঘাটে ঘাটে খেয়াতরী
এমনি সেদিন উঠবে ভরি
চরবে গোরু, খেলবে রাখাল ঐ মাঠে।
আমায় তখন নাই বা মনে রাখলে
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাইবা আমায় ডাকলে।

এই গানের ঐ শেষ তিনটি পংক্তিতে যে দীর্ঘনিশ্বাস জমাট হইয়া আছে, তাহাই ইহার মূল সুর; ঐ তিনটি পংক্তিই ফিরিয়া ফিরিয়া আমাদেরও হৃদয়ের যে তন্ত্রীতে আঘাত করে, তাহাতে বিদায়ের ব্যথাই তীব্রতর হইয়া উঠে; উহার মধ্যে সেই ব্যথাকে অগ্রাহ্য করিবার যে ভাব আছে, তাহা নিতান্তই গৌণ বলিয়া মনে হয়। কবি যখন সান্ত্বনার ছলে বলেন—

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি,
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোরে
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে
আসবো যাবো চিরদিনের সেই আমি।

—তখন সে আশ্বাস, সেই ব্যথার তুলনায়, অতিশয় অবাস্তব বলিয়া মনে

হয়। কারণ, যে-প্রাণ পৃথিবী ছাড়িয়া যাইবার সময়ে এমন বিদায়-বিধুর হয়, সে প্রাণের পক্ষে এ আশ্বাস সত্য নয়; মৃত্যুতে যদি ব্যক্তিত্বের লোপ হয়—তাহাই যদি স্বীকার করিতে হয়—তবে সেই সঙ্গে এই প্রাণও মরিয়া যাইবে; তখন 'কান্না-হাসির এই দোল-দোলানি' এই "pleasing anxious being"-ও যে আর থাকিবে না! সেই ভয়ই যে সবচেয়ে বড় ভয়—সেই ক্ষতিই যে সবচেয়ে বড় ক্ষতি! তাহার বদলে, ঐ যে ব্যক্তিত্বহীন অস্তিত্বের চেতনা সর্ব্বভূতে নির্ব্বিশেষে ব্যাপ্ত হওয়ার আনন্দ—তাহা কি সত্যই একটা সান্ত্বনা? কবি এখানে এই যে 'চিরদিনের সেই আমি'র অমরত্বের জয় ঘোষণা করিয়াছেন, ইহাতে একটা তত্ত্বজ্ঞানের আনন্দ হয়তো আছে, কিন্তু প্রাণের আশ্রয় ইহাতে কোথায়? যে-আমি সকল খেলায় খেলা করে—সে আমি একটি সুন্দর কল্পনা মাত্র; তাহাতে একটা ভাবের সৌন্দর্য্যই আছে, প্রাণের ক্ষুধার বস্তু সে নয়—বিলাসের সামগ্রী। এইরূপ কল্পনা রবীন্দ্রনাথের আর একটি কবিতায় আছে। তাঁহার 'শিশু' 'বিদায়' লইবার কালে তাহার মাকে বলিতেছে—

বাদ্‌লা যখন পড়বে ঝ'রে
রাতে শুয়ে ভাববি মোরে,
ঝরঝরানি গান গা'ব ঐ বনে।
জানলা দিয়ে মেঘের থেকে
চমক মেরে যাব দেখে,
আমার হাসি পড়বে কি তোর মনে?

খোকার লাগি' তুমি মাগো
অনেক রাতে যদি জাগো
তারা হ'য়ে বলব তোমায় 'ঘুমো';
তুই ঘুমিয়ে পড়লে পরে
জ্যোৎস্না হয়ে ঢুকব ঘরে,
চোখে তোমার খেয়ে যাব চুমো।

ইহাও কবিতা-হিসাবেই উপভোগ্য। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গানটির মধ্যে এই কল্পনাই একটি তত্ত্বরূপে উঁকি দিয়াছে। কবি মৃত্যু হইতে মুক্তি, বা ব্যক্তির অমরত্বের যে আশ্বাস এখানে ঘোষণা করিতেছেন, তাহা একটা তত্ত্বগত আশ্বাস মাত্র, অথচ সেই তত্ত্বজ্ঞান ও প্রাণের কামনার মধ্যে একটা বিরোধ রহিয়াছে। এখানে ব্যক্তি-চেতনাও যেন লোপ

পাইতেছে না, বিশ্ব-চেতনার মধ্যেও তাহা জাগিয়া থাকিতে চায়; যে রূপরসসম্ভোগ ব্যক্তি-দেহে ব্যক্তির চেতনাতেই সম্ভব, তাহাকেই দেহহীন নৈর্ব্যক্তিক চেতনায় ভোগ করিতে চায়। জীবনের প্রতি এই অতি গভীর ও দুশ্ছেদ্য মমতার বশে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে কখনই একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেন নাই, তাহাকে বার বার দূরে রাখিতে চাহিয়াছেন। যৌবনে একদা তিনি মৃত্যুকে সম্বোধন করিয়া এই যে বলিয়াছিলেন—

এ যদি সত্যই হয় মৃত্তিকার পৃথী'পরে
মুহূর্ত্তের খেলা,
এই সব মুখোমুখী এই সব দেখা শোনা
ক্ষণিকের মেলা;

* * *

তুমি শুধু চিরস্থায়ী, তুমি শুধু সীমাশূন্য
মহা পরিণাম।
যত আশা যত প্রেম তোমার তিমিরে লভে
অনন্ত বিশ্রাম,
তবে মৃত্যু দূরে যাও, এখনি দিয়োনা ভেঙে
এ খেলার পুরী,
ক্ষণেক বিলম্ব কর, আমার দু'দিন হ'তে
করিয়ো না চুরি।

ইহাই তাঁহার প্রাণের অকপট উক্তি, এই মনোভাবই মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত মনোভাব। ইহারই বশে মৃত্যুকে দূরে রাখিবার আকুল আগ্রহে তিনি কত ভাবেই না জীবনের অমৃত-রূপ ধ্যান করিয়াছেন!

৪

তথাপি মনে হয়, আমরা তাঁহার যে-জীবন কাব্যের চলচ্চিত্র-পটে নানা বর্ণে বিলসিত হইতে দেখিয়াছি, তাহার অন্তরালে আত্মার যে নিশ্চল নিষ্কম্প জ্যোতিঃশিখা 'ঘূর্ণির মাঝখানে একটি বিন্দু'র মত স্থির হইয়া বিরাজ করিতেছিল—তাহার সন্ধান কখনও পাই নাই। যে পুরুষ জীবনের এই নাট্যশালায় অজস্র ফুল ও অফুরন্ত আলোর আয়োজন আপনিই করিয়া লইয়াছিলেন—তিনি যে অন্ধকারকে কখনও ভোলেন নাই, তাহা আমরা দেখিয়াছি; কিন্তু এত মমতা, এত মোহের মধ্যেও যে বিশ্বাস তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে চিরদিন অটুট ছিল, যাহার বলে

তিনি সকলই জানিয়া শুনিয়া এই অনিত্যের সঙ্গে নিত্যের খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন—সে কথা তিনিই জানিতেন, আমরা জানিতাম না। তাই মৃত্যুর তরণীতে পা দিবার সময়ে তিনি যখন সেই অনিত্য লীলার নটবেশ ত্যাগ করিয়া নিত্যের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন, তখন আমাদের চমকিত হইবার কারণ থাকিলেও, কবির আত্মা চমকিত হয় নাই; তিনি অতি ধীর গম্ভীর দৃঢ় কণ্ঠেই তাঁহার আত্মার সেই অভয়-মন্ত্র ঘোষণা করিলেন। মৃত্যুর বিভীষিকা যেমন তাঁহাকে জীবনের প্রতি বিমুখ করিতে পারে নাই, তেমনই জীবনের হাসি-কান্নায় নিজের প্রাণকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়াও, তিনি মৃত্যুকে কখনও বিস্মৃত হন নাই, যথাসময়ে তাহার দাবী মিটাইয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন। মৃত্যুর উৎসঙ্গে বসিয়াই তিনি নিজের অফুরন্ত প্রাণশক্তির বলে জীবনকে একটি উৎসবশালায় পরিণত করিয়াছিলেন—মৃত্যুকে জয় করিবার ভাবনাই যেন তাঁহার ছিল না। আমরা কবির সেই প্রাণের লীলাকে তাঁহার কবিতার মধ্যে যে-রূপে প্রকাশ পাইতে দেখিয়াছি—কবি হয়তো নিজে কখনও তাহাকে ঠিক সেই রূপে দেখেন নাই; আমাদের নিকটে তাহা যেমন ছিল, কবির নিকটে তেমন ছিল না। সেই একান্ত একক আত্ম-সাক্ষাৎকারের দিকটিকে কবি তাঁহার কাব্য-সাধনাতেও পৃথক রাখিয়া-ছিলেন—সেই দিকটি আমাদের চোখে পড়িবার নয় বলিয়াই কখনও পড়ে নাই। এই জীবন-রঙ্গভূমির নেপথ্য-অন্তঃপুরে—যেখানে কোন দর্শক নাই, শ্রোতা নাই, যেখানে রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শের বিচিত্র বেশ-বিলাস, আলো-ছায়ার অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল সরিয়া 'মুছিয়া যায়, সেখানে রূপশিল্পী নিজেকে নিজের সৃষ্টি হইতে পৃথক করিয়া দেখে; সেখানে যে আত্মসাক্ষাৎকার অনিবার্য্য—রবীন্দ্রনাথ, রূপের ভাষাতেই অরূপের সুর যোজনা করিয়া, তাঁহার গানগুলিতেই, নিজের ব্যক্তি-চেতনার শেষ স্বাক্ষর দিয়া তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কারণ, প্রাণের সেই গভীরতম আকুতি ও আশ্বাস—সেই অতিশয় আত্মগত অনুভূতি—জাগ্রত ব্যক্তি-চেতনাকেও অতিক্রম করে, তাহা অনির্ব্বচনীয়; তাই তাহাকে গানের সুরেই কথঞ্চিৎ ব্যক্ত করা যায়। সে সুরও যেন নিজের সঙ্গে নিজেরই আলাপন—অন্যের নিকটে তাহা স্পষ্ট হইবার নয়।—

আমার একটি কথা বাঁশী জানে,
বাঁশীই জানে।
ভ'রে রৈল বুকের তলা
কারো কাছে হয়নি বলা
কেবল ব'লে গেলেম বাঁশীর
কানে কানে।

কিংবা—

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন-পরে—
প্রিয়তম হে জাগো, জাগো, জাগো।...
জীবনে আমার সঙ্গীত দাও আনি',
নীরব রেখোনা তোমার বীণার বাণী—
হৃদয় পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে,
তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে—
প্রিয়তম হে, জাগো, জাগো, জাগো।

অথবা—

নিবিড় ব্যথায় ফাটিয়া পড়িবে প্রাণ,
শূন্য হিয়ার বাঁশিতে বাজিবে গান,
পাষাণ তখন গলিবে নয়ন-জলে।

এই গানের ভিতর দিয়াই কবি নিজের গভীরতম বেদনা, কামনা বাসনা, আশা ও বিশ্বাস—প্রাণের অতিশয় নিভৃত নির্জ্জনে—যেন সকলের অগোচরে—যে-দেবতার নিকটে নিবেদন করিয়াছিলেন, সে দেবতা কি শুধুই জীবনের দেবতা, না শুধুই মৃত্যুর? যখন শুনি—

শতদল-দল খুলে যাবে থরে থরে
লুকানো রবে না মধু চিরদিন তরে।
আকাশ জুড়িয়া চাহিবে কাহার আঁখি,
ঘরের বাহিরে নীরবে লইবে ডাকি,
কিছুই সেদিন কিছুই রবেনা বাকি,
পরম মরণ লভিব চরণ-তলে।

তখন কোন প্রশ্নই আর থাকে না।

এই যে তাঁর এক প্রকার পরম আশ্বাসের অনুভূতি, ইহা আপনাকে নিঃশেষে হারাইয়া ফেলার—একটি চরম পূর্ণতার মধ্যে আপনাকে শূন্য করিয়া দেওয়ার যে 'অকূল শান্তি ও বিপুল বিরতি', তাহারই

পূর্ব্বাস্বাদ। এই যে মৃত্যু—এ মৃত্যু রূপপিপাসার গুঞ্জরণ-শেষে মধুপানে নীরব হওয়ার মৃত্যু। এ অবস্থা মানুষের সাধারণ অনুভূতির অতীত, ইহাকে বাক্যের দ্বারা বোধগম্য করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ এখানে কবি নন—মিষ্টিক-রসের সাধক। এ অবস্থায় জীবনের প্রতি মমতা, এবং তাহারই ফলে মৃত্যুকে আড়ালে রাখিবার কোন প্রয়োজনই আর নাই; এমনও বলা যাইতে পারে যে, এ অবস্থায় পৌঁছিলে জীবন ও মৃত্যু দুইয়েরই কোন সাক্ষাৎ চেতনা আর থাকে না। অতএব, রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের সেই বৃহত্তর ও প্রায় সর্ব্বকালীন যে ভাব-সাধনা—যাহাতে মৃত্যুর সঙ্গে লুকাচুরি খেলার একটি নূতন রসে তিনি আমাদের মনকে আকুল এবং প্রাণকে জীবনেরই পূজায় উন্মুখ করিয়াছেন, তাহাই কবির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের নিদান।

> জীবনের ধন কিছুই যাবেনা ফেলা
> ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
> পূর্ণের পদপরশ তাদের 'পরে।

—এই যে আশ্বাস, ইহাই মানব-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। এক দিকে জীবন-বিরহ, ও অপর দিকে মৃত্যু-মিলন—এই উভয়েরই গান তিনি কত ছন্দে কত সুরে গাহিয়াছেন; কিন্তু তথাপি, মৃত্যুর সহিত মিলনের সুখ নয়—জীবনের বিরহ-ভয়ই তাঁহার কাব্যে জীবনকে যে দুর্ল্লভতার গৌরব দান করিয়াছে, তাহাই আমাদিগকে চরিতার্থ করে। কবি রবীন্দ্রনাথের সাধনায় নানা স্তর আছে—সোপান-পরম্পরাও হয়তো আছে; একই মন্ত্রের সাধনায় তিনি হয়তো আসন পরিবর্ত্তন করিয়াছেন; কিংবা যেখানে পৌঁছিয়াছেন, সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন; তাহাতে কখনও প্রেমের অতৃপ্তি-সুখ, কখনও ভক্তির আত্মসমর্পণ, কখনও জ্ঞানের দৃঢ় প্রত্যয় আছে—কিন্তু কোন অবস্থাতেই তিনি জীবনকে লেশমাত্র অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস করেন নাই। এই জগৎ ও জীবনের প্রতি যে আসক্তি তাহা যদি একটা মোহমাত্রই হয়, তথাপি সেই মোহই মুক্তিরূপে জ্বলিয়া উঠিবে—একদা তাঁহার কবিচিত্তে এই যে প্রত্যয় জাগিয়াছিল, তাহার পশ্চাতে এক সুগভীর উপলব্ধি ছিল; সেই উপলব্ধিও অতি উৎকৃষ্ট বাণীর প্রকাশ পাইয়াছিল। তেমন আশ্বাসবাণী তাঁহার কাব্যে আর কোথাও তেমন ভাবে ফুটিয়া

উঠে নাই। সে বাণী যেন একটি প্রকাশ—একটি Revelation! তাহাতে ভাব-কল্পনার সুস্পষ্ট প্রভাব থাকিলেও, সে বাণী যেন এক অপৌরুষেয় প্রজ্ঞার আলোকে সমুজ্জ্বল। আমি এখানে কবির সেই উক্তিগুলি উদ্ধৃত করিতেছি :—

প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

এবং—

চিরকাল একি লীলা গো—
অনন্ত কলরোল।
অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে
অদ্ভুত এই দোল।
দুলিছ গো দোলা দিতেছ
পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে
আঁধারে টানিয়া নিতেছ।
* *
ডান হাত হ'তে বাম হাতে লও
বাম হাত হ'তে ডানে।
নিজ ধন তুমি নিজেই হরিয়া
কী যে করো কে বা জানে!
* *
এই মত চলে চিরকাল গো,
শুধু যাওয়া, শুধু আসা।
চিরদিনরাত আপনার সাথ
আপনি খেলিছ পাশা।
আছে ত' যেমন যা' ছিল
হারায়নি কিছু, ফুরায়নি কিছু
যে মরিল যে বা বাঁচিল।...
আছে সেই আলো, আছে সেই গান
আছে সেই ভালবাসা।
এই মত চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা।

—মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের বাণী ইহার পরে আর কোথাও পূর্ণতর বা স্ফুটতর হইয়া উঠে নাই। ইহার নিকটে—

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি,
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।

—এক প্রকার তত্ত্বরসের কুহক-সৃষ্টি বলিয়াই মনে হয়।

৫

কিন্তু কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি! এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছিলাম এই বলিয়া যে, রবীন্দ্রনাথের জীবনকে, ও সেই জীবনের সাধনাকে আমরা এতকাল যে ভাবে যে রূপে বুঝিয়াছিলাম, আজ তাঁহার মৃত্যু সংক্রান্ত কতকগুলি ব্যাপারে সেই জীবন ও সেই সাধনার সম্পর্কে আমাদের মনে একটা সংশয়-ব্যাকুলতার সৃষ্টি হইয়াছে। জীবনকে নূতন করিয়া দেখিবার জন্য যে আলোক তিনি জ্বালিয়াছেন—উপনিষদের সেই ঋষিমন্ত্র—সেই "মধুবাতা ঋতায়তে"-মন্ত্রের যে কবি-ভাষ্য তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের বহুকালের অভ্যস্ত সংস্কার—জীবনের বহিঃপ্রাঙ্গণে যে পরলোক ও মৃত্যুর অন্ধকার যুগ যুগ ধরিয়া ঘনাইয়া উঠিয়াছিল—তাহার ঘোর কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার স্বরচিত ও অভিপ্রেত যে মন্ত্রগান সহকারে তাঁহার আভ্যুদয়িক সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাতে—মৃত্যুর সেই রহস্যান্ধকার জীবনের উপরে আবার তেমনই ভাবে নামিয়া আসিয়াছে, জীবন যেন নিতান্তই ক্ষুদ্র তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। আমার চিত্তে এই যে ভাবান্তর ঘটিয়াছে, ইহার আরও প্রকৃষ্ট কারণ আছে। মৃত্যু যখন আসন্ন, এবং আরও পরে যখন কবি তাহার প্রায় সাক্ষাৎ-মূর্ত্তি দেখিলেন, তখন তিনি যে দুই কবিতায় তাঁহার চরম বাণী লিপিবদ্ধ করিলেন, তাহাও কম অর্থপূর্ণ নয়; আমি তাহাই স্মরণ করিয়া প্রসঙ্গের আরম্ভে কবির আজন্ম-সাধনায় মৃত্যুকে জয় করিবার সেই প্রয়াসকে আর এক চক্ষে দেখিয়াছি। হয়তো সে দেখাও ঠিক নহে, গূঢ়তর তত্ত্বদৃষ্টির সাহায্যে কবির সেই সাধনাকে একটি নির্দ্বন্দ্ব-ধারণার উপরে প্রতিষ্ঠিত করা খুব সহজ, অথবা সম্ভব। কিন্তু আজ কোনরূপ তত্ত্বের গহনে প্রবেশ করিবার মত প্রাণের অবস্থা নয়। তাহার উপর, কবির সেই চরম বাণী প্রাণ মন বিকল করিয়াছে। এক্ষণে আমি সেই কবিতা দুইটি হইতে কয়েকটি বিশেষ পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া, তাহাদের অর্থ আমি যেমন বুঝিয়াছি, তাহাই বলিব।

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি'
বিচিত্র ছলনা জালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।...
অনায়াসে যে পেয়েছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

এবং—

দুঃখের আঁধার রাত্রি বার বার
এসেছে আমার দ্বারে।...
যতবার ভয়ের মুখোস তার করেছি বিশ্বাস,
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হার-জিত খেলা জীবনের এ মিথ্যা কুহক,
...দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।

এখানে জীবন ও মৃত্যু দুইয়েরই এক মূর্ত্তি; জীবন সরল-বিশ্বাসীকে মিথ্যার ফাঁদে ফেলিবার জন্য সৃষ্টির পথ বিচিত্র ছলনাজালে আকীর্ণ করিয়াছে, এবং মৃত্যুও আঁধারে তাহার নিপুণ শিল্প—'ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি'—ছড়াইয়া রাখিয়াছে, ইহাও জীবনেরই মিথ্যা কুহক—'দুঃখের পরিহাসে ভরা'। এক দিকে ছলনা, আর এক দিকে ভয়—জীবন ও মৃত্যু কেহই সত্য, শিব, বা সুন্দর নয়। কিন্তু কবি এই প্রবঞ্চনাকেও মূল্যহীন মনে করেন নাই, কারণ, যে মহৎ—যে আপনার অন্তরের চিরস্বচ্ছ, ঋজু, বিশ্বাস-সমুজ্জ্বল পথে এই কুটিলকে জয় করে, ইহাকে সহ্য করিয়াই—

সত্যেরে সে পায় আপন আলোকে ধৌত
অন্তর অন্তরে

—অর্থাৎ, যে ইহাকে অস্বীকার করিবার প্রয়োজন অনুভব করে নাই—'লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত'। কিন্তু, এই ছলনাকেই অনায়াসে সহিয়া—

সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

এই উক্তি আরও গভীর গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে ইহার শিথিল বাক্যযোজনায়; ভাষা যেন এই মর্ম্মান্তবিদারী চরম অভিজ্ঞতার অর্থ বহন করিতে না পারিয়া, একপ্রকার মন্ত্রচ্ছন্দের বাণীরূপ ধারণ করিয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক; কারণ, ইহা সেই সময়ের উক্তি—যখন এক অতিতীক্ষ্ণ দেহচেতনা-কাতর আত্মার শেষ মর্ত্ত্যবন্ধন খসিয়া যাইতেছে; ইহাতে কেবল সেই প্রাণান্তিক বিশ্বাসের ঘোষণাই আছে—যাহাকে সম্বল করিয়া সেই জীবনক্লান্ত পথিক অবশেষে অনন্তের পথে যাত্রা করিলেন।

তথাপি, ইহাতেও—জীবনের ছলনা, মৃত্যুর নিপুণ শিল্প প্রভৃতির—অর্থ খুব স্পষ্ট। সে অর্থ এই যে, শেষ পর্য্যন্ত আত্মাই আত্মার পরম নির্ভর; আত্মার বাহিরের যাহা-কিছু, তাহার একটা নেতি-মূলক (negative) মূল্যই আছে—জীবন ও মৃত্যু দুইয়েরই বন্ধনপাশ এই হিসাবে তুচ্ছ নয় যে, তাহাকে কাটিয়া বাহির হইবার শক্তিই আত্মার মহত্ত্ব প্রমাণ করে। এই মিথ্যা—সুন্দর অথবা ভয়ঙ্কর হইয়াও—আত্মার কোন ক্ষতি করিতে পারে না; কারণ, আত্মার অন্তরের আলোকে সত্যই ধৌত হইয়া উঠে।

ইহাই কবির শেষ বাণী। এ বাণী এক দিকে যেমন সত্য-স্বীকারের বাণী—আত্মার অভয়-ঘোষণার বাণী, তেমনই, আর এক দিকে ইহা জীবনকে বিদায় দেওয়ার—জীবনের সহিত সকল সম্বন্ধ মুছিয়া ফেলার বাণী। কবির আত্মা যেন জীবনের সকল দেনা শোধ করিয়া মৃত্যুস্নানে নির্ম্মল ও শুচি হইয়া উঠিয়াছে। কবি এতদিনে জীবনের যে পরিণামকে বরণ করিলেন, সে পরিণাম পূর্ব্বেও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, কারণ তাঁহাকেই আমরা গাহিতে শুনিয়াছি—

চোখের আলোয় দেখেছিলেম
চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখব, যখন
আলোক নাহিরে।
ধরায় যখন দাওনা ধরা
হৃদয় তখন তোমায় ভরা,

এখন তোমার আপন আলোয়
তোমায় চাহিরে।
তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম
খেলার ঘরেতে,
খেলার পুতুল ভেঙে গেছে
প্রলয় ঝড়েতে…

অতএব এই মনোভাব—এই বৈরাগ্যের সুর অনেক পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, প্রাণের মোহের উপরে এই আধ্যাত্মিক মুক্তি-পিপাসা জয়ী হইয়া উঠিতেছিল। আজ তাঁহার এই শেষের বাণী শুনিয়া আমরা চমকিত হইয়াছি বটে, মনে হইতেছে, রবীন্দ্রনাথের সেই দুর্দ্ধর্ষ মানবতাও অবশেষে আধ্যাত্মিকতার নিকটে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে—তিনি জীবনের মধ্যেই, 'সহস্র বন্ধন মাঝে মুক্তির স্বাদ' লাভ করিতে পারিলেন না; শেষ পর্য্যন্ত সেই বন্ধন ছিন্ন করিয়াই তাঁহাকে আত্মার মুক্তি বা অভয় প্রার্থনা করিতে হইল। কিন্তু হয়তো আমরাই ভুল করিয়াছিলাম; এতদিন জীবনের বহিরাবরণে বিচ্ছুরিত কবি-শিল্পীর সেই অসাধারণ শিল্প-প্রতিভার রশ্মিচ্ছটাই আমরা দেখিয়াছি, সেই শিখার অন্তঃস্থলের স্থিররশ্মি দেখি নাই। জীবনকে যে বাহিরের দৃষ্টিতে তিনি দেখিয়াছিলেন, সে দৃষ্টি তিনি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন; যাহা শুধু বাণীতেই ধরা যায়, কেবল তাহাই নয়—যাহাকে বাণীতেও ধরা যায় না, তাহাকেও তিনি সুরে ধরিয়া দিয়াছেন; কিন্তু যাহা বাণী ও সুর দুইয়েরই অতীত, তাহাকে তিনি সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন—তাঁহার মৃত্যুকালীন মুখ-জ্যোতি তাহার আভাস মাত্র দিয়াছে। সেই আভাসের সাহায্যেই রবীন্দ্র-জীবন ও রবীন্দ্র-কাব্য আর একবার ভাল করিয়া আদ্যোপান্ত বুঝিয়া লইতে হইবে।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

চিত্রশিল্পীর রবীন্দ্রনাথ

চিত্রশিল্পীদের সহিত কবি যেন কোনও নিগূঢ় সম্পর্ক রাখিয়া গিয়াছেন। পরিণত যৌবনে 'ছিন্নপত্রে'র এক স্থানে লেখা দেখিতে পাই—

আমি আলো ও বাতাস এত ভালবাসি। গেটে মরবার সময়ে বলেছিলেন More light—আমার যদি সে সময়ে কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করবার থাকে ত আমি বলি More light and more space.

Lighted space লইয়া যাহাদের কারবার, এ কথা তাহাদের পক্ষে বেদবাক্য। যদি কথাটি কোনও মুহূর্ত্তের আবেগে বলা হইত, তাহা হইলে ইহাকে তাঁহার গ্রন্থাবলীতে একটি উদ্‌ভ্রান্ত রেখামাত্র বলিয়া মনে করিতে পারিতাম, কিন্তু সারাজীবনের কাব্যসাধনায় রং-বেরঙের মাল-মসলা সংযোগে আলো-অন্ধকারের লুকাচুরির লীলাভঙ্গি লিপিবদ্ধ করিয়া কবিবর চিত্রকরের সহিত নিকটতম সম্বন্ধই পাতাইয়া গিয়াছেন। সেই ভরসায় রং-তুলির সেবক এই লেখক আজ মুখর।

অতি শৈশবে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' চরণটি রবীন্দ্রনাথকে একদিন চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল, যেন চাক্ষুষ পরিচয়ে কোনও হারানিধির সন্ধান পাইলেন, পাছে হারাইয়া যায় তাই সারাদিন গুনগুন করিয়া মনশ্চক্ষে ধরিয়া রাখিলেন। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' চোখে ভাল লাগার ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু ছন্দের মিলে তাঁহার কাব্যজীবনে প্রথম প্রধান স্থান পাইয়া অসামান্য মান লাভ করিল। কিছু দিন পরের ঘটনা—শিশুকালের সাহিত্যরস সম্ভোগের স্মৃতিস্বরূপ তিনি লিখিয়াছেন, "বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বাণ—এ ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত।" নিছক চোখে ভাল লাগার অনুভূতি দিয়াই তাঁহার কাব্যজীবনের উন্মেষ।

সকলেই জানেন যে, কবি বাল্যকালের শাসনে বহির্জগৎকে কেবল আভাসে মাত্র দেখিতে পাইতেন, দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার সাধ মিটিত না। পলাইয়া ও লুকাইয়া উন্মুক্ত প্রকৃতিকে দেখার আনন্দই যেন তাঁহার প্রথম গোপন আনন্দ। রুদ্ধদুয়ার বহিঃপ্রকৃতির সাহচর্য্য হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাকে কিরূপ উন্মনা করিত, জীবনব্যাপী সাহিত্য-সাধনায় তাহারই চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। 'জীবন-স্মৃতি'তে উল্লেখ দেখি—

আমাদের বাড়ীর ছাদটার পিছনে দেখিলাম ঘন সজল নীল মেঘ রাশীকৃত হইয়া আছে—মনটা তখনি এক নিমেষে নিবিড় আনন্দের মধ্যে আবৃত হইয়া গেল—সেই মুহূর্ত্তের কথা আজিও আমি ভুলিতে পারি নাই। সকালে জাগিবামাত্রই সমস্ত

পৃথিবীর জীবনোল্লাসে আমার মনকে তাহার খেলার সঙ্গীর মত ডাকিয়া বাহির করিত, মধ্যাহ্নে সমস্ত আকাশ এবং প্রহর যেন সুতীব্র হইয়া উঠিয়া আপন গভীরতার মধ্যে আমাকে বিবাগী করিয়া দিত এবং রাত্রির অন্ধকার যে মায়াপথের গোপন দরজাটি খুলিয়া দিত তাহা সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা ছাড়াইয়া রূপকথার অপরূপ রাজ্যে সাত সমুদ্র তের নদী পার করিয়া লইয়া যাইত।

পরবর্ত্তী একটি কবিতায়, রুদ্ধদুয়ার কক্ষের—গোপন অশ্রু পাছে মুছিয়া যায়, তাই মায়াবশত বিনাসুতার মালাখানি ছন্দে গাঁথা রহিল—

রৌদ্র মাখান অলস বেলায়
তরু মর্ম্মরে ছায়ার খেলায়
কী মূরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে ওঠে যে আভাষি
হে সুদূর, আমি উদাসী।

কৈশোরে ভানুসিংহের পদাবলীতে পাই—

গোপবধূজন বিকশিত যৌবন,
পুলকিত যমুনা মুকুলিত উপবন
নীল নীর পর ধীর সমীরণ
পলকে প্রাণমন খোয়।

তাহার পর যৌবন-উন্মেষে—

ঝিলিমিলি করে পাতা, ঝিকিমিকি আলো,
আমি ভাবিতেছি কার আঁখিদুটি কালো!
কদম্ব গাছের সার চিকণ পল্লবে তার
গন্ধে ভরা অন্ধকার হয়েছে ঘোরালো।

কোন্ কবি কবে ভালবাসার আবেগকে এমন চোখে ভাল লাগার সহিত মিশাইয়া অনুভব করিয়াছেন? 'চলেছি কিসের অন্বেষণে' এই জিজ্ঞাসায় দেখার সীমানা-প্রান্তে দাঁড়াইয়া কে এমন ইঙ্গিত দিতে পারিয়াছেন?—

বল দেখি মোরে শুধাই তোমায় অপরিচিতা,
ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল গলিয়া পড়িছে অম্বর-তল
দিক্‌বধূ যেন ছলছল আঁখি অশ্রুজলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার
ঊর্ম্মিমুখর সাগরের পার,
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির চরণতলে।

প্রকৃতির গোপন রহস্যের সন্ধান পাইয়া তিনি নিজেই তাহা আঁকিয়াছেন, কোনও চিত্রকরের অপেক্ষা রাখেন নাই।—

আমি যে গোপন কথাটি শুনিবার জন্য সাধাসাধি করিতেছি, তাহা যেন বনশ্রেণীর শ্যামলিমার মধ্যেই মিলাইয়া আছে, পূর্ণিমারাত্রে নিস্তব্ধতা শুভ্রতার মধ্যে ডুবিয়া আছে, দিগন্তরালের নীলাভ সুদূরতার মধ্যে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে—তাহা যেন সমস্ত জলস্থল আকাশের নিগূঢ় গোপন কথা।

আলো-অন্ধকারে উদ্ভাসিত পরিদৃশ্যমান জগৎকে চিত্রিত করিতে গিয়া তাঁহার কাব্যধারায় যেন রামধনুর রঙিন দীপ্তি উৎসারিত হইয়া পড়িতেছে।—

পৃথিবীর রাত্রিটি যেন তার এলোচুল, পিঠ-ছাপিয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নেমে পড়েছে। কিন্তু সৌরজগৎলক্ষ্মীর শুভ্রললাটে একটি কৃষ্ণতিলও সে নয়। ঐ তারাগুলির মধ্যে যে-খুসি সেই আপন সাড়ির একটি খুঁট দিয়ে এই কালিমার কণাটুকু মুছে নিলেও তার আঁচলে যেটুকু দাগ লাগবে তা অতিবড় নিন্দুকের চোখেও পড়বে না।

অন্ধকারে তাঁহার কালোর বাঁশি সুদূর হইতে নিরন্তর বাজিয়া বাজিয়া এই ধরণীর আলোয়-ধরা রাধাকে আকর্ষণ করিতেছে। কবিরা স্বভাবতই দৃশ্যবস্তু উপমা হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু কে এমন সুদীর্ঘজীবনব্যাপী আলোছায়ার লুকাচুরি,—বর্ষামেঘের নৃত্য, শরৎ আলোর ঝলকানি, বসন্তে উতলা ধরার বন্দনা করিয়াছেন? কে দেবসভার উর্ব্বশীকে 'উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা, অকুণ্ঠিতা'-রূপে দেখিয়াছেন? কাহার চক্ষু সজল করিয়া সন্ধ্যার এই রূপ-বর্ণনা ফুটিয়া উঠে?—

মনে হয় যেন একটি সোনার চেলিপরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে···যুগযুগান্তর কাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে মৌনমুখে ভ্রমণ করে আসচে।

অগণিত উদাহরণ!

চিত্রশিল্পীর মালমসলা উপমা-হিসাবেই ব্যবহার করিয়া কবি ক্ষান্ত হন নাই। তাহাদের ক্ষমতায় বিশেষ আস্থা ছিল না বলিয়াই বোধ করি নিজেই তাঁহার বর্ণনাগুলি ছবি আঁকার বিভিন্ন রীতিতে প্রদীপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মকালের স্বল্প পরেই ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সুদূর প্রতীচ্যে Impressionist movement-এর ঢেউ উঠিয়াছিল। এ দেশে যে শিল্পীশ্রেষ্ঠ জন্মগ্রহণ করিলেন, তাঁহার চক্ষে যেন কে অলক্ষ্যে সেই সুদূরের নীলাঞ্জনরেখা টানিয়া দিল। প্রকৃতির রূপে নিজের মনের মাধুরী মিশাইলে Indirect painting-এর নমুনাই বেশি থাকিবে সন্দেহ নাই। যথা—

মুদিত আলোর কমল কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণপুটে—
উতরিবে যবে নবপ্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।

কিংবা—

আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া গগনে ছড়ায়ে এলোচুল
চরণে জড়ায়ে বনফুল।
ঢেকেছ আমারে তোমার ছায়ায়
সঘন সজল বিশাল মায়ায়,
আকুল করেছ শ্যামসমারোহে হৃদয়-সাগর-উপকূল
চরণে জড়ায়ে বনফুল।

অথবা—

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হ'ল যেন খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার।
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে;
অন্ধকার গিরিতট তলে,
দেওদার তরু সারে সারে,
মনে হ'ল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে।

আরও এমন অনেক কিছুই উল্লেখ করা যায়—

সেদিন শুভ্র পাষাণ-ফলকে পড়িল রক্তলিখা।
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদ কাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপ-পদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ আরতির শিখা।

চোখের সামনে দেখিয়া আঁকা ছবির চিহ্নও কম নাই। প্রত্যক্ষ দেখা এবং দেখানোর (direct painting) কিরূপ জীবন্ত ছাপ রহিয়াছে।—

আজ বারি ঝরে ঝরঝর
ভরা বাদরে
আকাশভাঙা আকুলধারা
কোথাও না ধরে।
শালের বনে থেকে থেকে
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে
মাঠের 'পরে।
আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে নৃত্য কে করে॥

কিংবা—

ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে দিগঙ্গনার নৃত্য
হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত।...
প্রভাত বেলায় হেলাভরে করে অরুণ মেঘেরে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছ।

বোলপুর খোয়াইয়ে তিনি দেখিয়াছেন 'উর্ম্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়'—'ঐ বুকফাটা ধরণীর রক্তিমা'—

হঠাৎ উঠেছে এক একটা যূথভ্রষ্ট তালগাছ
দিশেহারা অনির্দ্দিষ্টকে যেন দিক দেখাবার ব্যাকুলতা।

সেখানকারই ঝড়ের বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

এই পথে ধেয়ে এসেছে কাল-বৈশাখীর ঝড়,
গেরুয়া পতাকা উড়িয়ে,
ঘোড় সওয়ার—বর্গী-সৈন্তের মত,
কাঁপিয়ে দিয়েছে শাল সেগুনকে,
নুইয়ে দিয়েছে ঝাউয়ের মাথা,
হায় হায় রব তুলেছে বাঁশের বনে,
কলাবাগানে করেছে দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য,
ক্রন্দিত আকাশের নিচে ঐ ধূসর বন্ধুর
কাঁকরের স্তূপগুলো—দেখে মনে হয়েছে
লাল সমুদ্রে তুফান উঠল,
ছিটকে পড়ছে তার শীকরবিন্দু।

চীন-জাপানী ছবি, কুয়াশার অস্পষ্ট পটভূমিকায় গতিময় রেখা স্পষ্টতার ধারাল চিহ্ন কাটিয়া আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। একটি বর্ণনা মনে পড়িতেছে।—

একটা খুব জ্বলজ্বলে মস্ত তারার ছায়া দীর্ঘতর হয়ে জলের মধ্যে অনেকদূর পর্য্যন্ত একটা জ্বালাময় বিদ্ধ বেদনার মত থরথর করে কাঁপছিল। নদীর দুই তীর অস্পষ্ট আলোকে এক গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন, অচেতন। মাঝখান দিয়ে একটা নিদ্রাহীন উন্মত্ত অধীরতা ভরপুর বেগে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে চলেছে।

লেখনী-চিত্রে আধুনিক (Post-impressionist) রীতির সঙ্গেও শেষ-বয়সের লেখায় একটা নিগূঢ় যোগ দেখা যায়। কবির দৃষ্টি বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে যখন ক্ষীণ ও অসহায় হইয়া আসিল, তখন যেন একটা উদ্বেগের আবেগে খানিকটা দেখা, খানিকটা স্মৃতির রেখা মিশাইয়া বিলুপ্তপ্রায় চিহ্নগুলিকে ধারালো ছন্দের দোলে ও বিচিত্র বাক্যবিন্যাসে

ধরিয়া রাখিলেন। শুনিয়াছি, Cezanne-এর অনেক ছবিই ক্ষীণায়মান দৃষ্টিতে আঁকা। সেইরূপ রবীন্দ্রনাথের শেষ-বয়সের রচনা অপরূপ রঙের ছটায় বিকশিত। যথা—

উড়েছে তোমার ধ্বজা
মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের জলদর্চ্চি রেখা।

অথবা—

হেঁকে উঠল ঝড়
লাগাল প্রচণ্ড তাড়া—
সূর্য্যাস্ত সীমার—রঙীন পাঁচিল ডিঙিয়ে
ব্যস্তবেগে বেরিয়ে পড়ল মেঘের ভীড়,
বুঝি ইন্দ্রলোকের আগুন-লাগা হাতিশালা থেকে
গাঁ গাঁ শব্দে ছুটছে ঐরাবতের কাল কাল শাবক শুঁড় আছড়িয়ে।
মেঘের গায়ে গায়ে দগ্‌দগ্‌ করছে লাল আলো,
তার ছিন্ন ত্বকের রক্তরেখা।
বিদ্যুৎ লাফ মারছে মেঘের থেকে মেঘে,
চালাচ্ছে ঝকঝকে খাঁড়া
বজ্রশব্দে গর্জ্জে উঠছে দিগন্ত ,...
তীক্ষ্ণ হাওয়া সাঁই সাঁই শান দিচ্ছে আর চালাচ্ছে ছুরি—
অন্ধকারের পাঁজরের ভিতর দিয়ে
জলস্থলে শূন্যে উঠেছে
ঘুরপাক খাওয়া আতঙ্ক।

শেষ-বয়সের রচনাতে নূতন ভঙ্গি অনেক থাকিলেও জীবনপ্রভাতে কবিবর বিশ্বলক্ষ্মীর রূপে যে অরূপের রসঘন সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি কখনও ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার এই অভিজ্ঞতাই তাঁহাকে যেন চিরকাল ধরিয়া রাখিয়াছিল; এই ধর্ম্মই তিনি "গৃহিত এব কেশেষু মৃত্যুনা"স্বরূপ পালন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যসাধনায় এবং জীবনযাত্রায় এই কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন।—

যেন নিকষবরণ ঘাটে সন্ধ্যার কালো জলে
অরুণবরণ পা দুখানি ডুবিয়ে বসে আছে অপ্সরী,
অকূল সরোবরে সুরের ঢেউ উঠেছে মৃদুমৃদু,
আমার বুকের কাঁপনে কাঁপন-লাগা হাওয়া
ওকে স্পর্শ করেছে ঘিরে ঘিরে।......

মহাকাল দুইরূপ ধরে—
পরে পরে—
কালো আর সাদা।
কেবলই দক্ষিণে বামে প্রকাশ ও প্রকাশের বাধা
অধরার প্রতিবিম্ব গতিভঙ্গে যায় এঁকে এঁকে—
গতিভঙ্গে যায় ঢেকে ঢেকে।......
ক্ষণিকারে নিয়ে অসীমের এই খেলা,
নববিকাশের সাথে গেঁথে শেষ বিনাশের হেলা,
আলোকে কালের মৃদঙ্গ উঠে বেজে,
গোপনে ক্ষণিকা দেখা দিতে আসে মুখ ঢাকা বধূ সেজে
গলায় পরিয়া হার
বুদ্বুদ মণিকার!

পরিণত প্রৌঢ়ত্বেও তাঁহার সে কী স্পষ্ট স্বীকারোক্তি!—

ওরে কবি তোরে আজ করেছে উতলা
ঝঙ্কার মুখরা এই ভুবন মেখলা
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।

ভুবন-মেখলা যেন চঞ্চল আলোর গতি-পুলকে মুখর।

মহাকালের তাণ্ডবলীলায় মুহূর্ত্তকালগুলি জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিয়া যাইতেছে, শিল্পীর চেষ্টা কলাকৌশলে তাহাদের কোনও মতে ধরিয়া রাখা। যে মুহূর্ত্তটি তাহার চোখ ঝলসাইয়া চলিয়া গেল, উহার কোনও প্রতিবিম্ব, কোনও প্রতীক রাখিয়া যেন সে মহাকালের বিরুদ্ধে যুগযুগান্তর ধরিয়া নবসৃষ্টির অভিযান করিয়া আসিতেছে। মরমুহূর্ত্তগুলির মায়ামুগ্ধ শঙ্কিত-হৃদয় শিল্পী কাহার আশীর্ব্বাদে সৃজনী-প্রতিভা পায়, যাহার বলে সেই মুহূর্ত্তগুলি সে অমর করিয়া রাখিতে পারে?

আজ মাধবী সে-সকলই ফুরাইল, বৃন্ত-ঝরা শিথিল কবরী বিদায় লইল—বসন্ত যে ভোর হইয়াছে! কবির ভাষায় কবিসম্রাটকে বলি—

হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ
সৌন্দর্য্যে ভুলায়ে
কণ্ঠে তার কী মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে।

শিল্পীচক্র
২৬ ভাদ্র ১৩৪৮

শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু

মর্ত্ত্য হইতে বিদায়

বৃহদারণ্য বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ ?
অরণ্যভূমি আঁধার করিয়া শতেক বর্ষ ধরি
শাখাপ্রশাখায় মেলি সহস্র বাহু
মৃত্তিকারস করিয়া শোষণ শিকড়ের পাকে পাকে
নিম্নে বিরচি বহুবিস্তৃত স্নেহছায়া আশ্রয়—
অভ্রংলিহ বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ ?

সারা দেহ জুড়ি প্রদোষে উষায় নভচারী পাখীদের
কূজন ও কোলাহল—
স্তিমিত আলোয় উড়িয়া ক্লান্ত পক্ষের বিধূনন
ভোরের আঁধারে দীপ্ত আশায় ডানা ঝাপটিয়া জাগা।
নীড়ে ও কুলায়ে প্রাণস্পন্দনে চকিত বিচঞ্চল—
বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ ?

অরণ্যশোভা বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ ?
পাদদেশে তার শতসহস্র পাদপ-সম্ভাবনা
খর্ব্বায়তন লতাগুল্মের বিফল বিকারে হত।
রৌদ্রপুষ্ট সবুজ কোথায় ? পাণ্ডুর বনতল—
বনস্পতির মৃত্যুতে তারা পেয়েছে মুক্তি সবে ?
উদার আকাশে মেলিয়া অযুত বাহু
হয়েছে উতলা বিস্তার-কামনায়,
বনস্পতির বিহনে বনে কি জন্মিছে এরণ্ডেরা ?

লালসালোলুপ দৃষ্টি এখনি জাগিছে কাহারো চোখে,
কোনো বঞ্চিত, ওষ্ঠে তাহার ফুটিছে মলিন হাসি—
জীবনের লোভে মৃত্যুশীতল হাসি ;
তবু আমি জানি আশ্রয়হারা কাঁদিতেছে বনভূমি,
অভ্যাসবশে বনস্পতির নিবিড় চন্দ্রাতপ
কামনা করিছে সবে।
ধূসর রৌদ্র ভাল নাহি লাগে, আকাশের গাঢ় নীল ;
বনস্পতির মহিমায় আজো কানন আত্মহারা।
একের মাঝারে সবার সার্থকতা,
অদ্বিতীয় সে একের বিয়োগে বহুর যে কাতরতা
পেতেছে প্রকাশ নয়নে বাষ্প হয়ে,
রৌদ্রদগ্ধ নভপ্রাঙ্গণ করিছে মেঘমেদুর
রহি রহি আজো ধারাবর্ষণে ঝরিছে অবিশ্রাম ;
লতাগুল্মের অরণ্যে হের ঝঞ্ঝার মাতামাতি,
মাথার উপরে আশ্রয় কারো নাই ;
কাননভূমির চির-আশ্রয় একক বনস্পতি—
বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ ?

বিফল উপমা, কোথা অরণ্য, কোথায় বনস্পতি,
কোথা কালিদাস, উজ্জয়িনীর প্রাসাদশিখরে কবি—
কোথায় উজ্জয়িনী ?
শুধু মেঘদূত গগনে গগনে গুমরিছে গুরু গুরু,
পবনে করিয়া ভর
কালসমুদ্র পার হয়ে এল সহস্র বর্ষের।

শত-পারাবত-কূজন-মুখর ভবনবলভি যত
মিশেছে ধূলায়, শুনিতেছি মোরা আজো—
কপোতকাকলি এ কলিকাতায় অলস মধ্যদিনে।

হায় রে উপমা, বিফল উপমা যত!
সকল উপমা হারাইয়া গেছে কাল-তমসার নীরে।
হায়, 'বলাকা'র কবি,
বাঁকা ঝিলমের দুই তীর ব্যাপি নেমেছে অন্ধকার,
জমেছে আঁধার নিরবধি চলা "বিরাট নদী"র জলে!

তুষারমৌলি নগ-অধিরাজ দেখিয়াছি হিমালয়,
স্থিত পৃথিবীর মানদণ্ডের মত—
পূজিয়াছি হিমালয়ে।
যত দেখিয়াছি, তত করিয়াছি বিস্ময় অনুভব।
ভূমিকম্পের প্রবল তাড়নে সহসা কি একদিন
চৌচির হয়ে ফাটিয়া পড়িতে দেখিয়াছ হিমালয়ে?
সহস্রশির বিরাট নগাধিরাজে
গুঁড়া গুঁড়া হয়ে ভাঙিয়া পড়িতে তোমরা দেখেছ কেউ?
আকাশ-আড়াল-করা ব্যবধান একদা নিশীথশেষে
চকিতে দেখেছ বাতাসে উড়িয়া গেছে?
সহসা দেখেছ বিস্মিত আঁখি মেলে
হিমালয় নাই, ধুধু করিতেছে সীমাহীন প্রান্তর,
ধুধু করিতেছে বালি-ঝলসানো সুবিশাল মরুভূমি—
মরীচিকাহীন ভয়াবহ মরুভূমি?

মহা-হিমালয়ে ভাঙিতে দেখেছ কেউ ?
পাদমূলসহ দেবতা-আত্মা হিমচূড়া হিমালয়ে
মৃত্যুর মত কালো কুয়াশায় ঢাকিতে দেখেছ কেউ ?
রবির উদয়ে যে কুয়াশা কভু শূন্যে মিলাবে নাকো,
যে কুয়াশা ছেদি হাসিবে না হিমালয় ;
সুনীল আকাশপটে কোনো দিন তুষারশীর্ষ গিরি
জাগিবে না আর—কারো মনে এই জেগেছে সম্ভাবনা,
কঠিন সম্ভাবনা ?
ভাঙিতে কেহ কি দেখিয়াছ হিমালয়ে ?

বিফল উপমা, কোথা হিমালয় নদীগুহা-আশ্রয়,
কোথা কালিদাস রঘুকুমারের কবি ?
চিতার ভস্ম উড়িছে কি আজো রোদনমুখর রেবামালিনীর কূলে,
স্মৃতিমন্দির উঠেছে কি কোনো, প্রভাতবেলায় পুণ্যলোভীরা সবে
চন্দনমাখা শুভ্রকুসুম উদ্দেশে তাঁর দিতেছে শ্রদ্ধাভরে ?
হরপার্ব্বতী মিলন-কাহিনী সুরসিকজন পড়িতেছে যুগে যুগে,
কুতূহলী মোরা পড়ি অবকাশকালে—
ঘরে ঘরে সবে করি যে কামনা কুমার কার্ত্তিকেয়ে ;
বৈদেহী সাথে ফিরিছে রাঘব শূন্য বিমান-পথে,
আজো দেখি মনে সেই পুরাতন ছবি—
কলকোলাহল-মুখরিত এই নগর কলিকাতায়।

হায় রে উপমা, বিফল উপমা যত,
সকল উপমা হারাইয়া যায় ক্ষণিকের খেলাঘরে ;

হায়, 'ক্ষণিকা'র কবি,
আঁধার নেমেছে "কৃষ্ণকলি"র হরিণনয়ন ছেয়ে,
নেমেছে আঁধার "ময়নাপাড়ার মাঠে"।

*　　　*　　　*

পূর্ণিমাচাঁদ দেখি নি ডুবিতে, আঁধার শ্রাবণনিশি—
শুনিয়াছিলাম শঙ্খঘণ্টারোল,
মেঘগর্জ্জন-অবকাশে মোরা শুনেছিনু সকলেই
ঝুলন-পৌর্ণমাসী রজনীতে সঘন শঙ্খরব ;
বরষাবিদ্ধ তন্দ্রামগ্ন নগরী সে কলিকাতা,
চিৎপুর রোডে বন্ধ হয়েছে যানবাহনের চলা,
মেঘের আড়ালে দেখিনু সহসা হাসিল শারদশশী।

তীর্থযাত্রী একেলা পথিক বৈতরণীর তীরে
সম্বলহীন, তাই তো শঙ্কাহীন—
ওপারে চাহিয়া এপারের ছবি দেখিছে পথিক ধ্যাননিমীলিত চোখে,
এপারের রবি ওপারে ডুবিতে চায়,
এপারে ওপারে আমাদের মাঝে দুস্তর পারাবার।

মহামানবের প্রাণ—
মানবের মাঝে চিরজীবী প্রাণ, সুন্দর ত্রিভুবন,
জীর্ণ খাঁচায় আজ পলাতক মরণোন্মুখ প্রাণ,
ভুবনের রূপ চির অমলিন—তবুও বিবাগী প্রাণ,
শিয়রে তাঁহার জাগিছে কয়টি প্রাণী।
জাগে আর তারা প্রতীক্ষা করে নিশ্বাস গুণে গুণে,

প্রতীক্ষা করে নিশ্বাস রোধ করি,
প্রহর গণিয়া প্রতীক্ষা করে সবে।
শ্রাবণরজনী শিথিলচরণে প্রখর রৌদ্রে কখন আত্মহারা,
প্রভাত হইল রাখী-পূর্ণিমা-দিন,
মাটির ধরণী রাখিতে নারিল তবু
বিদায়প্রার্থী বিবাগী সন্তানেরে।
দূর হতে দেখি জীবনের বুকে মৃত্যুর নিশ্বাস
ওঠে আর ভেঙে পড়ে।

সুশুভ্রফেনশীর্ষ বারিধি মেলি তরঙ্গবাহু
অভ্যাসবশে তটেরে ধরিতে চায়—
মিথ্যা সে খেলা, আমি জানি তার গভীরেতে অনুরাগ।
বিদায়-বারতা শুধু নিশ্বাসে—শান্ত ললাট-পট,
পাণ্ডু ওষ্ঠে স্ফুরে না বিদায়গান ;
পিছু ফিরিবার নাহি কোনো ব্যাকুলতা,
"যাবার বেলায় পিছু ডাকিবার" ছিল না সেদিন কেউ।
সে মহাপ্রাণের শিয়রে জাগিয়া কটি অসহায় প্রাণী—
মূঢ় বিস্ময়ে সহসা দেখিল তারা—
দেখিল সহসা দ্বারে জনতার ভিড়।
মাটির পৃথিবী চঞ্চল হয়ে বাহু বুঝি মেলিয়াছে—
বিদায়প্রার্থী রাখিতে সন্তানেরে ;
তখন সময় নাই।
আকাশে বাতাসে শুধু শোনা যায় অস্ফুট কানাকানি,
প্রাণমৃত্যুর চিররহস্য-কথা—
নিগূঢ় গোপন কথা।

মৃত্যুর কথা কেহ বলিল না, "বারোটা তেরো মিনিট,"
কণ্ঠে কণ্ঠে অতি অসময়ে সময়ের পরিমাপ,
মহাকাল-গতি চকিতে থামিল যেন—
এপারে ওপারে ঘুচে গেল ব্যবধান,
প্রাণমৃত্যুর সব রহস্য শেষ !
আসিল পরম ক্ষণ—
সারা বনভূমি আলোড়ন করি মরিল বনস্পতি,
ভেঙে গেল হিমালয়।

মৃত্যুরে যেবা প্রলুব্ধ করি ডাক দিয়েছিল অর্দ্ধ শতক ধরি
মৃত্যু তাহারে নিয়ে গেল শেষাশেষি ;
নিয়ে গেল ভালবেসে—
রক্ত অধর নিবিড় চুমায় পাণ্ডুর হ'ল কি না
হিসাব তাহার পারে নি রাখিতে কেউ।
গোধূলি-লগনে যায় নি পথিক স্তিমিত অন্ধকারে,
পাখীরা তখনো ফিরে আসে নাই নীড়ে।
দিনের রৌদ্র যখন প্রখরতম
মর্ত্ত্য হইতে বিদায়-বারতা রটিল মর্ত্ত্যভূমে,
মর্ত্ত্য-মানব মোরা—
"স্বর্গ হইতে বিদায়ে"র কবি—নিমীল তাঁহার চোখে
বিদায়-অশ্রু কেহ কি দেখিয়াছিল ?
হায়, কবি হায়, সুন্দর ত্রিভুবন !

স্তম্ভিত ভয়ে শুনেছিনু সবে আর্ত্ত ঘোষণা সেই,
আকাশের পানে তুলিয়া চকিতে শত উৎসুক আঁখি

দেখেছিনু সবে খর-রবিকরে নিখিল পুড়িয়া যায়,
অকরুণ নীলাকাশ।

মৃত্যু, মরণ, সমাপ্তি, শেষ, বিদায় চিরন্তন—
কাব্যের ভাষা যাহাই বলুক, নিঃশেষে শেষ হওয়া
সকল দেহীর মত
অমর কবির চরম সে পরিণাম—
স্তব্ধ হইয়া শুনিলাম কানে শ্রাবণ-দ্বিপ্রহরে,
বিস্ময়ে দেখিলাম,
নিশ্চল দেহে সকল জ্বালার শেষ।
সুতীব্র কশাঘাতে—
অলক্ষ্য সেই অকরুণ কশাঘাতে
দেহে মনে যেন উঠিনু চকিত হয়ে,
চীৎকার করি বলিবারে চাহিলাম—
বলিতে চাহিনু চরম অবিশ্বাসে,
"মর্ত্ত্য মানব মোরা—
ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলেই অসহায়,
ধ্বংস জরার ক্রূর হাত হতে নিস্তার কারো নাই।"

ক্ষণ-বিস্মৃতি—ক্রোধে বেদনায় চাহি অপলক চোখে
পাগলের মত চাহি বিহ্বল চোখে
দেখিনু মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখখানি—
প্রশান্ত মুখে দুটি অপলক আঁখি,
আয়ত নয়নে দৃষ্টি কেবল নাই।
যে আঁখি একদা সূর্য্যের মত জ্বলিত দীপ্ত তেজে
জ্বলিত তীক্ষ্ণ তেজে—
সন্ধানী আলো—চকিতে দেখিত গোপন মর্ম্মতল,
বিশ্বের ব্যথা জমাট বাঁধিয়া কালো সে গভীর চোখে
দৃষ্টির লেশ নাই।

কি যে হ'ল মনে, বিহ্বল ক্ষণে কল্পনা অদ্ভুত,
মৃতের বধির শ্রবণে চাহিনু শোনাতে আর্ত্তস্বরে—
"চাও আঁখি মেলি, কথা কও কও মর্ত্ত্যের সন্তান,
আমরা মর্ত্ত্যবাসী
ডাকিতেছি সবে, নয়ন মেলিয়া চাও।"
মনে মনে ডাকিলাম—
ঘরের বাতাস ভারী হয়ে এল, কেহ শুনিল না কানে।
মর্ত্ত্যের কবি, চিরজীবী কবি, কখন অকস্মাৎ
মলিন মর্ত্ত্য হইতে বিদায় নিয়েছে অনিচ্ছায়।
সুন্দর এ ভুবন—
ভুবন ছাড়িয়া ভুবনের কবি গিয়াছে পরম ক্ষণে।

* * *

বিমূঢ় স্তব্ধ দেখিলাম চেয়ে নিবেছে দিনের আলো—
মেঘে মেঘে কালো গাঢ় আকাশের নীল।
মানুষের কাঁধে কাঁধে চ'লে গেল মৃত মানবের দেহ,
পাবক অগ্নি জ্বলে জাহ্নবীতীরে,
জ্বলিছে রাত্রিদিন।

* * *

অন্ধকারেতে সভয় চরণ ফেলিয়া এলাম ঘরে—
আমার রুদ্ধ ঘরে ;
সম্বিৎহারা, সম্বিৎ পেনু ফিরে—
প্রসন্ন আঁখি মেলি দেখিলাম, আমার ঘরের কোণে
স্নিগ্ধ শিখায় জ্বলিতেছে ঘৃতদীপ ;
চিতার আগুন ঘরের প্রদীপে কখন ছুঁইয়া গেছে—
ছুঁয়েছে পরম স্নেহে।
দ্বিধা-কম্পিত দুই করতল এক হ'ল আশ্বাসে,
বলিতে পারি না কোন্ দেবতারে ঘৃতদীপ-মহিমায়
নিবেদিনু নতি চরম নমস্কারে।

৫।৯।৪১

লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথ

১৯২০-১৯২১

বিশ বছরের উপর হ'য়ে গেল, তখন লণ্ডনে ছাত্র-জীবন যাপন ক'র্‌ছি ; লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর-অভ-লিটরেচর পরীক্ষার জন্য 'গবেষণামূলক' বই লিখ্‌ছি, আর তা ছাড়া ভাষা, সাহিত্য আর ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত কতকগুলি বিষয় নিয়ে লণ্ডনের বিভিন্ন কলেজে পড়াশুনা ক'র্‌ছি। বেশ উৎসাহের সঙ্গে লণ্ডনের মত সভ্যতার কেন্দ্রে প্রাপ্তব্য মানসিক সংস্কৃতির কতকগুলি দিক্ অনুশীলন ক'র্‌ছি ; নানা জাতির ছাত্রের সঙ্গে, নানা জাতীয় লোকের সঙ্গে, বিখ্যাত বিখ্যাত ইংরেজ আর অন্য দেশের পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'চ্ছে ; ব্রিটিশ মিউজিয়মের পাঠাগারে যাচ্ছি, নানা মিউজিয়ম ঘুরে' ঘুরে' দেখ্‌ছি, থিয়েটরে নামী লেখকের লেখা নাটকের অভিনয় দেখে আস্‌ছি, মাঝে মাঝে লণ্ডনের আশেপাশে ইংলাণ্ডের পল্লীজীবনের সঙ্গেও একটু-আধটু চাক্ষুষ পরিচয় ক'রে আস্‌ছি। মোটের উপর, সব দিক্ থেকেই মনের মধ্যে যেন একটা নোতুন জীবনের প্রবাহ অনুভব ক'র্‌ছি। স্যর্ জার্জ্ আব্রাহাম গ্রিয়র্‌সন্-এর মত প্রখ্যাতনামা ভাষাতাত্ত্বিকের প্রীতিসিক্ত, আমার মত ছাত্র-জনের বিশেষ কাম্য, শিষ্যত্ব লাভ ক'রেছি ; ডেন্‌মার্ক্-এর অধ্যাপক অটো য়েস্পর্‌সেন্-এর সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছে ; অনেক জিনিস জান্‌বার শোন্‌বার দেখ্‌বার, আর নানা উপায়ে নিজের দৃষ্টি, বিচার আর অনুভবের শক্তিকে বাড়িয়ে' তোল্‌বার সুযোগ পাচ্ছি। ব্রিটিশ Y. M. C. A. বা খ্রীষ্টীয়-যুব-সঙ্ঘের কর্তাদের দ্বারায় পরিচালিত একটী আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে বাস ক'র্‌ছি—এখানে

ইউরোপের নানা জাতির কুড়ি জন, আর তিরিশ জন ব্রিটিশ-জাতীয়—ইংরেজ, ওয়েল্‌শ্‌, স্কট, আইরিশ—এই পঞ্চাশ জন ইউরোপীয় ছাত্রের মধ্যে আমি, আর আমার সঙ্গে আর একজন ভারতীয়—বাঙ্‌লা দেশে বহুকাল বাস ক'রেছিল ব'লে একটু-আধটু বাঙ্‌লা ব'লতে পারে এমন একটী তামিল ছেলে—এই দুই জন ভারতীয় আমরা একত্র আছি। একটী ইটালীয়, কতকগুলি রুমানীয়, একটী যুগোশ্লাব, কতকগুলি সুইস ও অষ্ট্রিয়ান, একটী গ্রীক, একটী মিসরীয়; এ ছাড়া কতকগুলি ব্রিটিশ ছাত্রের সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা হ'য়েছে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মে-জুন মাস; চমৎকার আলোক-উদ্ভাসিত, সবুজের প্লাবনে ভরা ইংলাণ্ডের গ্রীষ্মকাল; এই সময়ের প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক মিনিটটী যেন উপভোগ্য। মাঝে মাঝে লণ্ডনের বাইরে পাড়াগাঁ অঞ্চলে একটু বেড়াতে যাই, কখনও একা, কখনও ওদেশী বন্ধু জুটিয়ে' সদলে। এমন সময়ে খবর পেলুম, রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষ থেকে ইংলাণ্ডে এসেছেন, তিনি লণ্ডন হয়ে অক্সফোর্ড-এ গিয়েছেন, আবার শীঘ্রই লণ্ডনে ফিরে এসে কিছুকাল সেখানেই অবস্থান ক'র্‌বেন।

রবীন্দ্রনাথকে প্রথম চাক্ষুষ দেখি স্বদেশী আন্দোলনের গোড়ার দিকেই—বোধ হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনে (এখনকার দিনের বিদ্যাসাগর কলেজে) 'ডন সোসাইটি' নামক কলেজের যুবকদের একটী ক্লাব বা সভায় (যে সভা থেকে তখনকার দিনের পক্ষে খুবই উচ্চ কোটির একখানি সংস্কৃতি-মূলক ইংরেজী পত্রিকা বার হ'ত—the Dawn Society's Magazine; অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডন সোসাইটির পরিচালক ছিলেন), রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিয়েছিলেন; বিষয়টী ছিল, যতদূর মনে হ'চ্ছে, দেশের অশিক্ষিত জন-গণের মধ্যে শিক্ষা বা অক্ষর-পরিচয় প্রচারের জন্য যুবকদের কর্তব্য। পরে

কলেজে-প'ড়্‌তে-প'ড়্‌তে ক'লকাতা ইউনিভর্সিটি ইন্‌ষ্টিট্যুটে একদিন রবীন্দ্রনাথের দর্শনলাভ হয়—এটা দ্বিতীয় দর্শন—কি একটা সভায় রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন, সেখানে স্বর্গীয় স্তর্‌ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্বন্ধে তিনি একটা গান গেয়েছিলেন, সে গানটা তখন থেকেই আমার মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছিল,—"তুমি কেমন ক'রে গান করো হে গুণী, আমি অবাক্‌ হ'য়ে শুনি, কেবল শুনি!" এই গানটা। সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজে যেবার তিনি "আত্মপরিচয়" ব'লে প্রবন্ধ পড়েন, সেবারও তাঁর দর্শনলাভ আর পাঠ-শ্রবণ ঘটেছিল। তার পরে এম্‌-এ পাস কর্‌বার পরে, শান্তিনিকেতনে যাই, সেখানে তাঁর সঙ্গে বাঙ্‌লা ভাষা নিয়ে প্রথম আলোচনা করি; তখন আমি বাঙ্‌লা ভাষার ইতিহাসের নষ্ট-কোষ্ঠি উদ্ধার কর্‌বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পড়াশুনা ক'র্‌তে আরম্ভ ক'রেছি মাত্র। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী-বিভাগে সহকারী অধ্যাপকের পদ পাই; সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কতকগুলি বিখ্যাত সাহিত্যিকের সংস্পর্শে আসি; শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গেও পরিচিত হই, "সবুজ পত্র"তে পরে আমার লেখাও দুই-একটা বেরোয়। "বিচিত্রা" আলোচনী সভা কবির চেষ্টায় ঠাকুর-বাড়ীতে স্থাপিত হয়, তাতে আমন্ত্রণ পাই,—কবির "ডাকঘর" আর "ফাল্গুনী"র অপূর্ব অভিনয়ও দেখি। এইরূপে আস্তে-আস্তে দেশে থাকৃতে-থাকৃতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। আমি যে 'ভাষাতত্ত্ব' নিয়ে পড়াশুনা ক'র্‌ছি, সে খবর তাঁর কাছে পৌঁচেছিল। সুতরাং আমি বিলেতে থাকৃতে-থাকৃতে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পাবার যে একটা সুযোগ আমার পক্ষে হ'তে পার্‌বে, তা ভেবে মনে-মনে বিশেষ আনন্দিত হ'লুম।

রবীন্দ্রনাথ কোন্‌ তারিখে লণ্ডনে এসে পৌঁচেছিলেন তা মনে নেই।

তাঁর বাসার সন্ধান না পাওয়ায় প্রথমেই তাঁর কাছে গিয়ে উঠ্‌তে পারি নি। জুন মাসের গোড়ায় শুনলুম, রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনার জন্য ১২ই জুন তারিখে Y.M.C.A.-দ্বারা পরিচালিত ভারতীয় ছাত্রাবাসে আর ক্লাবে একটী সভা হবে। ঐ সময়ে, ১০ই জুন আর ১২ই জুন ছিল আমার একটা পরীক্ষা, পরীক্ষার জন্য একটু ব্যস্ত থাকায়, আর ঠিক ঐ সময়ে আমাদের ইউনিভর্সিটি কলেজের ফনেটিক্স বিভাগে ক্যোপ্‌ন্‌-হাগ্‌নের বিখ্যাত অধ্যাপক অটো য়েস্পর্‌সেন্‌ আসায়, তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা আর তাঁর সম্মাননার জন্য ডিনারের আয়োজন থাকায়, আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা ক'রে আস্‌তে পারি নি। পরীক্ষা চুক্‌ল ১২ই দুপুরে, আর সন্ধ্যায় ছিল ভারতীয় ছাত্রাবাসে, গাওয়ার স্ট্রীটের তখনকার দিনের বিখ্যাত কাঠের বাড়ী শেক্‌স্পিয়র-হাট্‌-এ রবীন্দ্র-স্বাগত-সভা। ইতিপূর্বে বাঙালী ছাত্রেরা সকলকে অনুরোধ ক'রেছিল, ভারতীয় ছাত্রেরা যেন ভারতীয় পোশাক প'রেই সেই সভায় হাজির হন। তদনুসারে আমি ধুতি পাঞ্জাবি শাল ব্যাগে ক'রে সভার স্থল ছাত্রাবাসে নিয়ে যাই, সেখানে একটী বাঙালী বন্ধুর ঘরে বিলিতি কাপড়-চোপড় ছেড়ে সেগুলি প'রে নিই। সভাস্থলে গিয়ে দেখি, যেন দেশেরই কোন সভা; ইংরেজ আর অন্য ইউরোপীয় মেয়ে পুরুষ অনেক আছে, কিন্তু ভারতীয়েরা সকলেই প্রায় "ভারতীয় পোশাকে," অর্থাৎ কোনও-না কোনও রকমের প্রাদেশিক ভারতীয় পোশাক প'রে এসেছে। মারাঠী জরীর আঁচলা বা পাড়ওয়ালা লাল রেশমের বাঁধা-পাগড়ী, তিলক গোখলে এঁরা যেমন প'র্‌তেন; জবরদস্ত শিখ পাগড়ী, লুঙ্গী আর কুল্‌হা মিলিয়ে' পাঞ্জাবী পাগড়ী, রাজপুতানার রঙীন সাফা, মাদ্রাজী জরীপাড় সাদা পাগড়ী, ভারতীয় মুসলমানের তুর্কী ফেজ, উত্তর-ভারতের আর গুজরাটের হিন্দুর গোল ফেল্ট্‌ক্যাপ—এই সব রকমারি শিরস্ত্রাণ; তারপরে

আচকান, গলা-আঁটা কোট, গলা-খোলা কোট, কোর্তা, পাঞ্জাবি; রঙীন চাদর, জরীপাড় চাদর, শাল; ধুতী, যোধপুরী পাজামা, ঢিলে ইজের; বিলিতি জুতো, নাগরা, মারাঠী চটী; খালি পা, হাঁটু-পর্যন্ত মোজা; সব ছিল। একজন পরিচিত ইংরেজ ছোকরা, একটু বেশি রকম চালাক, এই হরেক রকম ভারতীয় পোশাকের পসার দেখে আমায় চুপিচুপি ব'ল্‌লে—A brave and a varied display। যাহোক্, সকলে তো সভায় উপস্থিত হ'য়ে জাঁকিয়ে ব'স্‌ল; ছাত্রদের মধ্যে যারা কর্মকর্তা, তারা ঘোরাফেরা ক'র্‌তে লাগ্‌ল; রবীন্দ্রনাথের প্রতীক্ষায় আমরা সভাগৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে রইলুম; রকমারি দেশী পোশাক পরা এতগুলি ভারতীয়কে রাস্তার ধারে অপেক্ষা ক'র্‌তে দেখে, স্থানীয় পথ-চলতি মেয়ে-পুরুষ ইংরেজদেরও একটা ভীড় জ'মে গেল। রবীন্দ্রনাথ এলেন, সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ; অনেকেই আমরা তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম ক'র্‌লুম, স্মিতহাস্যে কারুকে কারুকে দুই-একটী কুশল জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে-ক'র্‌তে তিনি আমাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট স্থানে এসে ব'স্‌লেন। সব 'Indian Style'-এ করবার চেষ্টায়, তাঁকে চেয়ারে না বসিয়ে', ক্লাবের কাঠের মেঝের উপরে গাল্‌চে পেতে ভারতীয় ধরণে আসর করা হ'য়েছিল। গ্রীষ্মের দিন, অগ্নিকুণ্ডে আগুনের দরকার হয় নি, মেঝেয় ব'সে ঠাণ্ডা লাগবার ভয় ছিল না; আর চমৎকার পারস্যদেশীয় গাল্‌চে সভার জন্য সংগ্রহ ক'রে আনা হ'য়েছিল। আমরা জন-কতক তাঁর সঙ্গে মাটিতে ফরাসের উপরে ব'স্‌লুম, বাকি সব দর্শকেরা—বেশির ভাগ লোক—তিন দিক্ ঘিরে চেয়ারেই ব'স্‌ল। অনেক দিনের কথা, সমস্ত কার্যক্রম মনে নেই, তবে কতকগুলি ব্যাপার যা মনে আছে তা ব'ল্‌ছি। আমরা কবির কাছেই ব'স্‌তে পেরেছিলুম, কারণ আমরা ক'জন, দেখলুম, কবির পূর্ব-পরিচিত। দিলীপ রায় ছিলেন, ক্ষিতীশপ্রসাদ

চট্টোপাধ্যায়—আরও জন কয়েক ছিলেন। ছাত্রাবাসের কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন কতকগুলি মহীশূরের ধূপকাঠি যোগাড় ক'রে এনেছিল, কিন্তু সেগুলি জ্বালিয়ে' দেখা গেল যে ধূপদান নেই, কবির সামনে ধূপ জ্বালাবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল, কিন্তু ধূপকাঠি কিসের মধ্যে রাখা হবে সে বিষয়ে কেউ ভাবে নি। একটী বুদ্ধিমান্ ছেলের পরামর্শে তখন একখানা সাবান যোগাড় ক'রে তাতে ধূপকাঠিগুলি বিঁধিয়ে' একটী রেকাবির উপরে রেখে রবীন্দ্রনাথের সামনে বসানো হ'ল; গৃহস্থ-ঘরের পূজায় যেমন একটা কলায় বা এক টুকরা শশায় ধূপ বিঁধিয়ে' রাখা হয়। প্রোগ্রামের মধ্যে মুখ্য কার্য ছিল রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত করা; ছাত্রদের তরফ থেকে দুই-একজন বক্তৃতা দিয়ে তাঁর প্রশস্তি ক'রে কার্য সমাধা ক'র্‌লে, তার মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় কিছু ছিল না; আর কবিও উত্তর দিলেন, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মনোহর ভাবে আস্তে-আস্তে তিনি কিছু ব'ল্‌লেন। এই দুই প্রধান কার্যের পূর্বে আর পরে অন্য কতকগুলি ব্যাপার ছিল—তার মধ্যে আমার বেশ মনে আছে, প্রথম দিকে ছিল কতকগুলি কবিতা পড়া, আর শেষের দিকে দিলীপের গান। একটী গুজরাটী মুসলমান ছেলে, তখনকার দিনে সে শেক্‌স্পিয়র-হাটের আড্ডায় একজন মাতব্বর ছিল, বহুকাল ধ'রে অধ্যবসায়ের সঙ্গে কেম্‌ব্রিজ আর লণ্ডনে অধ্যয়ন ক'র্‌ছে, পাস আর তার করা হ'চ্ছে না, সে ছোকরা তার স্বরচিত এক ইংরেজী কবিতা প'ড়্‌লে; কবিতার একটী অপূর্ব লাইন এখনও মনে আছে, তবে তার অর্থটা এখনও ঠিক বুঝে' উঠ্‌তে পারি নি—Tagore, O Tagore, Launch thy boat ashore। আর একটী মধ্যপ্রদেশের ছাত্র—হিন্দীভাষী—তার-স্বরে সুর ক'রে তার হিন্দী কবিতা শোনালে—প্রত্যেক ছত্রটী দুবার ক'রে ক'রে "দোহ্‌রাইয়া" প'ড়লে, পাছে আমরা রস-গ্রহণ ক'র্‌তে না পারি

সেই আশঙ্কায়। কবিতাটীর আরম্ভটা মনে আছে, সেটা এই রকমের—"স্বস্তি শ্রীরবি-ইন্দ্রনাথ, স্বাগত তুম হো ইস শেকস্‌পিয়র-হাট্ট মেঁ"—এক 'ইস' ছাড়া সব শব্দগুলি স্বরান্ত ক'রে পড়া হ'ল। কবিতাটীর মধ্যে একটী জোরালো লাইন ছিল; ছোকরা সেটীকে যথারীতি দুবার প'ড়ে "দোহ্‌রালে," তিনবার প'ড়ে "তেহ্‌রালে," চারবার প'ড়ে "চৌহ্‌রালে," কিন্তু দেখ্‌লে যে তার কৃতিত্বের অন্তর্নিহিত ভাবটুকু কেউ ধ'র্‌তে পার্‌লে না—তার পক্ষে চার চার বার লাইনটী পড়া "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্‌" হ'ল; লাইনটী এই—"তুম-নে ইন্‌-কে সর-পর লাত মারা।" শেষটায় মরিয়া হ'য়ে কবিটী নিজেই হিন্দী ভাষায় ভাষ্য ক'র্‌লে—"ইস লাইন কো সোচ কর দেখিয়ে; 'সর' য়হ্‌ শব্দ দো অর্থ-মেঁ হৈ; চাহে ইসে ইংলিশ 'সর' সমঝিয়ে, চাহে figurative অর্থ-মেঁ লীজিয়ে।" অর্থাৎ লাইনটীর মানে—তুমি এদের সর-এর উপর লাথি মেরেছ; সর—ইংরেজী sir, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে ব্রিটিশ-রাজ-দত্ত নাইট-উপাধি ত্যাগ ক'রেছেন, সেই অর্থে লাইনটী নেওয়া যায়; আর 'সর' মানে মাথা; দ্বিতীয় অর্থটী খুব যে উচ্চ ভাবের পরিচায়ক, তা নয়। যাহোক্‌ লেখকের নিজের ভাষ্যে যখন হিন্দী আর উর্দু-ওয়ালাদের কাছে অর্থটী সুপরিস্ফুট হ'ল, আর আমাদের মত অহিন্দুস্থানী বাঙালী মারাঠী গুজরাটীদের কাছেও, তখন একটা উৎসাহের ঢেউ খেলে গেল, জালিয়ানওয়ালাবাগের পরে রবীন্দ্রনাথ যে স্যর্‌ উপাধি ত্যাগ ক'রেছিলেন সে কথা স্মরণ ক'রে দেশাত্মবোধের হাওয়ার একটা হিল্লোল এসে সমবেত ভারত-সন্তানদের হৃদয়কে আলোড়িত ক'রে দিয়ে গেল—তার-স্বরে সকলে এই লাইনের তারিফ ক'রে আর খুশীর সঙ্গে গর্ব-পূর্ণ ভাবে রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে' "বন্দে মাতরম্‌" আর "রবীন্দ্রনাথ-কী জয়" ক'রে উঠ্‌ল। পরিচিত একজন ইংরেজ ভদ্রলোক পিছন থেকে এসে কানে-কানে জিজ্ঞাসা

ক'র্লেন, "কি ব্যাপার? কবিতা-পাঠে এতটা উৎসাহ কেন? জাতীয় কবিতা বুঝি?" কি উত্তর দিই? ব'ল্লুম, It is all for a pun, which is thought to be rather neat. কবিটী তো তখন উৎসাহের সঙ্গে আরও ছ্বার তার এই লাইন শোনালে; রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অধোবদন হ'য়ে রইলেন। শেষটায় বোধ হয় দিলীপের গান হ'ল। ঠিক মনে নাই, তবে যেন তিনি তাঁর পিতার "বঙ্গ আমার জননী আমার" গেয়েছিলেন, আর পরে তাঁর অনুরাগী অবাঙালী বন্ধুদের অনুরোধে তিনি এই গানটীর ইংরেজী অনুবাদ (বাঙ্‌লা গানটীর-ই সুরে) গেয়েছিলেন। এই সহজ সুরের গানটীতে তাল দেওয়া নিতান্ত আনাড়ি তাল-কাণা লোকের পক্ষে কঠিন নয়; ইংরেজীতে গানের মানে ধ'র্তে পেরে, যারা চেয়ারে ব'সেছিল সেই সব ভারতীয় ছাত্রদের অনেকে কাঠের মেঝেয় পা ঠুকে-ঠুকে তাল দিতে লাগ্‌ল।

পরে কবির সঙ্গে, তাঁর এই সংবর্ধনা কেমন লেগেছিল সে-সম্বন্ধে কথা হ'য়েছিল। "তুম-নে ইন-কে সর-পর"—এই লাইনের কথাও তুলেছিলুম। তিনি খালি ব'লেছিলেন, "সব রকমই শুনতে হয়, যেতে দাও। তবে ভাবি, এত খরচ-পত্র ক'রে এরা এত দূর আসে কেন।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মাঝে-মাঝে দেখা ক'র্তে যেতুম। দুই-একবার তিনিও আমাকে আস্‌বার জন্য খবর দিয়েছিলেন। তিনি লণ্ডনে মাস-কয়েক থেকে, একবার আমেরিকা ঘুরে এলেন। লণ্ডনে তিনি থাক্‌তে-থাক্‌তে আমরা জন-কয়েকে মিলে ছুটীর মধ্যে স্কটলাণ্ড আর লেক-ডিষ্ট্রিক্ট্‌ বেড়িয়ে' এলুম। আমেরিকা থেকে ফিরে আসবার পরেও তাঁর সঙ্গে খুব দেখা ক'র্তে যেতুম। এই কয় মাসের মধ্যে তাঁকে প্রথম একটু অন্তরঙ্গভাবে জান্‌বার সুযোগ আমার হ'য়েছিল। তখন আমার বয়স তিরিশ; বিলেতে প'ড়্তে গিয়েছে এমন ভারতীয় ছাত্রেরা বেশির ভাগ আমার

ক'র্‌লেন, "কি ব্যাপার ? কবিতা-পাঠে এতটা উৎসাহ কেন ? জাতীয় কবিতা বুঝি ?" কি উত্তর দিই ? ব'ল্‌লুম, It is all for a pun, which is thought to be rather neat. কবিটী তো তখন উৎসাহের সঙ্গে আরও দুবার তার এই লাইন শোনালে; রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অধোবদন হ'য়ে রইলেন। শেষটায় বোধ হয় দিলীপের গান হ'ল। ঠিক মনে নাই, তবে যেন তিনি তাঁর পিতার "বঙ্গ আমার জননী আমার" গেয়েছিলেন, আর পরে তাঁর অনুরাগী অবাঙালী বন্ধুদের অনুরোধে তিনি এই গানটীর ইংরেজী অনুবাদ (বাঙ্‌লা গানটীর-ই সুরে) গেয়েছিলেন। এই সহজ সুরের গানটীতে তাল দেওয়া নিতান্ত আনাড়ি তাল-কাণা লোকের পক্ষেও কঠিন নয়; ইংরেজীতে গানের মানে ধ'র্‌তে পেরে, যারা চেয়ারে ব'সেছিল সেই সব ভারতীয় ছাত্রদের অনেকে কাঠের মেঝেয় পা ঠুকে-ঠুকে তাল দিতে লাগ্‌ল।

পরে কবির সঙ্গে, তাঁর এই সংবর্ধনা কেমন লেগেছিল সে-সম্বন্ধে কথা হ'য়েছিল। "তুম-নে ইন-কে সর-পর"—এই লাইনের কথাও তুলেছিলুম। তিনি খালি ব'লেছিলেন, "সব রকমই শুন্‌তে হয়, যেতে দাও। তবে ভাবি, এত খরচ-পত্র ক'রে এরা এত দূর আসে কেন।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মাঝে-মাঝে দেখা ক'র্‌তে যেতুম। দুই-একবার তিনিও আমাকে আস্‌বার জন্য খবর দিয়েছিলেন। তিনি লণ্ডনে মাস-কয়েক থেকে, একবার আমেরিকা ঘুরে এলেন। লণ্ডনে তিনি থাক্‌তে-থাক্‌তে আমরা জন-কয়েকে মিলে ছুটীর মধ্যে স্কটলাণ্ড আর লেক-ডিষ্ট্রিক্ট্ বেড়িয়ে' এলুম। আমেরিকা থেকে ফিরে আসবার পরেও তাঁর সঙ্গে খুব দেখা ক'র্‌তে যেতুম। এই কয় মাসের মধ্যে তাঁকে প্রথম একটু অন্তরঙ্গভাবে জান্‌বার সুযোগ আমার হ'য়েছিল। তখন আমার বয়স তিরিশ; বিলেতে প'ড়্‌তে গিয়েছে এমন ভারতীয় ছাত্রেরা বেশির ভাগ আমার

চেয়ে বয়সে ছোটো; সুতরাং তাঁর সঙ্গে গুরু-গম্ভীর বিষয়ে আলাপের সুযোগ সহজেই তিনি আমায় দিয়েছিলেন; আর সেটা আমার জীবনে একটা পরম লাভের বস্তু হয়েছিল। কত না বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা, ক্বচিৎ তর্ক জুড়ে' দিয়ে, আমার নিজের মনন-শক্তিকে আমি আগের চেয়ে নির্মল আর স্থূলতাবর্জিত ক'র্‌তে পেরেছি। তাঁর কাছে অনেক বড়-বড় লোক আস্‌তেন। প্রথম বার তিনি ছিলেন Kensington Palace Mansion ব'লে একটী হোটেলে; দ্বিতীয় বার ছিলেন, আমাদের বাঙ্‌লা দেশের চট্টগ্রামবাসী একটী বাঙালী ভদ্রলোকের পরিচালিত আর সত্বাধিকারী হিসাবে তাঁর নিজস্ব, Regina Hotel নামে হোটেলে। পরিচয় হ'য়েছিল অনেকের সঙ্গে; কিন্তু কারো সঙ্গে সে আলাপ জীইয়ে' রাখ্‌তে পারি নি, কারণ মানসিক চর্চায় বা আলোচ্য বিষয় নিয়ে' সকলেই আমার সমানধর্ম্মা ছিলেন না। তবে শান্তিনিকেতনের পিয়ার্‌সন্ সাহেব, আর দীনবন্ধু চার্লস এফ্‌ অ্যাণ্ড্রুস্, এঁদের বেশ লেগেছিল। কবিরই বাসায় লরেন্স বিন্‌য়ন, উইলিয়ম রটেন্‌ষ্টাইন, লর্ড সিংহ, স্যর্‌ কে. জি. গুপ্ত—এঁদের দেখি; কবির সঙ্গে রটেন্‌ষ্টাইনের বাড়িতে এক ঘরোয়া বা পারিবারিক সান্ধ্য সম্মিলনে যাই, সেখানে আয়র্‌লাণ্ডের কবি ইয়েট্‌স্‌কে দেখি; রটেন্‌ষ্টাইনের বাড়ীতে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে পরম ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মত দেখ্‌ত; মনে আছে, ঐ দিন কবি তাঁর ইউরোপীয় বন্ধুদের অনুরোধে দুটী বাংলা গান গেয়েছিলেন, তার মধ্যে "দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে" গানটী ছিল। ইয়েট্‌স্ ছিলেন একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক, তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার লোভ হ'লেও তেমন্ সাহস আমার হয় নি, কারণ সাহিত্য-রস-রসিক আমি মোটেই ছিলুম না—তাঁর মত লোকের সঙ্গে কথা কইবার যোগ্যতা আমার ছিল না।

বিখ্যাত রুষ শিল্পী নিকোলাই রোয়ারিখ ইংলাণ্ডে নির্বাসন-যাপন কর্‌ছিলেন। ইনি ছিলেন সোভিয়েট বা বলশেভিক তন্ত্রের বিরোধী, সেই জন্য এঁর বিশাল প্রাসাদ, প্রাচীন বস্তুর সংগ্রহ, ছবির সংগ্রহ, সব ছেড়ে দিয়ে, দেশ ত্যাগ ক'রে বাইরে এসে এঁকে থাকতে হ'য়েছিল। এঁর দুই ছেলের মধ্যে বড় ছেলে য়ুরি বা জ্যর্‌জ্‌ লণ্ডনের স্কুল-অভ-ওরিএণ্টাল স্ট্যডীস্‌-এ প'ড়তেন, য়ুরির আলোচ্য ছিল তিব্বতী আর সংস্কৃত। আমিও সেই স্কুলের ছাত্র ছিলুম; এই সূত্রে য়ুরি রোয়ারিখ-এর সঙ্গে ভাব হয়, পরে তিনি তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তাঁর বাপ মা আর ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে' দেন। এঁদের বাড়ীতে মাঝে-মাঝে যেতুম। এঁরা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী। রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ড থেকে লণ্ডনে আস্‌তেই, তাঁর সঙ্গে রোয়ারিখের পরিচয় করিয়ে' দেবার কর্তব্য সহজেই আমার উপর প'ড়্‌ল। রোয়ারিখ নিজে একদিন আমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে দেখ্‌তে এলেন—ছেলেরাও তাঁর সঙ্গে এল'; আমি কবিকে আগেই এঁর কথা ব'লে রেখেছিলুম। ইনি কবিকে নিজের আঁকা একখানি ছবি উপহার দিলেন, কবির একটী কবিতার রুষ ভাষায় অনুবাদ ("ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে···" এই কবিতাটী) প'ড়ে শুনিয়ে', ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—"এখন আপনার নিজের লেখা বুঝতে পারলেন?" দুজনে খুবই হৃদ্যতা জ'মে উঠ্‌ল। কবিও একদিন নিমন্ত্রিত হ'য়ে রোয়ারিখের বাসায় গেলেন, রোয়ারিখ-গৃহিণী খুব শ্রদ্ধা আর সম্মান-বোধের সঙ্গে কবিকে স্বাগত ক'র্‌লেন। এঁদের মধ্যে তার পরে মাঝে-মাঝে দেখাসাক্ষাৎ হ'ত। আমি আমার পরিচিত সতীর্থ কতকগুলি ইংরেজ আর অন্য দেশীয় ইউরোপীয় ছাত্র, যারা কবির কাব্য প'ড়ে তাঁর অনুরাগী হ'য়েছে, তাদের বার-কতক কবির কাছে নিয়ে গিয়েছিলুম। কবি বেশ খুশী মনে দিলখোলা ভাবে এই বিদেশী তরুণদের সঙ্গে আলাপ ক'রেছিলেন; এই আলাপের স্মৃতি তাদের মনে নিশ্চয়ই চিরকাল ধ'রে জাগরূক থাক্‌বে। আমার মনেও এদের নিয়ে যাওয়া আর কবির সঙ্গে এদের কথাবার্তার অনেক কিছু এখনও উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। বেশি উৎসাহ দেখতুম কণ্টিনেণ্টাল ছাত্রদের মধ্যে। এমন এক দিনকার কথা বেশ মনে প'ড়্‌ছে। কবি

কথায়-কথায়, বইয়ের মারফৎ বড় কবির কাব্য বা মহাপুরুষের বাণী ভবিষ্যৎ যুগের লোকেদের কাছে শোনানোর চেয়ে কোনও রকমে তাঁদের মুখের কথায় সেই বাণী তাদের "কানের ভিতর দিয়া মরমে" পৌঁছানোর বেশি উপযোগিতায় তাঁর বিশ্বাস আছে, এই মন্তব্য ক'র্‌লেন। তাতে এই মন্তব্য নিয়ে আলোচনা চ'ল্‌ল; সে কি ক'রে করা যায়? কবি ব'ল্‌লেন, কেন, গ্রামোফোন-রেকর্ডে ক'রে; এই ব'লে এই idea বা ভাবটী তিনি একটু ফালাও ক'রে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন,—"দেখ হে, ভবিষ্যতে হয়তো লাইব্রেরিতে বইয়ের বদলে, আজকালকার যুগের পরের যুগের কবি আর লেখকদের মুখের কথা, তাদের বক্তৃতা বা পাঠের রেকর্ড তৈরি ক'রে রাখ্‌তে হবে। কেউ লাইব্রেরিতে গিয়ে বই প'ড়্‌বে না; রেকর্ড বার ক'রে বাজাবে, আর মনীষী আর কবিদের শিক্ষা, চিন্তা আর অনুভূতি বা সৌন্দর্য-দর্শনের কথা তারা কানে শুনে ধ'র্‌তে পার্‌বে —এইভাবে সোজাসুজি কবির বা দর্শনশীল ব্যক্তির মুখের কথা আমাদের উত্তরপুরুষদের কানের ভিতরে যাবে।" তাতে একটী ইটালীয় ছেলে ব'ল্‌লে, আচ্ছা, তা হ'লে লাইব্রেরিতে এক-সঙ্গে পাঁচ-শ' লোক যদি পাঁচ-শ-খানা রেকর্ড বার ক'রে "পড়তে" আরম্ভ করে, তা হ'লে নানা ভাষায় পাঁচ-শ' গলায় একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হবে না? কবি তা শুনে হেসে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "তা হবে কেন? রেল-স্টেশনে যেমন বাহিরের আওয়াজ বাঁচাবার জন্য টেলিফোনের কাচ-দিয়ে-ঘেরা ঘর থাকে, সেই ধরণের ঘর প্রত্যেক 'পাঠক' অর্থাৎ শ্রোতার জন্য হবে, তাতে সকলে নিশ্চিন্ত মনে বাণী শুন্‌তে পার্‌বে।" এই রকম কত বিষয়ের অবতারণা ক'র্‌তেন, আবার সে সবের সমাধান ক'র্‌তেন। প্রত্যেক বার-ই এই সব ছাত্র ছাত্রী যারা আমার সঙ্গে কবির কাছে যেত, সকলেই মুগ্ধ হ'য়ে ফিরে আস্‌ত।

এখন আমার মনে আফসোস হয়, কেন কবির সঙ্গে কথাবার্তার খুঁটিনাটিতে পূর্ণ রোজ-নামচা তখন রাখি নি, তা হ'লে হয়তো তাঁর অনেক ক্ষণিকের উক্তি, ক্ষণপ্রভার মত উঁকি দিয়ে যা চ'লে গিয়েছে, তা ধ'রে রাখতে পারা যেত। কিন্তু হায়, রবীন্দ্রনাথের মত লোকোত্তর প্রতিভাকে, তার সমস্ত শক্তি আর প্রকাশভঙ্গী সমেত কে লোক-সমক্ষে

সম্পূর্ণ ধ'রে দিতে পারে ? তিনি নিজে যা দিয়ে গিয়েছেন, তাঁর ব্যক্তিত্বের তাঁর বিভূতির যে অংশ তিনি স্বয়ং প্রকাশ ক'রে গিয়েছেন, তারই প্রাচুর্য আর নানামুখিতা এক বিস্ময়কর বস্তু ; কেবল তারই পূর্ণ সমাদর ক'র্‌তে, তার গৌরব থেকে প্রসাদ লাভ ক'র্‌তে, আর তা থেকে নিজেদের আত্মসংস্কৃতি আন্‌তে আমরা যেন সমর্থ হই ॥

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

তবু মরিতে হবে

তবু মরিতে হবে ।
শস্যভরা বসুমতী— শ্যামল শোভন অতি
মধুর নদীর গতি তরল রবে,
বসন্তে ভরিয়া বোঁটা ভালবাসি ফুলফোটা
ভালবাসি চাঁদ উঠা সাঁঝের নভে ।
হতহিয়া নিরুদ্দেশা দক্ষিণে বাতাসে মেশা
ফুলের গন্ধের নেশা আসিত যবে ;
কতদিন হাসিমুখে গেছে কেটে সকৌতুকে
কত প্রেমে কত সুখে কত গরবে,
তবু মরিতে হবে ।
হাসিভরা আঁখি কালো মরমে জ্বালিত আলো,
জীবনে কত না ভাল বেসেছি সবে ।
কত আশা বক্ষ ভরি রয়েছে আঁকড়ি ধরি,
শিরা হ'তে ছিন্ন করি ছিঁড়িয়া লবে ।
ছিল মনে দীন হীন, শুধে' যাব সব ঋণ,
জীবনে বিদায়দিন আসিবে যবে ।
শুধু ক'রে গেনু খেলা স্রোতে ভাসাইনু ভেলা,
অবহেলে সারাবেলা কাটানু ভবে,
তবু মরিতে হবে ।

(রবীন্দ্রনাথ—বাল্যরচনা)

২২এ শ্রাবণ, ১৩৪৮

মেঘ চাপা পূর্ণিমা,
আর সারি সারি মুখঢাকা রুদ্ধমান আলোয়
সহরের নিষ্প্রদীপ রাত শ্রাবণ-সমাচ্ছন্ন।
আলো নিবল,
রাত কাট্‌ল,
পূর্ণিমা ছাড়্‌ল,
কিন্তু প্রভাতের কপালে
আজ আর সূর্য্য উঠ্‌ল না।
এমনি দিনেই,
এমনি শ্রাবণঘন গহন মোহে,—
কাননভূমি যখন কূজনহীন,
সকল ঘরে যখন দুয়ার দেওয়া,—
একেলা পথিক গোপন তার চরণ ফেলে
নিশার মত নীরবে পথ চলে।
সহরে তা অশোভন,
সহরে তা অসম্ভব।
পথিকের বাঁধাপথ আরও বেঁধে দেওয়া হয়েছে—
কলুটোলা স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট,
কর্ণ্‌ওয়ালিস স্ট্রীট হয়ে
পথিক যাবে।
তারই একটা মোড়ে—
সহস্র নিরুপায়ের ভিড়ে দাঁড়িয়ে ভিজছি।
দূর হতে কানে আসছে—
বিপুল পরাজয়ের তুমুল জয়ধ্বনি!
সহসা দেখা গেল—
মরণের কুসুমকেতন জয়রথ!

মনে হ'ল—

কি বিচিত্র শোভা তোমার—
কি বিচিত্র সাজ !
জয়ধ্বনির মধ্যে জোড়া জোড়া যোয়ান
আজ মৃত্যুমদে মাতাল হ'য়ে
টান্‌ছে সেই যান।
টল্‌ছে যত তাদের পা,
দুল্‌ছে তত রথের বিজয়কেতু !
হায় রে ! যেন—
লটপট করে বাঘছাল,
যেন—
বৃষ রহি রহি গরজে !
বাঁধাপথে অগণ্য নগণ্যের জনতা ;
তারই বুক দ্বিধা ক'রে
সিধা চলেছে মৃত্যুস্যন্দন
তার কলুটোলা স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট
কর্ণ্‌ওয়ালিস স্ট্রীট পার হ'য়ে।

সেই জয়যাত্রা-পথের বাঁকে
পলকের জন্য তুমি কাছে এলে বন্ধু !
পলকের তরে চোখে পড়ল তোমার মুখ !
মরণের অভিনন্দনে
সে মুখ কি অপরূপ হয়েছে বন্ধু !
মানুষের সকল পৌরুষ-প্রয়াস
বুকের পাটায় ঘ'ষে ঘ'ষে
উঠেছে যে ব্যর্থতার চন্দন,
তাতেই হ'ল তোমার ললাট অভিলিপ্ত।
তাদের সকল প্রার্থনাকে পরিহাস ক'রে

ফুটে উঠেছে যে ফুল,—
তাতেই রচিত হ'ল তোমার মাল্য !
করযোড়ে, নতশিরে, প্রণাম ক'রে বললাম—
বিদায় ; বন্ধু ; বিদায় !
মরণের হাতের লীলাকমল তুমি,
চলেছ আজ, জনস্রোতের তরঙ্গে তরঙ্গে,
সম্ভছেঁড়া সহস্রদল পদ্মের মতই ভেসে
শোকের বার্‌দরিয়ায়,
অগণিত নগণনীয়ের নাগালের বাইরে।
পরম অভিমানে তারা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে
তাদের নিষ্ফলা ফুল।
আমি ফুল দিই নি বন্ধু,
আমার পথে ফুলের দোকান পড়ে না।
আমি বলতে এসেছিলাম,—
হৃদয়বন্ধু, শোন গো বন্ধু মোর !
কিন্তু তুমি তখন
আমার কথার বাইরে চ'লে গেছ।
তাই শুধু চোখের জল মুছে
চোরের মত চুপি চুপি ঘরে ফিরছি।
ফেরার পথে, পরাজয়ের জয়োল্লাস
মৃদু হতে হতে আর শোনা যাচ্ছে না।
শুধু তার প্রতিধ্বনি উঠছে অন্তরে,—
আজি পিঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহি রে !
আর সাথে সাথে
রিক্‌শওয়ালার ঠুন্‌ঠুনিতে সান্ত্বনা বাজছে—
কি বিচিত্র শোভা তোমার,
কি বিচিত্র সাজ !

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

তর্পণ

"একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোক-রশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর···ছড়াইয়া পড়িল··· ।···একটি অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল যে, অন্তরের কোন একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে··· ।" (জীবন-স্মৃতি)

অফুরন্ত কথা অফুরন্ত গান অফুরন্ত সাধ লইয়া রবীন্দ্রনাথের দুর্ব্বার প্রাণশক্তি বিশ্বমানবের মনোজগৎ প্লাবিত করিয়া করুণার ধারা ঢালিয়া কোন্ মহাসাগরের দূরশ্রুত সঙ্গীতের আহ্বানে একদিন বাহির হইয়াছিল ! কাব্যে, সাহিত্যে, সুরে, সঙ্গীতে, জীবন-দর্শনের মহিমান্বিত চিন্তায়, আমাদের মনোজগতে সেই প্রাণশক্তির ধারার প্লাবনে বিপুল সমৃদ্ধি আনিয়াছে, যেখানে নূতন বীজ উপ্ত হইয়াছে, ফসলে-ফুলে শ্রীসম্পদে ভরিয়া উঠিয়াছে। সৃষ্টির রূপে—সৃষ্টির প্রেমে—সে প্রাণশক্তি 'সুন্দর ভুবনে মানবের মাঝে' অনন্ত জীবন কামনা করিয়াছিল। প্রভাতে সন্ধ্যায় নব নব সঙ্গীতের কুসুমে তিনি জগৎ ভরিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। বিপুল সৃষ্টির মধ্যে মাঝে মাঝে কত পরিশ্রান্ত ক্ষণে প্রিয়ার মিনতির মত সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া ক্লান্তি অনুভব করিয়াছেন ; কিন্তু অন্তরের গভীরতম সেই কেন্দ্রস্থল হইতে তখনই ধ্বনিত হইয়াছে আহ্বান। কবি অনিদ্র নয়নে—অকম্পিত ক্লান্ত হস্তে আবার রচনা করিয়াছেন নূতন গান, অটুট বীণায় অক্ষুণ্ণ কণ্ঠে তাহাতে সুর যোজনা করিয়াছেন। বাংলার—ভারতের কুল পবিত্র হইয়াছে, জননী কৃতার্থা হইয়াছেন।

অকস্মাৎ ধ্বনিত হইল নূতন আহ্বান—'কারো পানে ফিরে চাহিবার' ক্ষণ পার হইয়া গেল; কীর্ত্তির চেয়ে মহত্তর মহত্ত্বের প্রেরণায় তিনি কীর্ত্তিকে পশ্চাতে ফেলিয়া—জীবন-রথ চালনা করিলেন। সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী তাই তো সে বিরাটকে ভরিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিল না! 'সূর্য্যের বক্ষে সৃষ্টি যজ্ঞে, যে হোম বহ্নিরূপে জাজ্বল্যমান—সেই হোম-শিখা' তাঁহার সত্তায় সত্তায় ধরিয়াছিল স্রষ্টা কবির রূপ। জীবনের কীর্ত্তিকে পশ্চাতে ফেলিয়া জীবন-রথ চালনা করিতে করিতে সেই কবি আবার শুনিলেন নূতন আহ্বান। এবার "রিক্ত হস্তে বিরচিতে হবে, তাঁহাকে নূতন জীবনচ্ছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়",—এই আহ্বানে, এই উদ্দেশ্যে দিগন্তমুখে চালিত তাঁহার জীবন-রথ—শ্রাবণ-রাখী-পূর্ণিমার বিদায়ক্ষণে লোকচক্ষুর সতৃষ্ণ সপ্রেম দৃষ্টির বহির্লোকে চলিয়া গেল।

কীর্ত্তি তাঁহার অবিনশ্বর,—অনন্তশ্রী, অক্ষয়সম্পদ—রবীন্দ্র-কীর্ত্তির ভাণ্ডার পরিচর্য্যায় এবং রক্ষায় নিযুক্ত; কিন্তু কীর্ত্তির চেয়ে তিনি মহৎ ছিলেন বলিয়াই সর্ব্বোত্তম ভরসা এবং শক্তিকে হারাইয়া অপরিমেয় দুর্ব্বলতায় আমরা ধূলায় লুটাইয়া হাহাকার করিতেছি। তাই 'অমৃতের পুত্র' হইয়াও অমৃতলোক-জয়ীর জন্য আমরা শোকাচ্ছন্ন। এই শোকে সান্ত্বনা খুঁজিতে গিয়া মনে পড়িতেছে, রবীন্দ্রনাথের রচনার সহিত প্রথম পরিচয়ের কথা।

বঙ্গভঙ্গের ফলে রাখীবন্ধনের প্রথম পালনদিবস। তখন আমি বালক। রাখীবন্ধনের মন্ত্র শুনিলাম—সংস্কৃতে নয়, বাংলায়। সে মন্ত্র, সে সঙ্গীত বালকের প্রাণে কি অপূর্ব্ব আবেগ, তেজ ও শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল, সে ভুলিবার নয়। আমার মাস্টারমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মন্ত্র সংস্কৃত নয় কেন?

তিনি বলিয়াছিলেন, বাঙালীর মন্ত্র ব'লে সংস্কৃত নয়। এ মন্ত্র লিখেছেন কে জানিস? কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আজ সেই রাখী-মন্ত্রই মনে পড়িতেছে—

বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল,
পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান!

কবির শুভ আবির্ভাবে তাহা হইয়াছে, বাংলা আজ পুণ্যভূমি, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে কবি, তোমার আশীর্ব্বাদে আমাদের অন্তরে শক্তি সঞ্চারিত হউক, তোমার আবির্ভাবপূত পুণ্যভূমি, তোমার দানে সমৃদ্ধ পূর্ণ ভূমির গৌরব আমরা যেন রক্ষা করিতে সক্ষম হই।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ কথা

আমারো এসেছে আহ্বান কবি, তোমার সভার তলে,
শোক-বিজড়িত স্মরণ-সভায় সহস্রজন মাঝে;
সকলে এসেছে ছন্দোবন্ধ ক্রন্দনগীতি রচি,
আমি আনিয়াছি গোপন হিয়ার লুকানো বেদনা মম।

দূর হতে পূজা ভিখারীর মত চাহ নি কখনো ভুলে,
জীবনে তোমার লাগে নি কখনো আমার গানের সুর,
পূজারীর পূজা নিল না দেবতা—তাই ছিনু অভিমানে,
সে আমার মান ভীরু আঁখি-জলে সঁপিয়া দিলাম আজি।

শ্রীমতী বাণী রায়

একটি দিনের ঘটনা

রবীন্দ্রনাথ আজ দেহাতীত। কিন্তু তবু তিনি মর্ত্ত্যলোকে আজও বহু নরনারীর অন্তরে উজ্জ্বল হয়ে আছেন। যাঁরা তাঁর স্মৃতি বক্ষে নিয়ে আছেন, তাঁদের রবীন্দ্রভক্তি আজ সত্যে সমুজ্জ্বল। একটি দিনের একটি ঘটনার স্মৃতি, যা বহুবার বহুজনকে মুখে বলেছি কবি বেঁচে থাকতে, আজ তাই লিখে বলি।

কিছুদিন পূর্ব্বে, মোঙপু পাহাড়ে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ করতে যাবার আগে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বেলঘরিয়ার "গুপ্ত নিবাসে" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহলানবিস এবং তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী রাণী দেবীর অতিথি হয়ে। কবির স্বাস্থ্য তখন দুর্ব্বল ছিল, সেইজন্য দর্শনপ্রার্থীদের থেকে দূরে রাখবার জন্য চিকিৎসকদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী, অনেক অপ্রীতিকর কর্ত্তব্য তখন তাঁর সেক্রেটারিদের পালন করতে হ'ত। ঐ সময় একদিন মধ্যাহ্নের কিছু পরে গুপ্ত নিবাসের একতলার একটি ঘরে ব'সে আছি, এমন সময় দেখি একজন ব্যক্তি, চালচলন গ্রাম্য ধরনের, দারিদ্র্যের লক্ষণ সর্ব্বাঙ্গে বিজড়িত, অত্যন্ত শ্রান্ত-ভাবে ঘরের বারান্দায় এসে উপস্থিত। তাঁকে প্রশ্ন ক'রে টের পেলুম তিনি রবীন্দ্র-দর্শনপ্রার্থী, বহু দূর পথ হেঁটে এসেছেন, দর্শন সেরে পুনরায় সেই দূর পথ হেঁটেই ফিরবেন। বাঁধিগৎ আওড়াতে আর বিলম্ব করলুম না, বললুম, তিনি তেমন সুস্থ নেই, তা ছাড়া এখন তাঁর বিশ্রামের সময়। ব্যক্তিটি অত্যন্ত কাতরভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি কোনও আর্থিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে আসি নি, আর কথা ক'য়ে তার সময় নষ্ট করব না, তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম ক'রে শুধু দর্শন ক'রে

চ'লে যাব, দয়া ক'রে দর্শন করিয়ে দিন। সত্যি বড় কষ্ট হ'ল তাঁর কথা শুনে। কিন্তু এ রকমের উদ্দেশ্য নিয়ে রোজই তো কত লোক আসছে, কোথায় কষ্টবোধের সীমা-রেখা টানি। তাঁকে বললুম, আচ্ছা, আপনি সামনের পুকুরে (বারান্দার পাশেই বেশ পরিষ্কার জলে ভরা পাকা ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল) হাত পা ধুয়ে এসে এই বেঞ্চিতে ব'সে বিশ্রাম করুন, আমি উপরে গিয়ে দেখে আসি, কবি কি করছেন। যদি দেখি তিনি বিশ্রাম করছেন না, তা হ'লে তাঁকে জানাব আপনার প্রার্থনার বিষয়, তারপর তিনি যা বলেন আপনাকে জানাব। ভদ্রলোকটি মনে করলেন, হয়তো তাঁকে এই রকমের মৌখিক সৌজন্য দেখিয়ে শেষটায় রবীন্দ্রদর্শন না করিয়েই বিদায় দেব। তিনি অধিকতর কাতর হয়ে বললেন, দেখুন, আমি ইচ্ছে ক'রেই দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছি, কেন না হিন্দুমতে দেবতা দর্শনে লোকে দীর্ঘ পথ হেঁটেই যায়, রবীন্দ্রনাথ দেবতা, আমাকে দেবদর্শন থেকে বঞ্চিত করবেন না। তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললুম, আপনাকে নিরাশ ক'রে ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছে আমার নেই, আমি আপনার মুখের কথাই হুবহু বলব। ভদ্রলোকটি হাত মুখ ধুয়ে এসে বেঞ্চিতে বসলেন। দীর্ঘ পথ হেঁটে ফিরে যেতে হবে ব'লে তিনি একটু ব্যস্ত হয়েছিলেন দর্শনের জন্য। আমি আর বিলম্ব না ক'রে উপরে উঠে গেলুম রবীন্দ্রনাথের কাছে। তাঁর প্রিয় ভৃত্য বনমালী তখন তাঁর টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম গোছাচ্ছিল এবং তিনি দেশভ্রমণ-সম্পর্কীয় কি একটা ইংরেজী বই পড়ছিলেন কেদারায় হেলান দিয়ে, আমাকে সামনে উপস্থিত দেখে বললেন, কি হুকুম রায় চৌধুরী মশায়? আমি নীচের তলায় আগত ভদ্রলোকটির উদ্দেশ্যের কথা বললুম এবং তিনি যে দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছেন এবং হেঁটেই ফিরবেন সে কথাও রবীন্দ্রনাথকে বললুম। এই সঙ্গে তাঁর দারিদ্র্য

সম্বন্ধে আমার অনুমানের কথাও বললুম। রবীন্দ্রনাথ ক্ষণবিলম্ব না ক'রে বললেন, এখনই নিয়ে আয়। লোকটিকে পত্রপাঠ বিদেয় ক'রে দিস নি, এটা তার সৌভাগ্য বলতে হবে। আমি নীচে নেমে এসে ইচ্ছে ক'রেই একটু দেরি করছিলুম। ভেবেছিলুম, চা খাওয়া শেষ হয়ে গেলে এঁকে নিয়ে উপরে যাব। কিন্তু পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই দেখি বনমালী নীচে নেমে এসে আমাকে জানালে যে, এখনই ভদ্রলোকটিকে উপরে নিয়ে যেতে হবে, কর্ত্তা অপেক্ষা করছেন। আমি অমনই ভদ্রলোকটিকে নিয়ে উপরে উঠে রবীন্দ্রনাথের কক্ষে উপস্থিত হলুম। ভদ্রলোকটি রবীন্দ্রনাথকে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালেন এবং কিছু না ব'লে আনন্দে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন কবির মুখের দিকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বাভাবিক সৌজন্য দ্বারা চালিত হয়ে তাঁকে সামনের চেয়ারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে বললেন, ব'স। তিনি চেয়ারে না ব'সে কেদারার পাশে মেঝেয় পাতা কার্পেটে বসলেন—তখনও তিনি মূক। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন, তোমার যদি কোনো প্রার্থনা থাকে তো বল। ভদ্রলোকটি বললেন, আমার প্রার্থনা এবং বাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে, আমার দেবতাদর্শন ঘটেছে, এই পরম লাভ হ'ল, আর কিছুই চাই না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সরল উক্তিতে একটু বিচলিত হয়ে বললেন, সুধাকান্তের কাছে জানতে পারলুম, তুমি দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছ, আবার হেঁটেই ফিরবে। তুমি পাথেয় নিয়ে যাও, হেঁটে কেন ফিরবে? ভদ্রলোকটি এবার একটু সাহস ক'রে বললেন, আমি তো কষ্ট ক'রে কেষ্ট পাব ব'লেই হেঁটে এসেছি, হেঁটে এসে আপনার দর্শন পেলুম এই আমার আনন্দ, এই আমার গর্ব্ব। আপনার আশীর্ব্বাদই আমার জীবনের পাথেয় হোক। রবীন্দ্রনাথ এই কথার পর তাঁকে পাথেয় সম্বন্ধে আর কিছু বললেন না। তাঁর কর্ম্মজীবন

সম্বন্ধে দু-একটা প্রশ্ন ক'রে বললেন, আমার কাছে ব'সে চা সন্দেশ খেতে তোমার আপত্তি নেই তো? ভদ্রলোকটি বললেন, এতে কেন আপত্তি হবে, আপনি খেতে দিচ্ছেন আনন্দের সঙ্গে খাব, ক্ষিধেও পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সন্দেশাদি তৃপ্তিপূর্ব্বক খেয়ে কবিকে সভক্তি প্রণাম নিবেদন ক'রে তিনি চ'লে গেলেন। সন্ধ্যের পর কবির কাছে ব'সে আছি, (যেমন প্রায়ই থাকতুম) কবির মনে তখনও সেই ভদ্রলোকটি সরল ভক্তি এবং শ্রদ্ধার কথা ঘুরছে। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে ঐ ভদ্রলোকটির কথা পেড়ে বলতে শুরু করলেন— এরাই বারে বারে বিতাড়িত হয় আমার দ্বার থেকে আমার রক্ষকদের দ্বারা। আড়ম্বর আর পোশাক-পরিচ্ছদের পাসপোর্ট নেই এদের, তাই তোরা অনায়াসে এদের অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিস। তোরা মনে করিস, কাউকে তাড়িয়ে দেওয়াটা খুব একটা বাহাদুরি। তোরা আসলে কাপুরুষ। হ্যাটকোট-পরা অনেক আন্‌ডিজায়ারেব্‌ল মাতব্বর কাউকে তাড়াবার সাহস তোদের নাই, তাদের তোরা মাথা হেঁট ক'রে খোশামোদ ক'রে মাথায় তুলে আমার কাছে এনে উপস্থিত করিস, তখন আমার দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের কথা তোদের মনেও থাকে না— এই রকমের গরিব বেচারাদের বেলায় তোমাদের কর্ত্তব্যবোধ টনটনে হয়ে ওঠে। আমাকে দেখতে এসে এই রকম কত লোক তোদের হাতে না জানি কি লাঞ্ছনাই ভোগ করে! তোরা মনে করিস, আমি তোদের এই সব কর্ত্তব্যবোধের বিষয় কোন খোঁজ-খবর রাখি না। রাখি, কিন্তু কিছু করতে পারব না জেনেই সব সহ্য করি।

কতবার কত ঘটনায় এই রকমের কত বকুনি রবীন্দ্রনাথ আমাদের দিয়েছেন, এবং এও জানি, কর্ত্তব্যের দায়ে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কত কাজ করেছি। কিন্তু এটাও সত্যি যে, তখন না হোক পরে বুঝেছি, কি গভীর অনুভূতি নিয়েই তিনি এ রকমের বেদনা মুখ ফুটে আমাদের বলতেন। এই তো মাত্র একটি ঘটনা। কত দিনের কত স্মৃতি কত ঘটনাকে জড়িয়ে আছে, সব কি একদিনে ঠিকমতন মনে পড়ে!

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

'গল্পগুচ্ছে'র এক দিক

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ প্রায় শোনা যায়, তিনি শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের জন্য লিখিয়াছেন, বাংলার মাটির সঙ্গে বাংলার আপনার জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহার সংস্রব খুব বেশি নয়। তিনি তাহাদের কথা বলেন নাই, এবং সেই হেতু তাহাদের অন্তরে তিনি পৌঁছাইতে পারেন না। এই কথাটা তুলনামূলক সমালোচনায় খুব বড় করিয়া আত্মপ্রকাশ করে, যখন শরৎচন্দ্র তাঁহার গৌরবের শিখরে। কথাটার মধ্যে কিছু সত্য আছে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম, পারিবারিক পরিবেষ্টনী, শিক্ষা প্রভৃতির কথা ভাবিতে গেলে এটা অনেকটা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কখনও শরৎচন্দ্র হওয়া সম্ভব ছিল না। তবুও কথাটা কি ষোল আনাই সত্য? আমার তো মনে হয় না।

যেখানে রবীন্দ্রনাথ কাব্যলোকের একেবারে ঊর্দ্ধ-লোকে উঠিয়া গিয়াছেন, সেখানে তিনি আপামর সাধারণের কাছে কেন, অনেক সময় শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের ও অনেকের পক্ষে অনধিগম্য। এভারেস্ট-অভিযানে ম্যালরি ও আরভিন-এর মত, মনে হয়, সব সঙ্গীদেরই ছাড়িয়া তিনি এক এক সময় সম্পূর্ণ অনতিক্রম্য ঊর্দ্ধে লীন হইয়া গেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁহার সৃষ্টির একটা ক্ষেত্র আছে সেখানে তিনি একেবারে খাঁটি বাঙালীর জীবনের সন্ধান আমাদের দিয়াছেন,—যেখানে তাঁহার ঊর্দ্ধলোক হইতে নামিয়া তিনি আমাদের অতি-পরিচিত মাটির জগতে পা দিয়াছেন। আমি তাঁহার ছোটগল্পের কথা বলিতেছি। —বিশেষ করিয়া 'গল্পগুচ্ছে'র ছোটগল্পের কথা। অবশ্য এ কথা বলিয়া

দেওয়া প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের মধ্যে যে বাঙালী-জীবনকে প্রতিভাত করিয়াছেন, তাহা প্রধানত মধ্যবিত্ত বাঙালী-জীবন—যাহা বলিতে গেলে স্ট্যাণ্ডার্ড বাঙালী-জীবন। এর এক দিকে আছে পাশ্চাত্য সভ্যতায় যার জন্ম সেই আধুনিক অভিজাত-সম্প্রদায়, অপর দিকে আছে বস্তি-জীবন—অবশ্য তাহাও আধুনিক সভ্যতারই সন্তান; বলিতে গেলে একটা উগ্র সভ্যতা অথবা অন্যভাবে উৎকট অসভ্যতা। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক অভিজাতকে আঁকিয়াছেন, মধ্যবিত্ত এবং পুরাতন অভিজাতকে আঁকিয়াছেন। বস্তি-জীবনে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। কেন পারেন নাই, সেটা একটা আলাদা কথা। আমার মনে হয়, বাঙালী-জীবনের এই অংশের প্রতি তাঁহার একটা গভীর সমবেদনা ছিল, কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য-জ্ঞানটা এত সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর ছিল যে এই জীবনের ক্লেদকে, এই জীবনের গ্লানিকে তিনি সাহিত্যের মধ্যে স্থায়ী জায়গা দিতে পারেন নাই। ইহার জন্য দোষ দিতে হইলে দোষ দেওয়া উচিত তাঁহার চিত্তের শুচিতাকে।

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ আমি যখনই আগাগোড়া বা অংশতও পড়িয়া গিয়াছি—একটি অনুভূতি আমার মনে আর সব অনুভূতিকেই ছাপাইয়া উঠিয়াছে, মনে হইয়াছে, যেন গাঢ় নীল আর সবুজের সুষমায় ভরা সারা বাংলা দেশটা পরিক্রমা করিয়া আসিলাম। আমার বোধ হয় না এক প্রবাসী যুবকের দেশতৃষা রবিবাবু যতটা মিটাইয়াছেন, শ'-দুশ'-টাকা গচ্ছিত লইয়াও রেল কোম্পানি কখনও তাহার শতাংশের এক অংশও মিটাইতে পারে নাই। সবুজের সমুদ্রে বাঙালীর এক একটি পল্লীদ্বীপের মত এক একটি আত্মসম্পূর্ণ ছোটগল্প আমার মনে যেন পরতে পরতে বসিয়া যাইত। এক একটি চিত্র কি সজীব দেখা যাক।—

"তারাপদ নৌকার ছাদের উপরে পালের ছায়ায় গিয়া আশ্রয় লইল।

পর্য্যায়ক্রমে ঢালু সবুজ মাঠ, প্লাবিত পাটের ক্ষেত, গাঢ় শ্যামল আমন ধানের আন্দোলন, ঘাট হইতে গ্রামাভিমুখী সঙ্কীর্ণ পথ, ঘন বনবেষ্টিত ছায়াময় গ্রাম তাহার চোখের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। এই জল স্থল আকাশ এই চারিদিকের সচলতা, সজীবতা, মুখরতা,—এই ঊর্দ্ধ অধো-দেশের ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য এবং নির্লিপ্ত সুদূরতা এই সুবৃহৎ, চিরস্থায়ী, নির্নিমেষ বাক্যহীন বিশ্বজগৎ তরুণ বালকের পরমাত্মীয় ছিল।" (অতিথি)

এই পটভূমিকা একেবারে প্রবাসীর স্বপ্নের বাংলা। এতে "বাক্যহীন বিশ্বজগতে"র আভাস পড়িলেও, এ টানা আর পোড়েন উভয় দিক দিয়াই বাংলা। এই জীবন তারাপদরূপ চঞ্চল মানবটিকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত না বটে, কিন্তু বহু সুদূরের একটি প্রবাসী মানবককে একেবারে নীড়বদ্ধ শাবকের মত করিয়া ধরিয়া থাকিত। এই পটভূমিকার সামনে জীবনের বিচিত্র রূপ দেখিতাম। বাঙালী-জীবনের বিচিত্র রূপ হাসি-অশ্রু কৌতুক-বিষাদে বিচিত্র। কোথায় নবেন্দুর শ্যালীবর্গের মধ্যে জ্যেষ্ঠা এবং রূপে গুণে শ্রেষ্ঠা লাবণ্যলেখা একটা শুভদিন দেখিয়া নবেন্দুর শয়নকক্ষের কুলুঙ্গির মধ্যে দুই জোড়া বিলাতী বুট সিন্দুরে মণ্ডিত করিয়া স্থাপন করিল"...আর আজ উত্তর-জীবনের নিরাপত্তার মধ্যে অনেকটা ভয়-ভাঙা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং বলিতে আর সঙ্কোচ নাই যে, ঠিক নবেন্দু না হইয়া নবেন্দুর এই ধরনের শ্যালী-সৌভাগ্যের জন্য লোভ হইত। তাহার রহস্যটা আজকাল একটু তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া বুঝিয়াছি যে, লাবণ্যলেখা ছিল খাঁটি বাঙালী-জীবনের একটা টাইপ বা আদর্শ। বাঙালী-জীবনের মাধুর্য্যের অংশটিকে ইহারা নিজেদের উচ্ছল কৌতুকচপলতায় আরও মধুর করিয়া রাখিয়াছে। নাকালের নৈশায় দেখিতাম, পল্লীবালিকা মৃন্ময়ীর হাতে বি. এ. পাস অপূর্ব্বকৃষ্ণের নাকালের চিত্র ভাসিয়া উঠিত :—

"অপূর্ব তাহাকে (মাঝিকে) নিবারণ করিয়া নিজেই ব্যাগ হাতে লইয়া আনন্দভরে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল। নামিবামাত্র, তীরে ছিল পিছল, ব্যাগসমেৎ অপূর্ব কাদায় পড়িয়া গেল। যেমন পড়া অমনি কোথা হইতে এক সুমিষ্ট উচ্চকণ্ঠে তরল হাস্যলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া নিকটবর্তী অশথগাছের পাখীগুলিকে সচকিত করিয়া দিল।"

(সমাপ্তি)

এমন একটা বাংলার ছাপমারা, দুরন্ত গেঁয়ো মেয়ের ছবি ভাসিয়া উঠিত যে, সে একটা বি. এ.-পাস গম্ভীর প্রকৃতির যুবাকে আমল না দিলেও তাহাকে অত্যন্ত কাছের এবং প্রিয় বলিয়া মনে হইত।

আর একটি চিত্র লওয়া যাক,—

"কিরণ সহাস্যমুখে পানের বাটা পাশে রাখিয়া খাটের উপর বসিতেন, দাসী তাঁহার ভিজে এলোচুল চিরিয়া চিরিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া শুকাইয়া দিত এবং নীলকান্ত নীচে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া নলদময়ন্তীর পালা অভিনয় করিত—এইরূপে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন অত্যন্ত শীঘ্র কাটিয়া যাইত। শাশুড়ী এক একদিন ঠাকুরদেবতার নাম শুনিবার আশায় আকৃষ্ট হইয়া আসিতেন, কিন্তু অবিলম্বে তাঁহার চিরাভ্যস্ত মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রাবেশ ভক্তিতে অভিভূত এবং তাঁহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিত।"

(আপদ)

বাঙালী-ঘরের বোধ হয় একেবারে নিজস্ব জিনিস। ছেলে-বেলায় যখন দেশে ছিলাম, তখনকার পাঠশালা-পলাতক জীবনের একটা অত্যন্ত সাধারণ অভিজ্ঞতা। ঠিক এই ধরনের দময়ন্তীর পালা না শুনাইলেও, বোধ হয় ঠিক এই পরিবেশের মধ্যেই এইভাবে প্রসাধন-শীলাদের আমড়া-কামরাঙা সরবরাহ করিয়াছি। বাঙালী গৃহস্থ-পরিবারের একটা নিখুঁত মাধ্যাহ্নিক চিত্র। সবার ভাগ্যে হয়তো চুলের

পরিচর্য্যার জন্য জালী জোটে না, কিন্তু ননদ, জা, অথবা সখী থাকার জন্য চিত্রে এমন কিছু ইতর-বিশেষ হয় না। নলদময়ন্তীর পালা দিয়া কর্ণ শীতল করার চেয়ে টকের সাহায্যে রসনা-তৃপ্তিও চিত্রের বিশেষ তারতম্য ঘটায় না।

এই রকম ধরনের কতকগুলি টাইপ, তাহার চারিদিক ঘিরিয়া—সেই একই সবুজ মাঠ, প্লাবিত পাটের ক্ষেত, গাঢ় শ্যামল আমন-ধানের আন্দোলন, ঘাট হইতে গ্রামাভিমুখী সঙ্কীর্ণ পথ—ঘনবনবেষ্টিত ছায়াময় গ্রাম। জীবনের সেই স্বপ্ন-বিলাসিতার যুগে এক প্রবাসী বালকের অন্তরে এসব যে কি একটা মোহ বিস্তার করিত, এখন—সময়ের এপার থেকে তাহা বলিয়া বুঝানো যায় না।

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চিত্রে বর্ষা আর নদীর অংশ খুব বেশি রাখিয়াছেন। তাহার তুলনাহীন শ্যামলতায় বাংলাকে ফুটাইতে হইলে এটা নিশ্চয় অপরিহার্য্য। এ সম্বন্ধে ছেলেবেলাকার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। আমার এক বাল্যবন্ধুর এক সবজান্তা গোছের ভগিনীপতি ছিল—ভদ্রলোক হাইকোর্টে কোন একটা সেরেস্তার কাজ করিতেন। যখন আসিতেন, পৃথিবীর সম্বন্ধে অনেক তাজা খবরাখবর জানিবার আশায় আমরা ছেলের দল তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিতাম। কেমন একটা ধারণা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, হাইকোর্টে কাজ করেন বলিয়া তাঁহার দৃষ্টিটা অনেক দূর পর্যন্ত অপ্রতিহত। একবার রবিবাবুর কথা উঠিল—তখন কবিবরের সঙ্গে অল্প অল্প পরিচিত হইতেছি, একটা ইণ্টারেস্ট জমিয়া আসিতেছে।···ভদ্রলোক একটু তাচ্ছিল্যের মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, আজকাল লোকটা লিখছে মন্দ নয়, ওর আর কি, একটা নদী, খানিকটা জঙ্গল নয়তো খানিকটা বর্ষা···ব্যস, রবি ঠাকুরের লেখা দাঁড়িয়ে গেল।

লোকটার প্রতি আমার তখন এতটা সম্ভ্রমের ভাব হইয়াছিল যে বলিয়া উঠিতে পারি না। মনে হইয়াছিল, জোড়াসাঁকোর চেয়ে হাইকোর্ট নিশ্চয়ই উঁচু। দেখিলাম, প্রায় মূল কথাটা ধরিয়া ফেলিয়াছে। অবশ্য এই বর্ষা, নদী, বনানীর শ্যাম আবেষ্টনী আমায় খুবই টানিত—কিন্তু তখন ভদ্রলোকের বলিবার ভঙ্গিতে ক্ষণিকের জন্য কবিবরের প্রতিভাকে একটু বোধ হয় খাটো করিয়া দেখিয়াছিলাম। অবশ্য পরের জীবনে কবির বর্ষার মত সরস লেখাতে নিমগ্ন হইয়া গিয়া মল্লিনাথটির আর খোঁজখবর লইবার সুযোগ হয় নাই।

আমার এই টাইপ চিত্রগুলির উদ্ধারণে কেহ যেন মনে না করেন, আমি গল্পগুচ্ছের অন্য গল্পগুলির অমর্য্যাদা করিতেছি। ক্ষুধিত পাষাণ প্রভৃতি কয়েকটি গল্প ছাড়া আমার মনে সব গল্পই এক নিজ বাংলার ছাপ রাখিয়া যায়। শিলাইদহের যুগের এই রচনাগুলিতে বোঝা যায়, বাংলার সঙ্গে কবিবরের কি নিবিড় দরদভরা যোগই না ছিল। বোধ হয় মতভেদ হইতে পারে, তবুও বলি বঙ্কিমের মধ্যেও ঠিক এই জিনিসটি এ ভাবে ফোটে নাই। না ফুটিবার একটু কারণ ছিল—তিনি ছিলেন রোম্যাণ্টিক স্রষ্টা। আমার মনে হয়, প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট যে রিয়ালিষ্টিক যুগ আসিয়াছে রবীন্দ্রনাথই তাহার প্রথম প্রবর্ত্তক, এবং তাহা তিনি করিয়াছেন তাঁহার ছোটগল্পের দ্বারা। এই জিনিসই বিকাশ লাভ করিয়াছে শরৎচন্দ্রে এবং পরবর্ত্তী সাহিত্যে।

গল্পগুচ্ছের একটা দিক অংশত দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। গল্পগুচ্ছ লইয়াই রবিবাবুর সব গল্প নয়। তাঁহার চিরবিকাশমান প্রতিভায় একদিকে যেমন নৌকাডুবি, চোখের বালি, ঘরে বাহিরে, শেষের কবিতার মত উপন্যাস সৃষ্ট হইয়াছে, তেমনই গল্প সাহিত্যেরও হইয়াছে আমূল পরিবর্ত্তন।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ

[এই সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশিত "রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ" প্রবন্ধে কালিগ্রাম পল্লী-সংস্কার কার্য্যে রবীন্দ্রনাথের সহযোগী শ্রীযুক্ত অতুল সেনের উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গ তাঁহারই স্মৃতিকথা। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সহিত শিলাইদহের কুঠি-বাড়িতে ও অন্যত্র একত্র বাস করিবার সুযোগ তাঁহার হইয়াছিল। মানুষ রবীন্দ্রনাথের কিছু পরিচয় এই স্মৃতি-কথাগুলিতে পাওয়া যাইবে।—স. শ. চি.]

"আমার মৃত্যুর পর তোমরা বরং বলো, আমি কবি ছিলাম না। সে আমার সইবে। কিন্তু দোহাই তোমাদের, কোনও সুবর্ণ-গর্দ্দভকে [দুই একটি নির্দ্দিষ্ট নাম বলিয়াছিলেন] সভাপতি খাড়া ক'রে জনসভায় সার্টিফিকেট দিও না যে, রবীন্দ্রনাথ একজন কবি ছিলেন।"

একদিন অবসরকালে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় কয়েকটি পুরাতন চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলিতেছিলাম, এমন সময় পা টিপিয়া রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত। বলিলেন, "কি গো, কি হচ্ছে? যারা একদিন প্রণয়ের দূতী ছিল, তাদের নিয়ে প্রলয় কেন?" চুপ করিয়া রহিলাম। কবি হাসিয়া বলিলেন, "তা ঠিকই করছ; দুটো কথা তো একই। প্র-পূর্ব্বক নী আর প্র-পূর্ব্বক লী, ব্যুৎপত্তি প্রায় একই। দার্শনিকেরা ও দুটোতে কোনও তফাৎ দেখেন না।"

আমার পাঁচ বছরের ছেলে অরুণাভ তাহার মায়ের শিক্ষামত ঠাকুর-কবিকে হরিঠাকুর বলিত। তাঁহার নিকট হাতজোড় করিয়া তাহাকে প্রায়ই বলিতে শুনা যাইত, "হরিঠাকুর, আমি তোমার কথা শুনব, বাবার কথা শুনব, মায়ের কথা শুনব।" এই ব্যাপারটিতে রবীন্দ্রনাথ এমনই কৌতুক বোধ করিয়াছিলেন যে, একবার "পদ্মা" বোট হইতে তাহাকে একটি পত্র লিখিয়া নীচে সহি করিয়াছিলেন, "হরি ঠাকুর।"

একদিন শিলাইদহের কুঠি-বাড়িতে আমি ও উপেন ভদ্র ধর্ম্ম

বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সহিত তুমুল তর্ক জুড়িয়া দিয়াছিলাম। রাত্রি প্রায় দেড়টায় তর্ক থামে; আমরা ভাবি, আমাদের জিত; রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ভাবিয়াছিলেন, তাঁহারই জিত; কারণ তিনি প্রসন্ন মনে তেতলার চিলে-কোঠায় শয়ন করিতে গেলেন। আমরা রহিলাম দোতলায়। ঘণ্টা খানেক পরে শুইতে যাইব, হঠাৎ লক্ষ্য পড়িল তেতলায় আলো জ্বলিতেছে। কি ব্যাপার! পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে গিয়া দেখি তিনি একমনে কি যেন লিখিয়া চলিয়াছেন, কোনও দিকে খেয়াল নাই। সেই ভাবেই ভোর পর্য্যন্ত; তিনিও লিখিতে থাকেন এবং আমরাও আড়াল হইতে তাঁহাকে পাহারা দিই। সকাল হইবার মুখে তাঁহার দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া টেবিলের কাছাকাছি হাজির হইলাম। লেখা কাগজগুলা হাতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখি, গত রাত্রির তর্কের ব্যাপার তিনি একটি গল্পের আকারে লিখিয়াছেন; গল্পের পাত্র কবি স্বয়ং এবং আমরা দুইজন। গল্পের মধ্যে তর্কে বিপক্ষদ্বয়কে পরাস্ত করিয়া তবে তিনি কলম ছাড়িয়াছেন। দুঃখের বিষয়, সে গল্পটির আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই, কোথায়ও প্রকাশিত হয় নাই।

প্রবল বেগে 'ঘরে-বাইরে' লেখা চলিতেছে। 'সবুজ পত্রে' মাসে মাসে প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমরা শুনিতেছি। নায়ক-নায়িকার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমাদের দুশ্চিন্তার অবধি নাই—কাহার কি হইবে! একদিন ধরিলাম তাঁহাকে, বলিলাম, "এদের কার কি হবে বলুন আমাদের।" কবি হাসিয়া বলিলেন, "তা কি ছাই আমি নিজেই জানি? রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে—কোথায় পৌঁছবে বলতে পারি না। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, বিমলা আমার ধারণার বাঁধা সড়কের বাইরে পা বাড়িয়েছে। তোমাদের মত আমিও কৌতূহলী হয়ে অপেক্ষা করছি।"

রবীন্দ্রনাথের যে বোটটি কালিগ্রামে থাকিত, তাহার নাম ছিল "নাগর"; শিলাইদহের বোটের নাম ছিল "পদ্মা"। একবার আমি বিশেষ কোনও কারণে "নাগর" নামে আপত্তি জানাই। কবি আশ্চর্য্য হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলেন, "বল কি হে! তুমি বুঝি গ্রামের নামটিই ভুলে গেছ! আর গ্রামের ঠিক প্রান্তের নদীটা?"

লজ্জিত হইলাম। গ্রামের নাম "পতি-সর", নদীর নাম "নাগর"।

একটা খুব দামী ল্যাম্প নিতান্ত অসাবধানতায় চাকরের হাত হইতে পড়িয়া ভাঙিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রিয় বস্তু, তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন; মনে হইল, চাকরকে ভয়ঙ্কর রকম শাস্তি দিবেন। অপরাধী হুজুরে হাজির হইল, তিনি তাহাকে কষিয়া গালি দিলেন, তাহার ভাষা এই—"তোদের এতটুকু দায়িত্বজ্ঞান নেই, এতটুকু সতর্কতা নেই, মনিবের জিনিসের উপর কোনও মায়া নেই···" ইত্যাদি।

ইহার দুই-এক দিন পরেই এক ভৃত্যের চুরি ধরা পড়ে। তিনি তাহাকে এই ভাষায় তিরস্কার করিলেন—"হিসেবে গোলমাল হ'লে তাকে তো তস্করতা আখ্যা দেওয়া যায়···" ইত্যাদি।

ইহা লইয়া উপেন ভদ্র ও আমি আড়ালে রসিকতা করিতেছিলাম, আমি বলিলাম, "কর্ত্তার এই কড়া কড়া গালগুলি চাকরদের গায়ে খুব বিঁধছে, না? কবির ভৃত্যরা সম্ভবত স্থূলচর্ম্মী নয়।"

রবীন্দ্রনাথ কাছাকাছি ছিলেন আমাদের অজ্ঞাতে। বলিয়া উঠিলেন, "ভুল করো না। শুধু চর্ম্মভেদ করলেই মর্ম্মে পৌঁছনো যায় না। মানুষ গুপ্তমর্ম্মী; তার গোপনঘরে প্রবেশের পন্থা অন্য।"

[এই প্রসঙ্গ পরেও প্রকাশিত হইবে। স. শ. চি.]

শ্রীঅতুল সেন

দিন অবসান হোলো।

আমার আঁখি হতে অস্ত-রবির

আলোর আড়াল তোলো।

অন্ধকারের বুকের কাছে নিত্য-আলোর আসন আছে,

সেথায় তোমার দুয়ারখানি খোলো।

সব কথা সব কথার শেষে

এক হয়ে যাক মিলিয়ে এসে।

স্তব্ধ বাণীর হৃদয় মাঝে গভীর বাণী আপনি বাজে,

সেই বাণীটি আমার কানে বোলো।

—রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী

১৩৪৬ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে আমরা "রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী" প্রকাশ করিতেছিলাম; ঐ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত ছয় মাস উহা ধারাবাহিকভাবে বাহির হইয়াছিল। ১৩০১ সালে (১৮৯৪) প্রকাশিত 'কথা-চতুষ্টয়' পর্য্যন্ত আসিয়া আমরা থামিয়া গিয়াছিলাম। কেন থামিয়াছিলাম, তাহা এখন মনে নাই; সম্ভবত ঐ কার্য্যে যে অমানুষিক পরিশ্রম আবশ্যক, শরীরে ততটা পরিশ্রম সহিতেছিল না। পুস্তকগুলির প্রকাশ-তারিখের জন্য বেঙ্গল লাইব্রেরি (সেক্রেটারিয়েট), ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরি ও যাঁহাদের কাছে রবীন্দ্র-পুস্তক-সংগ্রহ আছে, তাঁহাদের নিকট দৌড়ধাপ এবং পুরাতন সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত অনেক অনামা ও বেনামা প্রবন্ধ কবিতা পাঠ করিয়া, রবীন্দ্রনাথের নামে প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তকের সহিত সেগুলি মিলাইয়া রচনাপঞ্জী প্রস্তুত করা খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। আজ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে অনেকে রচনাপঞ্জীর পুনঃপ্রকাশ প্রার্থনা করিতেছেন; রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই কর্ত্তব্যপালনের কথা আমাদেরও মনে হইয়াছে। সুতরাং আবার রচনাপঞ্জীতে হাত দিতেছি। রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকিতে আমাদের উপদেশ দিতে ও ভুলভ্রান্তি নির্দ্ধারণ করিতে তিনি ছিলেন। আজ তিনি নাই, তাঁহার আশীর্ব্বাদ আছে। সেদিন যদিও আমাদের প্রামাণিকতার প্রশংসাপত্রের প্রয়োজন ছিল না, তবু পাঠক-সাধারণের দরবারে তাঁহার অবর্ত্তমানে একদিন ছাড়পত্র প্রয়োজন হইবে জানিয়া তাঁহাকে দিয়া উহা লিখাইয়া লইয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথের পুরাতন রচনাসম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার যে আমাদের আছে, এই

প্রশংসাপত্রে তাহার প্রমাণ মিলিবে। রবীন্দ্রনাথকে দিয়া তাঁহার বহু নামহীন রচনার আমাদের প্রস্তুত তালিকায় সহিও করাইয়া রাখিয়াছি। সেই তালিকাও এই রচনা-পঞ্জীতে ক্রমশ প্রকাশিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাপত্রটি ছাপিতে আমাদের সঙ্কোচ ছিল, তাঁহার জীবিতকালে ইহা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এখন হইয়াছে।

শ্রীমান সজনীকান্ত দাস আমার বাল্য ও কিশোরের বেনামী রচনাগুলি আবিষ্কার করে আমাকে বিস্মিত করেছেন। পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আমার সর্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা "অভিলাষ" তাঁহার নূতন আবিষ্কার। ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ বিস্মৃতি ঘটেছিল। জ্যোতিদাদার প্রথম চারটি নাটকের অধিকাংশ কবিতা এবং গান যে আমারই রচনা তাও সজনীকান্তের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নি। হিন্দুমেলায় দিল্লিদরবার সম্বন্ধে আমার পঠিত কবিতাটি "স্বপ্নময়ী"তে আত্মগোপন করেছিল সেটাও সজনীকান্তের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। সজনীকান্ত প্রদত্ত নিম্নলিখিত তালিকাটির রচনাগুলি নিঃসংশয়ে আমার। কিন্তু পরবর্তী তালিকার রচনাগুলি সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয় হতে পারি নি। আমি যে দিকশূন্য-ভট্টাচার্য ও অপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর ইত্যাদি ছদ্মনামে এককালে অনেক লেখা লিখেছি তা জেনেও বেশ কৌতুক বোধ করছি। এখানে বলা আবশ্যক শেষোক্ত নামটি কোনো লেখক অন্য কোনো কোনো রচনায় আত্মসাৎ করেছেন বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন ২৭।১১।৩৯

কারণ দেখিতেছি, তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ও পূর্ব্বে প্রকাশিত কয়েকটি দৈনিক পত্রে ও সাময়িক-পত্রের বিশেষ সংখ্যায় আমাদের

আবিষ্কৃত মাল-মশলা ব্যবহৃত হইয়াছে, অথচ আমরা হিসাব হইতে বাদ পড়িয়াছি। এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। মানুষের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিও স্বাভাবিক। সেই প্রবৃত্তির বশে আমরা আমাদের কৃতিত্বের দলিলটি ছাপিলাম।

বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা ধারাবাহিকভাবে (পূর্ব্বে যেমন করিতে-ছিলাম) রচনাপঞ্জী প্রকাশ করিতেছি না, আগামী মাস হইতে তাহা করা হইবে। এবারে আমরা ১৩১২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটি রচনা এবং তাঁহার 'নৌকাডুবি'র প্রথম সংস্করণের শেষে মুদ্রিত দুইটি পুস্তকের বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করিব। 'নৌকাডুবি' ১৩১৩ বঙ্গাব্দে (১৯০৬) বাহির হয়, ইহার সাত বৎসর পরেই তিনি নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন। সুতরাং এই বিজ্ঞাপনটি আজকালকার পাঠকদের কাছে অতিশয় কৌতুককর মনে হইবে।

"স্মৃতিরক্ষা" প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের কোনও পুস্তকে মুদ্রিত হয় নাই, তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার এই রচনাটি দেশের জনসাধারণের গোচরে আনা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি; ইহা প্রকাশের উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-রক্ষার আয়োজনের বিরোধিতা করা নয়। তবে এ বিষয়ে তাঁহার সুস্পষ্ট মতামত কি ছিল, তাহাও জানা আবশ্যক।

স্মৃতিরক্ষা

আজকাল আমাদের দেশে বড়লোকের মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার চেষ্টায় সভা করা হইয়া থাকে। এই সকল সভা যে বার বার ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা আমরা দেখিয়াছি।

যে দেশে কোনো একটা চেষ্টা ঠিক একটা বিশেষ জায়গায় আসিয়া ঠেকিয়া যায় আর অগ্রসর হইতে চায় না, সে দেশে সেই চেষ্টাকে অন্য কোনো একটা সহজ পথ দিয়া চালনা করাই, আমি সুযুক্তি বলিয়া মনে করি। যেখানে দরজা নাই কেবল দেয়াল আছে, সেখানে ঠেলাঠেলি করিয়া লাভ কি?

আমাদের দেশে মানুষের মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত নাই। এই পৌত্তলিকতা আমরা য়ুরোপ হইতে আমদানি করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। কিন্তু এখনও কৃতকার্য্য হইবার কোনও লক্ষণ দেখিতেছি না।

ইজিপ্‌ট্‌ মৃতদেহকে অবিনশ্বর করিবার চেষ্টা করিয়াছে। য়ুরোপ মৃতদেহকে কবরে রাখিয়া যেন তাহা রহিল এই বলিয়া মনকে ভুলাইয়া রাখে। যাহা থাকিবার নহে তাহার সম্বন্ধে মোহ একেবারে নিঃশেষ করিয়া ফেলা আমাদের দেশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার একটা লক্ষ্য।

অথচ য়ুরোপে বার্ষিক শ্রাদ্ধ নাই, আমাদের দেশে তাহা আছে। দেহ নাই বলিয়া যে, যাঁহাকে শ্রদ্ধানিবেদন করিব তিনি নাই একথা আমরা স্বীকার করি না। মৃত্যুর পরে আমরা দেহকে সমস্ত ব্যবহার হইতে বর্জ্জন করিয়া অনশ্বর পুরুষকে মানিয়া থাকি। আমাদের এই প্রকারের স্বভাব ও অভ্যাস হওয়াতে মানুষের মূর্ত্তিস্থাপনায় যথেষ্ট উৎসাহ অনুভব করি না। অথচ আমাদের দেশে মূর্ত্তিরক্ষার পরিবর্ত্তে কীর্ত্তিরক্ষা বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে। মানুষ মৃত্যুর পরে ইহলোকে মূর্ত্তিরূপে নহে কীর্ত্তিরূপে থাকে, এ কথা আমরা সকলেই বলি। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" কথার অর্থ এই যে, যাঁহার কীর্ত্তি আছে তাঁহাকে আর মূর্ত্তিরূপে বাঁচিতে হয় না।

কিন্তু কীর্ত্তি মহাপুরুষের নিজের; পূজাটা ত আমাদের হওয়া উচিত। কেবল পাইব, কিছু দিব না সে ত হইতে পারে না।

তা ছাড়া মহাপুরুষকে স্মরণ করা কেবল যে কর্ত্তব্য, তাহা ত নয়, সেটা যে আমাদের লাভ। স্মরণ যদি না করি, তবে ত তাঁহাকে হারাইব। যত দীর্ঘকাল আমরা মহাত্মা-দিগকে পূজা করিব, ততই তাঁহাদের স্মৃতি আমাদের দেশের স্থায়ী ঐশ্বর্য্যরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

বড়লোককে স্মরণীয় করিবার একটা দেশি উপায় আমাদের এখানে প্রচলিত আছে, শিক্ষিতলোকে সেদিকে বড় একটা দৃষ্টিপাত করেন না। আমাদের দেশে জয়দেবের মূর্ত্তি নাই, কিন্তু জয়দেবের মেলা আছে।

যদি মূর্ত্তি থাকিত তবে এতদিনে কোন্ জঙ্গলের মধ্যে অথবা কোন্ কালাপাহাড়ের হাতে তাহার কি গতি হইত বলা যায় না। বড় জোর ভগ্নাবস্থায় ম্যুজিয়মে নীরবে দাঁড়াইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে ভয়ঙ্কর বিবাদ বাধাইয়া দিত।

মূর্ত্তি মাঠের মধ্যে বা পথের প্রান্তে খাড়া হইয়া থাকে, পথিকের কৌতূহল-উদ্রেক যদি হয় ত সে ক্ষণকাল চাহিয়া দেখে, না হয় ত চলিয়া যায়। কলিকাতা সহরে যে মূর্ত্তিগুলা রহিয়াছে, সহরের অধিকাংশ লোকই তাহার ইতিহাসও জানে না, তাহার দিকে চাহিয়াও দেখে না।

একবার সভা ডাকিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিয়া বিলাতের শিল্পীকে দিয়া অনুরূপ হউক্ বা বিরূপ হউক্ একটা মূর্ত্তি কোনো জায়গায় দাঁড় করাইয়া দেওয়া গেল, তার পরে

ম্যুনিসিপালিটির জিম্মায় সেটা রহিল ; ইহা মৃত মহাত্মাকে অত্যন্ত সংক্ষেপে "থ্যাঙ্কস্" দিয়া বিদায় দেওয়ার মত কায়দা।

তাঁহার নামে একটা লাইব্রেরি বা একটা বিদ্যালয় গড়িয়া তুলিলেও কিছুদিন পরে নানাকারণে তাহা নষ্ট বা বিকৃত হইয়া যাইতে পারে।

কিন্তু মেলায় যে স্মৃতি প্রচারিত হয়, তাহা চিরদিন নবীন, চিরদিন সজীব, এক কাল হইতে অন্য কাল পর্য্যন্ত ধনী দরিদ্রে, পণ্ডিতে মূর্খে মিলিয়া তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যায়। তাহাকে কেহ ভাঙিতে পারে না—ভুলিতে পারে না। তাহার জন্য কাহাকেও চাঁদার খাতা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না, সে আপনাকে আপনি অতি সহজে রক্ষা করে।

দেশের শিক্ষিতসমাজ এই কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিবেন কি ? রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিকে বিদেশি উপায়ে খর্ব্ব না করিয়া ব্যর্থ না করিয়া কেবল নগরের কয়েকজন শিক্ষিত লোকের মধ্যে বদ্ধ না করিয়া দেশ-প্রচলিত সহজ উপায়ে সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করিবার চেষ্টা করিবেন কি ?

রবীন্দ্রনাথের পুস্তকের বিজ্ঞাপন—

নৈবেদ্য।

শিক্ষিত নরনারীর চির-আদরের, সুপ্রতিষ্ঠ সুকবি অধুনা বঙ্গ-সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ —সর্ব্বজনপ্রিয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন লিখিত—সুচারু কাব্যগ্রন্থ।

রাজ সংস্করণ—গ্লেজ তাসের ন্যায় কাগজে, মুক্তার ন্যায় অক্ষরে, রেশমের ন্যায় কাগজের আভরণে এই কাব্যগ্রন্থ মুদ্রিত ; ২০০ দুই শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। যিনি প্রেমিক, যিনি ভাবুক, যিনি সুধার রসাস্বাদে অভ্যস্ত, তিনিই এই সুন্দর, প্রেমময়—প্রাণময়—ভাবময়—সুধাময়—গ্রন্থখানি নিশ্চয়ই পাঠ করিবেন। সহৃদয়কে কাঁদাইতে, ভাবুককে ভাবসাগরে ভাসাইতে, তন্ময় করিয়া মরজগৎ হইতে চিরসুন্দর, অমররাজ্যে বিচরণ করাইতে এই গ্রন্থ কিরূপ উপযোগী হইয়াছে, কিরূপ পাঠ-মনোহর হইয়াছে, তাহা দেখিবার—পাঠ করিবার—শুনিবার—পক্ষে এবং উপহার প্রদানে—উপহার গ্রহণে—বিবাহ-বাসরে—ফুলশয্যায়—শুভকার্য্যে—সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে একমাত্র আদরণীয় ও গ্রহণীয় হইয়াছে। তাহা ভাবুকেরা বুঝিবেন, এই ফুলের হার গলায় পরিলে—সৌরভে দশদিক্ আমোদিত হইবে, পঙ্কিল দুর্গন্ধময় পল্লীও "নৈবেদ্যের" পবিত্র সৌরভে সুরভিত হইবে। জীবনের অপকার্য্যের অবসাদ যাইবে, জীবন্তে স্বর্গের সুষমা প্রাপ্ত হইবেন। কবির ভাব বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা অসম্ভব ; আমাদের সবিনয় অনুরোধ—একবার পাঠ করুন।

মূল্য ১৲ এক টাকা স্থলে ।৹ আট আনা মাত্র, ডাঃ মাঃ ৵৹ আনা।

চোখের বালি।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমৃতময়ী লেখনী-প্রসূত—বিশ্ব-বিমোহন নবীন সামাজিক উপন্যাস দ্বিতীয় সংস্করণ রাজসংস্করণ পুস্তক ছাপা হইতেছে, কাগজ মসৃণ—ছাপা অতি সুন্দর, সুবর্ণ-মণ্ডিত বিলাতি বাঁধাই দ্বিতীয় সংস্করণ ৩৩৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

যে গ্রন্থের নাম আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই কর্ণকুহরে প্রতিদিন প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যে উপন্যাস কবে প্রকাশিত হইবে বলিয়া প্রত্যেক বঙ্গবাসী একদিন উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, যে উপন্যাস—বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান মাসিক পত্র বঙ্গদর্শনে প্রতিমাসে এক এক অধ্যায় পাঠ করিয়া পর অধ্যায় পাঠের আশায় পর মাসের বঙ্গদর্শনের জন্য গ্রাহকগণ ডাকঘরে ছুটাছুটি করিতেন, যে উপন্যাস অধ্যায়ে অধ্যায়ে—অগ্নিময় সত্য, নিত্য সিদ্ধ—ঘটনাবলী পাঠকের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছে, যে উপন্যাস প্রচারিত হইয়াই বঙ্গীয় উপন্যাস-জগতে একদিনেই সগৌরবে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে, যে উপন্যাস প্রচারের অনতিবিলম্বেই নাট্যশালার অভিনয়ে লক্ষ লক্ষ দর্শককে মোহিত করিয়াছে, যে উপন্যাসে লোকচরিত্র—নারীচরিত্র—সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর করিয়া কবি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন সেই—সামাজিক শ্রেষ্ঠ উপন্যাস আজ গ্রাহকগণের দ্বারে উপস্থিত হইল।

অতি শীঘ্র এই উপন্যাস পাঠ করুন! নরনারী যুবক-যুবতী, বিবাহিত অবিবাহিত, যাঁহারা নূতন বিবাহ করিয়াছেন, যাঁহাদের বিবাহ পুরাতন হইয়াছে, যাঁহাদের প্রেমে ভাটা পড়িতেছে, যাঁহারা স্ত্রীকে মনের মত করিতে চাহেন, যাঁহারা সুখের দাম্পত্যপ্রেম চাহেন, তাঁহারা "চোখের বালি" নিশ্চয়ই পাঠ করিবেন।

রাজ সংস্করণ, বিলাতী বাঁধাই মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা মাত্র এক্ষণে ২৲ দুই টাকায় পাইবেন।

যাঁহারা একত্রে দুইখানি পুস্তক—"চোখের বালি" ও "নৈবেদ্য" লইবেন, তাহারা ২৲ দুই টাকায় পাইবেন ডাকমাশুল ৵০ তিন আনা।

বসুমতী পুস্তক বিভাগ—গ্রে ষ্ট্রীট কলিকাতা

শেষের বিজ্ঞাপনটির ভাষা যাহাই হউক, ইহাতে একটি কথা জানা যাইতেছে যে, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' মুদ্রিত হইয়া প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অভিনয়ও হইয়াছিল। নাট্যরূপ দেওয়ার কাজে রবীন্দ্রনাথের হাত ছিল কি না, এবং থাকিলে তাহা আজিও পাওয়া যায় কি না, এই সংবাদ কেহ দিতে পারিলে রবীন্দ্র-সাহিত্য-রসিকদের কাজে লাগিবে।

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল
—আনন্দঅমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।—
ক্ষুদ্র যত বিরুদ্ধ প্রমাণে
মহানেরে খর্ব করা সহজ পটুতা।
অন্তহীন দেশ কালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমা
যে দেখে অখণ্ডরূপে
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক।

—রবীন্দ্রনাথ

ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ

'গোরা' উপন্যাসে সুচরিতা এক স্থানে বলিয়াছে,—কত লোক অনায়াসে দুই বেলা গোরার দেখা পাইতেছে, অথচ গোরার দেখা পাওয়ার মূল্য তাহারা কিছুই বুঝে না। ঢাকায় আমরা যে কয়জন রবীন্দ্রভক্ত ছিলাম, শান্তিনিকেতনের দিকে, জোড়াসাঁকোর দিকে, শিলাইদহের দিকে চাহিয়া আমাদের কেবলই দীর্ঘনিশ্বাস পড়িত, আর সুচরিতার ধারায় কত কি ভাবিতাম।

শৈশবে দশ এগারো বছর বয়সে সাহিত্য-চেতনা উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই হাতের কাছে পাইলাম 'ভারতী',—আমার খুড়া উহার গ্রাহক ছিলেন। উহাতে তখন মাসে মাসে "চিরকুমার সভা" (প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ) বাহির হইতেছিল। দশ এগারো বছরের বালকের চিরকুমার সভার অপূর্ব্ব শ্লেষ ও হাস্যরস, উহাতে উদ্ধৃত উদ্ভট শ্লোকগুলির মূল ও অনুবাদের অপূর্ব্ব কাব্যরস বুঝিবার কথা নহে। কিন্তু কিছু বুঝিতাম নিশ্চয়ই,—বালক-মনকে অপূর্ব্ব আনন্দরস নিশ্চয়ই অভিষিক্ত করিত। চিরকুমার সভা কিরূপ তন্ময় হইয়া পড়িতাম, আমাদের বাসার চাকর শ্যামাচরণ তাহা একদিন "কায়মনোবাক্যে" বেশ বুঝিয়াছিল। বাগানে বসিয়া মগ্নভাবে পাঠে নিবিষ্ট বালকের পিছন হইতে মাথার উপর দিয়া ঝুঁকিয়া সে হঠাৎ 'ভারতী'খানা কাড়িয়া লইয়াছিল। তাহার দুর্ভাগ্য-বশত নিকটেই একখণ্ড বাঁশ পড়িয়াছিল। রসভঙ্গ-ক্ষুব্ধ বালকের লগুড়াঘাতে "মাইরা ফালাইল রে" বলিয়া চীৎকার করিয়া তাহাকে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

এই সময়ই অশোভন রকমের বৃহৎ আকারে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-

গ্রন্থাবলীর এক সংস্করণ বাহির হয়। ইহাই টাকি সংস্করণ নামে পরিচিত। খুড়া মহাশয় এই সংস্করণও কিনিয়াছিলেন, কিন্তু আকারের প্রকাণ্ডতায়ই হউক অথবা কবিতার দুর্ব্বোধ্যতায়ই হউক, উহা বালককে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। আরও চারি পাঁচ বৎসর পরে 'হিতবাদী' যখন রবীন্দ্রনাথের গল্পগ্রন্থাবলী উপহার প্রদান করিল, তখন স্কুল পলাইয়া অভিভাবকের চক্ষু এড়াইয়া পাঠ্যপুস্তককে ফাঁকি দিয়া অহোরাত্র উহাই একমাত্র পাঠ্য হইয়া উঠিল। তখন পর্য্যন্তও রবীন্দ্রকাব্যের সহিত আমি একেবারে অপরিচিত।* মাইকেল, হেম, নবীন পড়িয়াছিলাম কিছু কিছু,—কিন্তু কাব্যপাঠে যে মানুষের সর্ব্ব সত্তা সাড়া দেয়, হৃদয়-বীণার সুপ্ত সহস্র তার একত্রে ঝঙ্কার দিয়া উঠে, সেই অভিজ্ঞতা কোন দিনই হয় নাই। একমাত্র কামিনী সেনের 'আলো ও ছায়া' ইহার ব্যতিক্রম ছিল। ঝরনার জলের মত উহার প্রাঞ্জল ভাষায়, নির্ঝরেরই মত উহার রহস্যময় কলগুঞ্জনে এক অননুভূতপূর্ব্ব স্বাদ অনুভব করিতাম,—দেখিতে দেখিতে উহার অনেকগুলি কবিতা আগাগোড়া কণ্ঠস্থ হইয়া গেল।

তারপরে এক শুভ দিনে একখানা পাঠ্যপুস্তকের কবিতাচয়নের মধ্যে পড়িলাম—

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে!

---

* শুক্লা, মায়াচিত্র, আকাশপ্রদীপ ইত্যাদি কাব্যের কবি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন রায় স্কুলে আমার সহপাঠী ছিলেন, তিনি শৈশবাবধি রবীন্দ্র-কাব্যে মশগুল ছিলেন। অস্পষ্টভাবে মনে পড়িতেছে, এই সময় (১৯০৩-৪ খ্রীঃ) তাঁহাকে "কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে" আওড়াইতে শুনিয়াছি।

অনিবার্য্য গতিতে সমস্ত সত্তা ভরিয়া এই অনুভূতি জাগিতে লাগিল—এ পর্য্যন্ত যত কবিতা পাঠ করিয়াছি, ইহা তাহাদের শ্রেণীর নহে। ইহাতে এমন কিছু পাইতেছি, এমন বৃহৎ প্রতিভার দুর্নিবার প্লাবনের ইহা এক তরঙ্গ, প্রহরোদিত সূর্য্যের কিরণের মত ইহাতে এত স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্য বর্ত্তমান,—যে কবিতাটি পুনঃ পুনঃ পড়িয়া আমি স্তব্ধ অভিভূত হইয়া বসিয়া রহিলাম।

মফস্বলে পুস্তক সুলভ নহে, বিশেষত কবিতার পুস্তক। মফস্বলের স্কুলের পড়া শেষ করিয়া যখন ঢাকা কলেজে পড়িতে আসিলাম তখন এমন এক মেসে আমার বাসা জুটিল, যাহার ত্রিসীমানায়ও কবিতা দেবী আগমন করিতেন না। আমার কবিতার খাতাখানি মেসের সমস্ত মেম্বারদের রসিকতা প্রকাশের স্থল ছিল। স্বদেশী আন্দোলনে ঢাকা শহর তখন (১৯০৫-১৯০৬) টলটলায়মান—আমাদের মেসের বীরবরগণের যত বীরত্বপূর্ণ বাণী ও উপদেশ প্রকাশের স্থান ছিল আমার গোপনচারী কবিতার খাতাখানি। মেয়েলী কবিতার লেখক বলিয়া রবীন্দ্রের কবিতা তখন বিশেষ আদর লাভ করিত না,—"বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে"র তখন বেজায় সমাদর। দলে মিশিয়া আমিও রবীন্দ্র-নিন্দক সম্প্রদায়েরই একজন হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। আমরা অনেকেই তখন রবীন্দ্র-কাব্যের প্রায় কিছুই পাঠ করি নাই; তথাপি রবীন্দ্র-কাব্যের নিন্দা করা তখন এক শ্রেণীর লোকের একটা ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আই. এ. পাস করিয়া যখন বি. এ. ক্লাসে পড়ি, তখন (১৯০৭-১৯০৮) রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি' পড়িয়াছিলাম,—আমাদের পূজ্যপাদ ইতিহাসের অধ্যাপক ইতিহাস পড়াইবার ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্র-সাহিত্য লইয়া অনেক আলোচনা করিতেন। তাঁহার আলোচনায়

আমার দলে-পড়িয়া-শেখা অহেতুক রবীন্দ্রবিদ্বেষ ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইতে লাগিল। মনস্বী অধ্যাপকের সুস্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত সুদৃঢ় মতগুলি আমাদের হৃদয়ে আশ্চর্য্য সহানুভূতি জাগাইত। শুধু ক্লাসেই নহে, আমরা কয়েকজন অধ্যাপক মহাশয়ের সাহিত্যালাপের আকর্ষণে তাঁহার বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইতাম। অধ্যাপক মহাশয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই অজাতশ্মশ্রু বালকগণের সঙ্গে একাত্ম হইয়া সাহিত্যালাপে কাটাইয়া দিতেন। নবমবর্ষীয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা কুসুমের ঘন ঘন ডাক পড়িত—কলিকা বদলাইয়া দিয়া যাইতে। সুরভি তামাকের ধোঁয়ার কুণ্ডলী রচনার সহিত ভাবরাজ্যে অনন্ত তরঙ্গ উঠিতে থাকিত। স্পষ্ট মনে আছে, বিনোদিনীর মত দুশ্চরিত্রার চিত্র অঙ্কিত করিয়া রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ-সাহিত্য কলুষিত করিতেছেন—রবীন্দ্রবিদ্বেষী একটি ছাত্রের এই ধরনের কথা শুনিয়া পুরুষ-সিংহ হুঁকার নল এবং তাকিয়া ছাড়িয়া সোজা উঠিয়া বসিলেন এবং খাস বাখরগঞ্জী ভাষায় চাপা গর্জ্জনে বলিলেন, "বোকার মত কথা কইও না। বিনোদিনীর মত মাইয়া যদি পাঁচ যাগায় ঘুইরা আইসাও আমারে ভালবাইস্যা আমার ঘর করতে রাজি হয়, আমি তারে মাথায় তুইলা রাখুম, আমি সেইটা আমার পরম সৌভাগ্য বৈলা মনে করুম, বিয়া কইরা তারে ধর্ম্মপত্নী বৈলা গ্রহণ করুম।" "সবার উপরে মানুষ সত্য"—মন্ত্রের এমন সুস্পষ্ট নির্ভীক উচ্চারণ কমই শুনিবার সুযোগ জীবনে ঘটিয়াছে।

কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যে পরিপূর্ণ দীক্ষা লাভ করিয়াছিলাম বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিনোদমোহন চক্রবর্ত্তীর নিকট। এই কাব্যপ্রাণ সুকুমারহৃদয় সাহিত্যরসিক বর্ত্তমানে ডেপুটিত্ব করিতেছেন। আদালতের নিশ্বাস-রোধকারী জঞ্জালের চাপে কাব্যরস শুকাইয়া যায়, কিন্তু বিনোদবাবুর কাব্যানুভূতির প্রাণশক্তি অসাধারণ, অদ্যাপি তাহা সমান সতেজ আছে।

বাংলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রমুখ হাকিমগণ সেই বঙ্কিমের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা ভাষাকে অনেক সমৃদ্ধি দান করিয়াছেন। অদ্যাপি বাংলা দেশের আই. সি. এস. কয়েকজন সেই ধারা বজায় রাখিয়াছেন। কিন্তু বন্ধুবর বিনোদমোহনের মত সাহিত্যরসিকের প্রতিভা যে চাকরির চাপে বন্ধ্যা হইয়া গেল, ইহাতে মনে হয়, এই চাপ ক্রমশই প্রতিভা-বিধ্বংসী হইয়া উঠিতেছে। কলেজ-হস্টেলে বিনোদবাবু আর আমি এক ঘরে থাকিতাম। পড়াশুনা কতদূর করিতাম বলিতে পারি না, কিন্তু কাব্যচর্চ্চা খরবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিনোদ-বাবু অপরিসীম দরদের সহিত 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'ক্ষণিকা' ইত্যাদির সহিত আমার পরিচয় সাধন করিলেন, দুই বন্ধু সারাদিন বিভোর হইয়া কাব্যরসপানে নিমগ্ন থাকিতাম। এই সময় দেশী হলুদে কাগজের মলাট লইয়া 'খেয়া' বাহির হইল। ঢাকার বাজারে আসিবামাত্র বিনোদবাবু একখণ্ড 'খেয়া' কিনিয়া আনিলেন— পড়িতে পড়িতে 'খেয়া' আদ্যন্ত মুখস্থ হইয়া গেল।

এই সময় সাহিত্যরসিক আমাদের কয়েকজনের উদ্যোগে হস্টেল হইতে হাতের লেখা মাসিক কাগজ 'উদ্যান' বাহির হয়। বেশ মোটা বাঁধা একখানা খাতায় যে যাঁহার রচনা লিখিয়া দিতেন, খাতা প্রায় ভরিলে উহা হস্টেলের সাধারণ পাঠগৃহের টেবিলে স্থান পাইত। এই হাতের লেখা 'উদ্যান' কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল। ইহার কিছু পরে বি. এ. পাস করিয়া যখন আমরা এম. এ. ক্লাসে পড়ি, তখন আমাদের কয়েকজনের উদ্যোগে 'উদ্যান' মাসে মাসে মুদ্রিত হইয়া বাহির হইতে লাগিল। এই মুদ্রিত উদ্যানে "বাঙ্গালা কাব্যের ক্রমবিকাশ" নামে আমার এক ধারাবাহিক প্রবন্ধ বাহির হয়। উহারই এক কিস্তিতে নবীন সেনের কাব্য-সমালোচনা ছিল, এবং হেমনবীনপ্রীতিযুগে

রবীন্দ্র-বিদ্বেষের প্রতিক্রিয়ার ফলে উহাতে নবীন সেনের কাব্যের উপর তীব্র আক্রমণ ছিল। এই সংখ্যা 'উত্থান' বাহির করিয়া দিয়াই কয়েক-দিনের জন্য আমাকে পল্লীভবনে চলিয়া যাইতে হয়। ফিরিয়া আসিয়া শুনি, আমার প্রবন্ধ উপলক্ষ্য করিয়া নবীন-ভক্তগণের সহিত রবীন্দ্র-ভক্তগণের আস্তিন গুটাইয়া রীতিমত হাতাহাতি হইয়া গিয়াছে।

'উত্থান' সাত আট মাস চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উদ্যোগে ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হয় এবং উহার মাসিক মুখপত্র 'প্রতিভা' নাম ধারণ করিয়া বাহির হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র মহাশয়ের উদ্যোগে একই সময়ে অর্দ্ধ-ইংরেজী অর্দ্ধ-বাংলা মাসিকপত্র 'ঢাকা রিভিউ'ও বাহির হইতে থাকে। ঢাকায় সাহিত্যচর্চ্চায় যেন বন্যা আসিয়া গেল। দ্বিতীয় বর্ষের (১৩১৯) ভাদ্র সংখ্যা 'প্রতিভা'য় আমার "রবীন্দ্রনাথের কাব্যে মৃত্যুকল্পনা" নামক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বাহির হয়। চারুবাবুর 'রবিরশ্মি'র দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা প্রবন্ধের এক বিস্তৃত সূচিকা আছে, উহাতে 'ঢাকা রিভিউ' বা 'প্রতিভা'তে প্রকাশিত আলোচনাগুলি বাদ পড়িয়াছে,—আমার প্রবন্ধটিরও উল্লেখ নাই, বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথের "মরণ" সম্বন্ধীয় কবিতাগুলির অসাধারণত্ব তরুণ লেখকেরও দৃষ্টি যে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাই জানাইবার জন্য এই প্রবন্ধটির উল্লেখ করিলাম। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মোহিত সেন-সম্পাদিত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর সম্পূর্ণ সেট টিউশনির কষ্টার্জ্জিত পয়সা খরচ করিয়া কিনিয়া ফেলিয়াছিলাম, কাজেই গ্রন্থের অভাব আর ছিল না।

দুই বৎসর পরের কথা। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমা স্কুলের হেডমাস্টারি গ্রহণ করিয়া তথায়

গিয়াছি। দেখিলাম, মহকুমা শহরটিতে সাহিত্যচর্চ্চার বালাই বিশেষ নাই। স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভায় আমার উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' অভিনীত হইল। নাট্যকার শ্রীমান মন্মথ রায় তখন সেই স্কুলের সপ্তম (প্রাচীন মতে চতুর্থ) শ্রেণীর ছাত্র। এই প্রিয়দর্শন বালকটিকে অমলের ভূমিকায় অভিনয় করিতে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলাম। অমলের পার্ট সে চমৎকার করিল, শহরে বেশ একটু সাড়া পড়িল। আমি এখন মনে মনে এই বলিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করি যে, এই অভিনয়ের সাহিত্যরস-সংক্রমণই হয়তো ভবিষ্যতে শ্রীমান মন্মথ রায়ের নাট্যপ্রতিভা বিকাশের কারণ হইয়াছিল।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে শিবচতুর্দ্দশীর দিন ও তাহার পরদিন পাবনায় উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের এক অধিবেশন হয়। নিমন্ত্রিত হইয়া এবং প্রবন্ধ পাঠের জন্য আহূত হইয়া আমি এই অধিবেশনে যোগদান করি। আমার লিখিত এই সম্মিলনের বিবরণ ১৩২০ সনের চৈত্র সংখ্যা 'মানসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সম্মিলনে আমি প্রথম রবীন্দ্রনাথকে নিজ চোখে দেখি। সেই দেখার স্মৃতি অদ্যাপি মনের এক কোণকে আনন্দরসসিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই অধিবেশনের কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন এবং কোলাহল সহ্য করিতে না পারিয়া শিলাইদহে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ কিছু বলেন। পরের দিন রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সম্মিলনের সার্থকতা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাও করেন। এই উভয় ব্যাপারের বর্ণনাই আমার সেই আটাশ বছরের পুরাতন লেখা হইতে উদ্ধৃত

করিতেছি। এই বিবরণ সম্ভবত অন্য কোথাও আর প্রাপ্তব্য নহে।* এই সম্মিলনে সভাপতি ছিলেন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়।

কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রশান্ত গম্ভীর আননে সভাপতির দক্ষিণ পার্শ্বে স্তব্ধ হইয়া নতনেত্রে বসিয়া ছিলেন। শুনিলাম এই শান্তিপ্রিয় নিরীহ ভদ্রলোককে তাঁহার শিলাইদহের নির্জ্জনতা হইতে এক রকম জোর করিয়া গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইয়াছে। সহস্র ব্যগ্র কৌতূহলী নেত্রের দৃষ্টির সম্মুখে তিনি যেন দেহে মনে একান্ত সঙ্কুচিত, ক্লিষ্ট হইয়া বসিয়া ছিলেন। সম্মিলন এইবার তাঁহাকে লইয়া পড়িল। সভাপতির অনুমত্যনুসারে "স্বরাজ"-সম্পাদক (শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায়) মহাশয় রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় তাহার সমর্থন করিলেন। ছেলেবেলা হইতে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী পাঠ করিয়া এবং নানা মাসিকপত্রে তাঁহার ছবি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথকে এক রকম ঘরের লোক বলিয়াই জানিতাম। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথকে কখনও চোখে দেখি নাই। সভায় প্রবেশ করিয়া প্রথমেই এই মধুর গম্ভীরাকৃতি আত্মসমাহিত মনস্বীর দিকে চক্ষু পড়িয়াছিল। কিন্তু নিতান্ত নিকট আত্মীয়কেও যেমন বিদেশে অপরিচিত জনমণ্ডলীর মধ্যে দেখিয়া সহসা ঠিক চেনা যায় না, অথচ এক মধুর চিরপরিচয়রসে হৃদয় গোপনে গোপনে ভরিয়া উঠিতে থাকে,—রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়াও আমার তেমনি হইয়াছিল। তথাপি ইনিই যে আমাদের রবীন্দ্রনাথ, তাহার ঠিক উপলব্ধি হয় নাই। পার্শ্বস্থ বন্ধুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিতে পারিলাম যে, ইনিই আমাদের চির-পরিচিত কবি, তখন এক নূতন আনন্দে এই কীর্ত্তি-গরীয়ান্ ভারতের গৌরবটির দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাঁহার ক্লিষ্ট মুখচ্ছবির দিকে চাহিয়া আমার যেন

---

* উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম (পাবনা) অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার সারমর্ম্ম দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতার বিবরণ অযথাযথ এবং অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়।

কেমন এক বেদনা ও সহানুভূতিতে হৃদয় ভরিয়া যাইতে লাগিল। নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রস্তাবের উত্তরে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতেও তাঁহার এই কোলাহল-পীড়িত আর্ত্তকণ্ঠই শুনিতে পাইলাম।

তিনি যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে, একটা বিরাট দুঃখের অংশ আত্মীয়স্বজনগণকে বহন করিতে দিয়া যেমন শান্তি পাওয়া যায়, তেমন তাঁহার এই বিদেশাগত সম্মানের অসহ্য গুরু ভার তাঁহার দেশবাসিগণ যে তাঁহাদের নিজেদের বলিয়া ভাগ করিয়া লইয়া আনন্দ পাইতেছেন, [তাহাতে তিনি শান্তি বোধ করিতেছেন]। তিনি উপলক্ষ্য মাত্র হইয়া সেই গৌরব মাথা পাতিয়া লইতেছেন। কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার চিরপ্রিয় নির্জ্জনতা হইতে টানিয়া আনিয়া সহস্র লোকলোচন সমক্ষে দাঁড় করাইয়া দেশবাসিগণ যে উৎসবের কোলাহল বাধাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে তিনি সঙ্কোচ অনুভব করিতেছেন। বিলাতে কুকুরের লেজে টিন বাঁধিয়া তাহাকে রাস্তায় ছাড়িয়া দিয়া, তাহার চারিদিকে হাততালি দিয়া হৈ হৈ করিয়া বালকগণ যেমন নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগ করে, এই নোবেল প্রাইজ পাওয়াতে তাঁহার দশাও কতকটা তেমনি হইয়াছে। [চলিতে ফিরিতেই টিনটা ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া উঠে]। এখন ইহা হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দিলেই তিনি দেশবাসীর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

পরের দিনের সভায় ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সাহিত্য-সম্মিলনের সার্থকতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিতে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করিলেন। এই অনুরোধ পালন করিতে উঠিয়া সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ যেন সুধাবৃষ্টি করিয়া গেলেন। আশা করি, নিম্নের সংক্ষিপ্ত-সারেও পাঠকগণ তাহার আস্বাদ পাইবেন। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন—

নদীর প্রবাহ যেমন কাহারও উপদেশের অপেক্ষা না রাখিয়াই নূতন নূতন প্রদেশে আপনার পথ কাটিয়া আপনার বেগে প্রবাহিত হইয়া যায়, সাহিত্যের গতিও ঠিক তেমনি। ভগীরথ শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, ভাগীরথী আপনার গতিতে আপনি প্রবাহিত হইবে। এই বিষয়ে কর্ত্তব্য কার্য্য

একমাত্র এই যে ভগীরথের শঙ্খ যেন কখনও না থামে। মৃত্তিকার অভ্যন্তর-বাহিনী সলিলধারা যেমন আপনা হইতেই বিশাল মরুভূমির স্থানে স্থানে উৎস-রূপে ফুটিয়া উঠিয়া বিচিত্র মরূদ্যানের সৃষ্টি করে, আমাদের সাহিত্য-সম্মিলন-গুলিও ঠিক তেমনি। দেশের অন্তস্তলে চিরপ্রবহমানা সাহিত্যরসধারার এগুলি বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সাহিত্য-সম্মিলনগুলি যেন মেঘ; দেশে দেশে ঘুরিয়া বারিধারা বর্ষণ করিয়া বেড়ায়, দেশ ফুলে ফলে হাসিয়া উঠে। এবার তাহা পাবনায় বর্ষিল, ফুল ফল যদি না হয়, তবে পাবনারই মরুভূমিত্ব প্রমাণিত হইবে। বর্ষা যেমন বৎসর বৎসর আসিয়া দেশের মাটিকে সজীব উর্ব্বর করিয়া দিয়া যায়, সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যও তেমনি। আমরা অপথে-বিপথে অনেক ঘুরিয়াছি,—অনেক অলিগলি ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি যে কতদূর যাইয়া আর যাওয়া যায় না, সম্মুখে এক বিভীষিকাময় অন্ধকার দেখা যায়। কিন্তু এই সাহিত্যের সদর রাস্তা উন্মুক্ত,—সম্মুখে আশার ক্ষেত্র দেখা যাইতেছে। আমাদের অবহেলায়, আমাদের ক্ষুদ্র হিংসা দ্বেষে তাহা যদি রুদ্ধ হইয়া যায়, তবে আমাদের আর কোন আশা নাই।

ইহার চারি বৎসর পরের, অর্থাৎ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ঢাকায় তখন 'ঢাকা রিভিউ' বা ঢাকা-সাহিত্য-সমাজের দল এবং 'প্রতিভা' বা ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের দল—এই দুইটি সাহিত্যিক দল গড়িয়া উঠিয়াছে, সাহিত্যক্ষেত্রে দুই দলে বেশ রেষারেষি। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে আমি ঢাকা মিউজিয়মের অধ্যক্ষরূপে ঢাকায় স্থায়ীভাবে আগমন করি। আমি ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের কর্ম্মী ছিলাম। 'ঢাকা রিভিউ'র পরিচালক ছিলেন আমার শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র। 'ঢাকা রিভিউ'তেও আমার বাংলা ইংরেজী প্রবন্ধ অনেক মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের এক অধিবেশন ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় আহূত হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তখন ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের

সভাপতি ও পৃষ্ঠপোষক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ঢাকা-অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচন লইয়া সাহিত্য-সমাজে ও সাহিত্য-পরিষদে তুমুল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। পরিষৎ দাশ সাহেবকে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি করিতে চাহে, সমাজ চাহে ঢাকার বিখ্যাত উকিল আনন্দ রায়কে। এই দ্বন্দ্বের ফলে অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য-সংখ্যা হুহু করিয়া বাড়িয়া চলিল। অর্থাভাবে এই সম্মিলনকে আর কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। যাহা হউক, বিষম ভোটযুদ্ধে দাশ সাহেবই জয়লাভ করিলেন। আমি অভ্যর্থনা-সমিতির অন্যতম সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলাম। সম্মিলনের সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথকে পাইতে আমরা আগ্রহবান হইলাম এবং কলিকাতায় গিয়া রবীন্দ্রনাথকে সম্মত করাইবার ভার আমার উপর প্রদত্ত হইল।

এই আনন্দময় ভার গ্রহণ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম। কলিকাতা পৌঁছিয়া বিকালবেলার দিকে 'প্রবাসী' অফিসে গিয়া বন্ধুবর ৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। চারুবাবু আমাকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে লইয়া গেলেন। সেই সন্ধ্যায় "বিচিত্রা" নাম্নী সাহিত্য-সভার এক অধিবেশন ছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। আমি আর চারুবাবু সভাকক্ষের বারান্দায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কতক্ষণ পরে ছন্নছাড়া উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র মোটা চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, চারুবাবু আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। অল্প পরে আরও কয়েকজন সাহিত্যিক আগমন করিলেন, বিস্তর মহিলা আসিয়া সভার একার্দ্ধ ভরিয়া ফেলিলেন। ফরাশ পাতা, সকলে তাহার উপরই বসিতেছিলেন।

মেয়েরা এক ধারে, পুরুষেরা অপর ধারে। এইবার রবীন্দ্রনাথ সভাস্থলে আগমন করিলেন তাঁহার সেই দীর্ঘ কালো পোশাক পরিয়া। শরৎবাবু তাঁহার কাছ ঘেঁষিয়া বসিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে শরৎবাবু পরবর্ত্তী অধিবেশনে স্বরচিত নূতন গল্প পড়িয়া শুনাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাহার পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। আমরা বারান্দায় বসিয়াই প্রবন্ধ শুনিতে লাগিলাম।

সে তো প্রবন্ধ নয়,—যেন বিশ্বামিত্রের নূতন সৃষ্টি! এই ছন্দ-সম্রাটের লেখনীমুখে বাণী যেন নূতন নূতন ছন্দ সৃষ্টি করিয়া নূপুর-শিঞ্জিত পদে কক্ষময় চপল চরণে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। চৌদ্দ অক্ষরে যে কত রকম ছন্দ হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তে কবি যে উদাহরণগুলি দিয়াছিলেন, তাহার একটি চমৎকার নমুনা অদ্যাপি মনে আছে—

নয়নের সলিলে যে কথাটি বলিলে,
রবে তাহা স্মরণে জীবনে ও মরণে।

সভাভঙ্গ হইলে এবং সভাস্থল জনবিরল হইলে পর চারুবাবু আমাকে কবির নিকট লইয়া গেলেন এবং পরিচয় করাইয়া আমার উদ্দেশ্য নিবেদন করিলেন। কবির অপরিচিতের নিকট সঙ্কোচ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি যেন চোখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া কথা কহিতে পারিতেছিলেন না। এই দিনের কিছুকাল আগে তিনি বড়লাটকে সেই বিখ্যাত পত্র লিখিয়া জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করিয়া নাইটত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। চারুবাবু নানারূপ জনরব কবিকে শুনাইয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ভারত-সরকার কবিকে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন। কবি মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "সর্ব্বদা তৈয়ের হয়েই আছি।" ক্লান্ত কবিকে আর অধিক বিরক্ত

করা সঙ্গত হইবে না বিবেচনা করিয়া আমি সানুনয়ে তাঁহাকে ঢাকা-বাসীর আগ্রহ ও অনুরোধ জানাইলাম। কিছুতেই তাঁহাকে রাজি করাইতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিলাম।

ইহার পর আরও আট বছর চলিয়া গেল। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ। একদিন খবর পাইলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় আসিতেছেন। বর্ত্তমান ভাইস্‌চ্যান্সেলর পূর্ব্বতন ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, তদানীন্তন ঢাকা ইণ্টার্‌মিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার চন্দ প্রভৃতি মহোদয়গণ এই ব্যাপারে অগ্রণী। রবিবার, ৩১এ জানুয়ারি ১৯২৬, ১৭ই মাঘ ১৩৩২, মঘানক্ষত্রে জগন্নাথ কলেজ-গৃহে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিতে এক সভা আহূত হইল। অপূর্ব্ব চন্দ প্রমুখ দলের অভিলাষ, রবীন্দ্রনাথ আগে শহরে উঠিবেন, তথায় তাঁহার অভ্যর্থনাদি হইবে। পরে তিনি রমনায় বিশ্ববিদ্যালয়-অঞ্চলে যাইবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করিবেন। ডক্টর মজুমদার তাহাতে রাজি নহেন। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত তুমুল তর্কবিতর্ক ও কোলাহল হইল, কোন মীমাংসাই হইল না। দুই পক্ষেরই যেন রীতিমত জিদ চড়িয়া গেল, কেহই নিজের কোট ছাড়িতে সম্মত নহেন। পরে একটা আপোষ বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কিন্তু একদিন পরেই আমাকে ঢাকা ছাড়িয়া আমার এক জ্যেঠতুতো ভ্রাতার বিবাহে যোগ দিতে ফরিদপুর যাইতে হয়। তাই আমার ডায়েরিতে এই আপোষের কথার কোন উল্লেখ নাই।

৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৬, রবিবার, ২৪এ মাঘ ১৩৩২, রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় আগমন করিলেন। অপরাহ্নে নর্থব্রুক হল বা লালকুঠিতে ঢাকা মিউনিসিপালিটি কবিকে অভিনন্দন করিলেন। পরে বুড়ীগঙ্গা-

তীরে করোনেশন পার্কে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিরাট জনসভার অধিবেশন হইল। পার্কের এক ধার হইতে অপর ধার পর্য্যন্ত এবং পার্ক ও নদীর তীরের মধ্যস্থ বাক্‌ল্যাণ্ড বাঁধ নামক রাস্তায় লোক আর ধরে না। জনসাধারণের পক্ষ হইতে একটি, করদাতা-সমিতির পক্ষ হইতে একটি এবং হিন্দুমোস্লেম সেবাশ্রমের পক্ষ হইতে একটি অভিনন্দন-পত্র পঠিত হইল। কবি উত্তর দিতে উঠিবামাত্র সেই বিশাল জন-সমুদ্র জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। মুখের উপর সান্ধ্য সূর্য্যের রক্তিম রশ্মি আসিয়া পড়িয়া কাব্যলক্ষ্মীর এই বরপুত্রকে যেন অপার্থিব গন্ধর্ব্বলোকের অপরূপতায় মণ্ডিত করিয়া তুলিল। তিনি বলিতে আরম্ভ করিবামাত্র সেই বিশাল জনসঙ্ঘ একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। কবি বলিলেন—

আমি আর একবার ঢাকায় এসেছিলাম, রাজনৈতিক সভা-সমিতিগুলির কার্য্যাবলী যাতে বাংলা ভাষায় অনুষ্ঠিত হয় তার ওকালতি করতে। আমার সেই ওকালতি সফল হয়েছিল। আমার দিন ফুরিয়ে এসেচে। আমার কাজকর্ম্মের অবসানকাল উপস্থিত। আপনাদের সকলের সঙ্গে সাহিত্যের যোগে আমার নিগূঢ় পরিচয় স্থাপিত হয়েচে। আজ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় গ্রহণ করবার জন্য আমি আপনাদের দ্বারে এসেচি। আমি বঙ্গলক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে অনেক অর্ঘ্য নিবেদন করেচি, অনেক পুষ্প সাজিয়েচি। তার দুই একটি যদি আপনারা সঞ্চয় করে রাখবার মত মনে করেন, তবেই আমার জন্ম সার্থক। আজ বাংলা দেশের তীর্থে তীর্থে জনগণের মধ্যে সঞ্চিত বঙ্গলক্ষ্মীর চরণরেণু সংগ্রহ করতে আমি বেরিয়েচি। আকাশে ঐ আমার মিতা রবি অস্তাচলের দিকে চলেচে, সে আমায় ডাকচে তার সঙ্গে যেতে। আজ এই সুন্দর সূর্য্যাস্তের সম্মুখে, এই কুলুকুলুনাদিনী নদীর তীরে আপনাদের রবি-কবি আপনাদের কাছে বিদায় নিতে এসেচে।

কবির এই বিদায়-গ্রহণের আকুল করুণ কণ্ঠ সভাস্থলে যেন একটা অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসের বন্যা বহাইয়া দিল। সেই বিশাল জনসঙ্ঘ স্তব্ধ অশ্রুপূর্ণ

নেত্রে সেই বিদায়বাণী শুনিতে লাগিল, সকলের চোখেই জলের আভাস। আমার পার্শ্বে প্রবীণ উকিল বন্ধুবর অমূল্য রায় ছিলেন। চোখ হইতে অশ্রুধারার রেখা হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া একটু লজ্জিত হাস্যে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, লোকটার কাণ্ড দেখেছেন? আমার মত কালাপাহাড়ের চোখেও জল এনে ছেড়ে দিলে!

রবীন্দ্রনাথের বসিবার মঞ্চখানি আম্রপল্লব পতাকা ইত্যাদি দিয়া সজ্জিত ছিল। জনগণের অনুরোধে উহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কবিকে যাহাতে সমস্ত দিক হইতে পূর্ণভাবে দেখা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা হইল: কবি পাথরের মূর্ত্তির মত কতক্ষণ যেন ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া রহিলেন। নির্ব্বাক জনসমুদ্র তাহাদের প্রিয় কবিকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইল। তারপরে ধীরে ধীরে তিনি মঞ্চ হইতে নামিয়া গেলেন।

২৭এ মাঘ বুধবার কার্জন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসঙ্ঘ হইতে কবিকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়। দুপুর আড়াইটায় কার্য্যারম্ভ। কবি কিছু আগেই সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাইস্‌চ্যান্সেলর লেঙ্গ্‌লী সাহেবের কবিকে সর্ব্বাগ্রে অভ্যর্থনা করিবার কথা, অথচ তখন পর্য্যন্ত তিনি আসিয়া পৌঁছান নাই। খবর পাইয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া তিনি মঞ্চে দাঁড়াইলেন, কর্ত্তব্যের ত্রুটিজ্ঞান মার্জ্জিতরুচি সুশিক্ষিত ইংরেজ-তনয়কে এমন অভিভূত করিয়া ফেলিল যে, কিছু বলিতে আরম্ভ করিয়া তিনি হতভম্ব হইয়া থামিয়া গেলেন এবং সম্বিৎহারার মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, ফিট হইয়া পড়েন আর কি! মিসেস লেঙ্গ্‌লী বুদ্ধি করিয়া মঞ্চের নীচ হইতে আগাইয়া কি একটা কথা বলিয়া দিতেই তিনি সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন, এবং দুই কথায় বক্তব্য শেষ করিয়া ডক্টর মজুমদারকে অভিনন্দনপত্র পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

অভিনন্দনপত্রের উত্তরে কবি অনেক কথাই বলিয়াছিলেন, আমার ডায়েরিতে শুধু স্থূচীরূপে মোট কথাগুলির উল্লেখ আছে। তাহা হইতে সেই আশ্চর্য্য বক্তৃতার সারমর্ম্ম উদ্ধার করিয়া দেওয়াও কঠিন। শুধু মোট কথাগুলি যেমন টুকিয়া রাখিয়াছিলাম, তেমনই উদ্ধৃত করিলাম।—

সভা-সমিতিকে তিনি চিরদিন ভয় করেন। সভামঞ্চে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া নীচের অসহায় শ্রোতাগণের মস্তকে শিলাবৃষ্টির মত বক্তৃতাবৃষ্টি করা নিতান্ত নিষ্ঠুরতা। ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের মধ্যে ছাত্রগণকে পাইতে ইচ্ছা। নিজের ছাত্র-জীবনের ইতিহাস। দুই বার প্রাইজ পাওয়ার ইতিহাস। তাঁহার বয়স সম্বন্ধে লোকের ভুল বিশ্বাস। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গনিয়া বয়সের হিসাব করিতে তাঁহারা বেজায় ভুল করেন। কারণ তিনি সকল যুগের ছাত্রদের সমবয়সী। ছাত্রদের অন্তরঙ্গরূপে তিনি ছাত্রদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বেশ পরিচিত। তাঁহার নিজের যুগের ছাত্রজীবনের সঙ্গে এই যুগের ছাত্রজীবনের বিভিন্নতা। তখন ছাত্রদের কোন ভবিষ্যৎ ছিল না। বর্ত্তমান ছাত্রদের হাতে দেশের ভবিষ্যৎ। তাঁর নিজের নিষ্ফল জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা উত্তরাধিকারসূত্রে ভবিষ্য ছাত্রগণের হাতে তিনি নিঃশেষে দিয়া যাইতেছেন। বাক্যে ও কর্ম্মে সংযম চাই, অনর্থক হৈ চৈ করিয়া শক্তির অপব্যয় করা ভয়ানক বোকামি। বাঁশী ফু কিতে ইঞ্জিনের সমস্ত ষ্টীম খরচ হইয়া গেলে গাড়ি চলিবে কিসের জোরে? আমাদের আরব্ধ প্রত্যেক কর্ম্মের বিফলতার মূল এখানে। প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ—ছাত্রদের গ্রহণ-ক্ষমতা ও আগ্রহ জোগাইয়া তোলা। ইত্যাদি।

প্রায় আধ ঘণ্টা বলিয়া কবি উপবেশন করেন। এখানকার ব্যাপার সারিয়া কবি ডক্টর মজুমদারের গৃহে যাইয়া অতিথি হন এবং মজুমদার-গৃহিণী আলিপনা, খই, ফুল, শঙ্খধ্বনি সহকারে কবির অভ্যর্থনা করেন। পরে মুস্লিম হলের ছাত্রদের অভিনন্দন গ্রহণ করিতে তথায় গমন করেন। অভিনন্দনের উত্তরে সেখানেও নাকি অনেকক্ষণ বক্তৃতা করেন। আমি উপস্থিত ছিলাম না। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় আবার কার্জন হলে তাঁহার

ইংরেজী-লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিলেন। বিষয়—Meaning of Art। বেশ উচ্চ সুস্পষ্ট কণ্ঠে প্রায় এক ঘণ্টা বলিলেন। প্রকাণ্ড হলের দূরতম কোণ হইতে সবাই স্পষ্ট শুনিতে পাইল। আমি এই চিন্তা করিতে করিতে বাসায় ফিরিলাম যে, সারাদিনব্যাপী এই কোলাহল ও পরিশ্রমের টান ঐ অসুস্থ শরীরে সহিলে হয়।

২৮এ মাঘ বৃহস্পতিবার সকাল আটটায় ডক্টর মজুমদারের বাড়ি গিয়া দেখি, লেঙ্‌লী সাহেব আগেই আসিয়াছেন। দোতলার বারান্দায় বসিয়া কঠিন কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত আলোচনা জুড়িয়া দিয়াছেন। ঐ "মটর-কড়াই-কাঁকর"-জাতীয় আলোচনায় যোগ দিবার যোগ্যতার অভাবে চুপ করিয়া পিছনে বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। প্রোগ্রাম বা দৈনিক কর্ত্তব্যের তালিকার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতেই আমি মিউজিয়মের দাবি অগ্রসর করিলাম। ডক্টর মজুমদার পরিচয় করাইয়া দিলে বলিলেন, ওঁর কথা অনেক শুনেছি। আমি বিনীতভাবে বলিলাম, সব্বাই আপনাকে দোহন করছে। আমার চিত্রশালায় চলুন, ঝুলি ফের ভর্ত্তি করবার কিছু কিছু মাল-মসলা আমার ওখানে মিলতে পারে। দেখিলাম, কেমন যেন উন্মনস্ক ভাব, কথা বলিতে বলিতে যেন খেই হারাইয়া ফেলেন। এমন সময় ছাত্রদের দাবিতে তাঁহাকে নীচে নামিয়া যাইতে হইল। সেখানে গিয়া দেখি, নিতান্ত লাজুক মুখচোরার মত তিনি যেন কতকটা অসহায়ভাবে বসিয়া আছেন, কাহারও মুখের দিকে চাহিতেছেন না। ইতিমধ্যে কবির "তিন বছরের প্রিয়া" নাতিনীটি আসিয়া ভারী আসর জমাইয়া বসিল, কবি তাহারই সহিত নানা রহস্য করিতে লাগিলেন। নাতিনীটির একটি প্রশ্ন ছিল বোধ হয়, ঢাকায় বাঘ আছে কি না। কবি বলিলেন, মেলা বাঘ, রাশি রাশি বাঘ। বাঘে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যায় আর

বলে, বক্তৃতা দাও, না হয় গল্প বল। বিকালে জগন্নাথ হলে কবির অভিনন্দন ছিল, যথাসময়ে গিয়া শুনি, কবি গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। কথা বলিতে বলিতে কেমন নাকি তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িতেছেন! বুঝিলাম, প্রকৃতির প্রতিশোধ! এত অত্যাচার মানুষের শরীরে সয় না। কবি বেপরোয়া হইয়া সকলই সহিয়া যাইতেছিলেন, তাই ঢাকানগরী তাঁহার নিকট বক্তৃতা-গল্প-রসপিপাসু ব্যাঘ্র-সমাকুল অরণ্যবৎ বোধ হইতেছিল। ইহার পর কবিকে বুড়ীগঙ্গা-বক্ষে বোটে লইয়া যাওয়া হয় এবং দর্শনকারীদের আনাগোনা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কয়েকদিন পরে কবি ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

আর দুইটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া আমার এই অক্ষম স্মৃতিতর্পণ শেষ করিব।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" এবং উহার ইংরেজী অনুবাদ The Master's Will প্রকাশিত হয়। আমাদের শাসকসম্প্রদায় দেশের সাহিত্য ও কর্ষণাধারার অনেক সংবাদই রাখেন না, দেশে জাতীয়তার উদ্বোধনে রবীন্দ্র-সাহিত্য কতখানি কাজ করিয়াছে, সেই খবরও তাঁহারা রাখিতেন না। The Master's Will পড়িয়া তাঁহারা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। যাঁহাকে এতকাল নিছক কবি ভাবিয়াই তাঁহারা এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাঁহার মুখে আবার এ কেমনধারা কথা শুনা যায়! ইঙ্গভারতীয় কাগজগুলিতে রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া ঠাট্টাবিদ্রূপ সুরু হইল। 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' বলিলেন, কদলী বৃক্ষ ও ফলের বিকাশ সম্বন্ধে আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিত্বপূর্ণ গান শুনিতে রাজি আছি, কিন্তু রাজনীতি তো কবিত্ব নহে! রবীন্দ্রনিন্দা বা তাঁহার মহিমা খর্ব্ব করিবার চেষ্টা প্রত্যেক রবীন্দ্রভক্তেরই অসহ্য, পূর্ব্ববঙ্গবাসীর

অসহিষ্ণুতা আবার সর্ব্বদাই একটু সক্রিয় ও প্রবল আকার ধারণ করিয়া থাকে। আমি নবপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট রাজনৈতিক রচনার নমুনাস্বরূপ তাঁহার স্বদেশী আন্দোলনের যুগের একটি চমৎকার লেখা অংশত অনুবাদ করিয়া, এবং রবীন্দ্রনাথকে রাজনীতির ক্ষেত্রে আনাড়ী বলিয়া ধরা যে কত বড় মূঢ়তা এই সম্বন্ধে নিজস্ব লম্বা ভূমিকা দিয়া Sir Rabindranath and Politics নাম দিয়া একটা লেখা পত্রের আকারে 'স্টেট্‌স্‌ম্যানে' প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দিলাম। 'স্টেট্‌স্‌ম্যানে'র সম্পাদক উহা মহা সমাদরে সম্পাদকীয় মন্তব্যের সংলগ্ন করিয়া ৭ই অক্টোবর রবিবার, ১৯১৭ তারিখের কাগজে প্রায় পুরা দুই কলমে ছাপিলেন। এই লেখাটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিলে সুখী হইতাম, কিন্তু রচনা দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে বলিয়া বিরত হইলাম। সম্পাদকীয়ের পার্শ্বে মুদ্রিত এই দীর্ঘ এবং বেশ গরম প্রবন্ধ ইঙ্গভারতীয় কাগজগুলির রবীন্দ্র-পরিহাসের সুর থামাইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করি। কারণ ইহার পরে আর ঐ রকম রবীন্দ্র-তাচ্ছিল্যের সুর নজরে পড়ে নাই। A wellwisher of the Empire ছদ্মনামীয় লেখাটি খবরের কাগজে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এক দৈনিক কাগজে সম্পাদকীয়ভাবে লেখা হইল, রবীন্দ্রনাথের কোন শত্রু তাঁহার লেখা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া ইংরেজ সরকারের নিকট তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই প্রবন্ধ বাহির হওয়ার কয়েকদিন পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে ঢাকায় আসেন। লক্ষ্মীবাজারে তাঁহার এক আত্মীয়ের বাসায় তিনি উঠিয়াছিলেন। অপরাহ্নে তথায় তাঁহাকে ঘিরিয়া বেশ এক মজলিস বসিল, তথায় কথাপ্রসঙ্গে এই প্রবন্ধের কথা

উঠিল। দেশবন্ধু বলিলেন, এমন জোরদার লেখা জষ্টিস উড্‌রফের বলিয়াই বোধ হয়। নানা জনে নানা মন্তব্য করিলেন। মজলিস ভাঙিলে সকলে উঠিয়া পড়িলাম, দেশবন্ধুর জামাতা সুধীরবাবুকে কানে কানে বলিয়া আসিলাম, দাশ মহাশয়কে বলিবেন, লেখাটি এই অধমের। পরের দিন দেখা হইলে দেশবন্ধু সম্ভবত অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন, কিন্তু স্পষ্ট কিছু মনে নাই।

এই ঘটনার কয়েক মাস আগে আমার সম্পাদনে ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে "মীনচেতন" নামে একখানি প্রাচীন পুথি প্রকাশিত হয়। সাহিত্যবিশারদ মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে 'গোরক্ষ বিজয়' নামে এই পুথিরই এক সংস্করণ প্রকাশিত করেন। 'মীনচেতন' বাহির হইবামাত্র রবীন্দ্রনাথকে আমি একখানি উপহার পাঠাই। নিজেকে 'আলসে-কুড়ে' বলিয়া আজীবন প্রচারকারী রবীন্দ্রনাথ বস্তুত কিরূপ সুশৃঙ্খল ও কর্ম্মতৎপর ছিলেন, ইহা সকলেরই জানা আছে। বহুদিন পর্য্যন্ত সমস্ত চিঠির উত্তর তিনি স্বহস্তে দিতেন এবং তাঁহার নিকট পত্র দিয়া ফেরত ডাকে অথবা অবিলম্বে উত্তর পান নাই, এই নালিশ কাহাকেও করিতে হয় নাই। 'মীনচেতন' পাইবা-মাত্র তিনি জবাব দিলেন, ভিতরে তারিখ দেখিতেছি ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪। খামের উপর পোস্ট-অফিসের ছাপ বড়বাজার, ১৬ই মে ১৯১৭—

"বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন—মীন-চেতন বইখানি পাইয়া উপকৃত হইলাম। বাঙ্গালা ভাষার শব্দতত্ত্ব আলোচনায় আমার স্বাভাবিক ঔৎসুক্য আছে, সেই কারণে এ বইখানি আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান। এরূপ গ্রন্থ আবিষ্কার ও প্রচার করিয়া ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ গৌরব লাভ করিতেছেন এবং এই উদ্যোগে আপনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, সে জন্য স্বদেশের হইয়া আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলাম। ইতি ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪—ভবদীয় শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

যজ্ঞভস্ম

সুষমা শক্তি প্রতিভা প্রভাব দিন—
সব দেখি এসে ভস্মেতে হয় লীন।
শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মিশায় সেথায় গিয়া,
রহে বীজ তার ভস্মেতে লুকাইয়া।
ভস্ম হইতে নূতন ফিনিক্স উঠি
শুনি নাকি ফেরে নব পাখা ঝুটপুটি।
জীবনে মরণে এক সুরে বীণা বাজে—
অমৃতের লীলা অবিরাম চলিয়াছে।

২

ধূলি হতে উঠি চম্পক হয় ধূলি,
চূর্ণই চায় মহাকাল-অঙ্গুলি।
সকল গণ্ডি ভাঙাই যাহার কাজ,
তারও সমাপ্তি হেরি গণ্ডির মাঝ।
আকাঙ্ক্ষা যার ধরে না ভূমণ্ডলে,
মুষ্টিমেয় সে ভস্ম অবনীতলে।
ধরা যার জয়যাত্রা রোধিতে নারে
অনায়াসে রাখে ছোট কৌটাই তারে।

৩

ভস্মকে তাই বড় ব'লে জানি মোরা
বিশ্বনাথের ক্ষেত্র বিশ্ব-জোড়া।
চিতাভস্ম যে মহিমান্বিত অতি—
ধরে মহাকাল, বুকে লয় ভাগীরথী,
মৃত্যুই দেয় সুধার আহুতি ঢালি—
জীবনকে করে অধিক শক্তিশালী।
অনলের শিখা মরণের ওই ধূপ
বৃত্তকে দেয় বৃহৎ বিশ্বরূপ।

৪

কি রূপ কান্তি হইল অনলগত!
বাল্মীকি হ'ল বল্মীকে পরিণত।
মদন আবার পুড়িয়া হইল ছাই,
সসীম যে ছিল আজ তার সীমা নাই।
দাহ নহে, এ যে নূতন শক্তি নিতে
স্নান আগ্নেয় হর-নেত্রাগ্নিতে।
সমাপ্ত হ'ল যজ্ঞ সে রাজসূয়,
হোম-অঙ্গার যেখানে ইচ্ছা থুয়ো।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ কি ছিলেন সে কথা তাঁর তিরোধানের পর থেকে সারা পৃথিবীর বিদ্বজ্জন ও মনস্বীরা নানা ভাবে নানা ছাঁদে বলছেন। দেশ থেকে বিদেশ থেকে মহাযুদ্ধের কোলাহল ভেদ ক'রে রবীন্দ্রনাথের জয়ধ্বনি আজ চতুর্দ্দিক থেকেই শোনা যাচ্ছে। কেউ বলছেন তিনি বাল্মীকির ন্যায় মহাকবি, কেউ বলছেন তিনি সর্ব্বতোমুখী বিরাট প্রতিভা, কেউ বলছেন তিনি ভারতের অন্তরের প্রতীক, কেউ বলছেন তিনি সাম্য ও শান্তির অগ্রদূত, আবার কেউ বলছেন তিনি মানবের পথপ্রদর্শক ঋষি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার কথা কারও কাছেই আর অবিদিত নেই, কিন্তু তিনি যে চিকিৎসক ছিলেন এ কথা কি সকলে জানেন?

মহামানবের সম্বন্ধে বলতে কেবল মহৎ ব্যক্তিরাই অধিকারী। অর্ব্বাচীন যদি হিমালয়ের মহিমা বর্ণনা করতে চায়, তবে সে আবোল-তাবোল কথাই বলবে। এই কথা স্মরণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার কিছু না বলাই উচিত ছিল। কিন্তু ক্ষুদ্র হয়েও রবীন্দ্রনাথকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছি। তাঁর ভাষাতেই বলি,—আকাশের সূর্য্যও মাঝে মাঝে পত্রাশ্রয়ী জলবিন্দুটির কাছে ধরা দেয়, তার বিরাট রূপ কখন কখন সেই জলবিন্দুর ক্ষুদ্র হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। কেন জানি না, কিন্তু ঠিক তেমনই ভাবেই রবীন্দ্রনাথকে পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। অনাত্মীয় হয়েও আমি ছিলুম তাঁর স্নেহের পাত্র। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের যেটুকু পরিচয় আমি পেয়েছি, সেই সম্বন্ধে কিছু বলতে পারি।

আমার প্রথম যৌবনে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। আমি প্রায় পঁচিশ বছর পূর্ব্বেকার কথা বলছি। তখন তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল রবীন্দ্রনাথকে দেখব, তাঁর সঙ্গে আলাপ করব। আকাঙ্ক্ষা প্রবল হ'লে তার পূরণ করবার সুযোগেরও অভাব হয় না। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেল, এবং আমি তাঁরই শরণাপন্ন হলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার আগ্রহ দেখেই হোক কিংবা যে কারণেই হোক, দুই একটি কথার পরেই রবীন্দ্রনাথ আমাকে বললেন, তুমি মাঝে মাঝে আমার কাছে এসো। আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম, উৎসাহের সঙ্গে তাঁর কাছে ঘন ঘন যাতায়াত করতে লাগলাম। কয়েকদিন গিয়ে দেখলাম, তাঁর দ্বার অবারিত, সকলেই তাঁর কাছে অনায়াসে চ'লে যায়, সকলের সঙ্গেই তিনি কথা বলেন। কত লোক যে তাঁর কাছে আসে, অনবরতই তাঁকে ঘিরে থাকে, তাদের সঙ্গে আলাপে আলোচনায় সর্ব্বদাই তিনি নিযুক্ত থাকেন, আমার আর কিছু বলা হয় না। আমার তখন বলবারই বা আছে কি ? আমি তো তাঁর কথাই শুনতে যাই। তাঁর কাছ ঘেঁষে কেবল চুপটি ক'রে ব'সে থাকি, আর কান দিয়ে তাঁর মুখের কথাগুলি আকণ্ঠ পান করি। পরিহাসপ্রিয়তা তাঁর অসাধারণ। আমি মনে মনে ভাবি, যিনি অনন্যসাধারণ, তাঁর পরিহাসও বুঝি এমন অনন্যসাধারণ হয়।

ডাক্তারি পাস করবার পরে কিছুকালের জন্য আমার কাজের অবসর ঘটল। তাই শুনে রবীন্দ্রনাথ বললেন, বোলপুরে আমার কাছে এখন থাকবে চল, তোমার গান শেখবার সুবিধা হবে। প্রায় দু মাস তাঁর কাছে গিয়ে থাকলাম, এই দু মাস তিনি আমাকে আনন্দে

ভরিয়ে রাখলেন। দীনুবাবুকে আমায় গান শেখাতে ব'লে দিলেন, প্রত্যহ তাঁর কাছে নতুন নতুন গান শিখতাম। আর প্রত্যহ দুবেলা যেতাম রবীন্দ্রনাথের কাছে, কত রকমের হাস্য-পরিহাস এবং আলাপ-আলোচনা তিনি করতেন আমার সঙ্গে।

একদিন তিনি কথায় কথায় বললেন, ডাক্তারী বিদ্যায় যা তুমি শিখলে, বাংলায় সেসব কথা লেখ না কেন? দেশের লোকের তাতে উপকার হবে। আমি বললাম, তা কি কখনও হয়? ডাক্তারী বিজ্ঞানের শক্ত শক্ত কথা কি আমাদের বাংলা কথায় লেখা যায়? আর সে সকল কথা সাধারণ লোকে পড়বেই বা কেন? রবীন্দ্রনাথ বললেন, নিশ্চয়ই লেখা যায় এবং লেখা উচিত। ইউরোপের সকল ভাষাতেই যা লেখা হচ্ছে, আমাদের বাংলা ভাষায় তা লেখা হতে পারবে না কেন? পরের ভাষায় লেখা হয় ব'লেই অধিকাংশ লোকে শরীর সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কথা জানতে পারে না, নিজের ভাষায় লেখা হ'লে অনেকেই তা জানতে পারে। আমি যদি তোমাদের বিজ্ঞান শিখতাম, তা হ'লে নিশ্চয়ই সে বিষয়ে বাংলা ভাষায় লিখতাম। আমিও কিছু কিছু ডাক্তারি জানি, কিন্তু সে লেখবার মত নয়।

রবীন্দ্রনাথের কথার আমি কোন আর জবাব দিলাম না, কারণ ঐ দিক দিয়ে এসব কথা আমি কখনও ভেবে দেখি নি।

কিন্তু এর পর থেকে কয়েকদিন লক্ষ্য ক'রে দেখলাম যে, রবীন্দ্রনাথের ডাক্তারি জানার কথাটা নিতান্ত বাজে নয়। তাঁর ঘরে দেখলাম, হোমিওপ্যাথির কয়েকটা মোটা মোটা বই আছে। প্রত্যহ সকালে দেখতে পেতাম, অনেক রোগী তাঁর দরজায় এসে জড় হয় ওষুধ নিতে। একদিন দেখলাম, আশ্রমের একটি ছেলের ইরিসিপেলাস হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তাকে ওষুধ দিচ্ছেন। ব্যাপারটা নিতান্ত সামান্য হয় নি, কিন্তু

কয়েকদিন বাদে দেখলাম, ছেলেটি সেরেই গেল। আশ্রমের লোকেরা বললে, উনি চমৎকার ওষুধ দিতে পারেন, তাতেই তাদের অনেক রোগ সেরে যায়, অন্য ডাক্তার দেখাবার প্রায়ই দরকার হয় না। একদিন শেষে আমারই হ'ল অসুখ। রবীন্দ্রনাথ বললেন, এবার ডাক্তারের ওপর ডাক্তারি করতে হবে। তুমি আমার ওষুধ খেয়ে দেখ, নিশ্চয় সেরে যাবে। বিশ্বাস ক'রে তাঁরই ওষুধ খেলাম, এবং তারপর আমার অসুখও সেরে গেল। হোমিওপ্যাথি এবং বাইওকেমিক ওষুধের দ্বারা তিনি চিকিৎসা করতেন, কিন্তু তাঁর নিজের ঔষধ নির্ব্বাচনের প্রতি খুব আস্থা ছিল। আর যখন দেখতেন যে ওষুধে ফল হয়েছে, তখন সে কি তাঁর আনন্দ!

এর পর অনেক বছর কেটে গেল। নিজের কাজকর্ম্মে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। দেখা হ'লেই তিনি বলতেন, তুমি বাংলায় কিছু লিখলে না হে? আমাদের দেশের রোগগুলোর সম্বন্ধে লেখবার চেষ্টা ক'রে একবার দেখ না! কথাটা প্রথমে আমি তেমন গায়ে মাখতাম না। কিন্তু তাঁর আদেশ আর উৎসাহ আমার ভেতরে ভেতরে কাজ সুরু করেছিল। কিছুকাল পরে আমি রোগ সম্বন্ধে বাংলায় লিখতে আরম্ভ করলাম। প্রথম প্রথম এ বিষয়ে তাঁকে কিছুই জানাই নি। মনে যথেষ্ট ভয় ছিল যে, বাজে লেখা হচ্ছে, উনি দেখলে হাসবেন। কিন্তু যখন অনেকগুলো লেখা হয়ে গেল, তখন সেগুলো একত্র ক'রে তাঁকে ডাকযোগে বোলপুরে পাঠিয়ে দিলাম। এর কিছুকাল পরে তিনি কলকাতায় এলেন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমায় দেখেই তিনি বললেন, তোমার লেখাগুলি সমস্তই পড়েছি, খুব সুন্দর লেখা হয়েছে, এবার ওগুলো ছাপিয়ে ফেল। আমি ভাবলাম যে,

আমাকে খুশি করবার জন্তেই ঐ কথা বলছেন। বললাম, ছাপতে গেলে লোকসান হবে, পয়সা দিয়ে কিনে কেউ পড়বে না। তিনি বললেন, লোকসান হবে না, তুমি ছাপতে দাও। বইখানার নাম দাও—"ভারতীয় ব্যাধি।" আমি তোমার বইয়ের ভূমিকা লিখে দেব। আমাদের দেশে এসব লেখার অত্যন্ত দরকার, অথচ কেউই লেখে না।

কিছুদিন পরে তিনি নিজেই উপযাচক হয়ে মস্ত বড় এক ভূমিকা লিখে পাঠিয়ে দিলেন। তবু আমি সে লেখা অনেক কাল ফেলে রাখলাম, বই ছাপতে দিতে ইতস্তত করতে লাগলাম। অবশেষে রবীন্দ্রনাথেরই তাগিদে বই ছাপা হ'ল। ভূমিকায় তিনি রোগবিদ্যার জ্ঞানপ্রচার সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, তা অতি চমৎকার। আমি তার থেকে কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি।—

ডাক্তারি বইয়ের ভূমিকা কবির চেয়ে কবিরাজকে মানায় ভালো। এ কাজে আমার যদি সত্যিকার কোনো তাগিদ থাকে তবে সে রোগীর তরফ থেকে। কিছুকাল থেকে গ্রামের কাজে নিযুক্ত আছি, দেখেছি এ দেশে সকলের চেয়ে গুরুতর অভাব আরোগ্যের। বিবিধ উপায়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে এদেশের লোককে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল কি করে রোগ ঠেকানো যায়। রাশিয়াতে এই প্রচারকার্য কি রকম সম্যকভাবে ব্যাপকভাবে সমস্ত দেশ জুড়ে চলচে তা দেখে এসেছি। আমাদের দেশে এর প্রয়োজন সেখানকার চেয়ে অনেক বেশি, অথচ আয়োজন নেই বললেই হয়।...

আমাদের দেশে যে সকল রোগ মানুষের ধন-প্রাণ-মানের গোড়া ঘেঁষে কোপ মারচে, তার প্রকৃতি ও প্রতিকার নির্ণয় সম্বন্ধে এই লেখাগুলি আমার কাছে অতিশয় ঔৎসুক্যজনক। তার একটা কারণ, রোগের পরিচয়ে শরীরের পরিচয় পাওয়া যায়। শরীরী মানুষ এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ, যে সমস্ত রোগের সঙ্গে প্রতিদিন আমাদের ঘর করতে হচ্চে তাদের সঙ্গে পদে পদে কারবার করতে গেলে অসহায় অজ্ঞতা নিয়ে একমাত্র ডাক্তারের দিকেই পথ তাকিয়ে থাকলে চলে না,—অন্তত কিছু পরিমাণে ডাক্তারের সহযোগিতা না করতে পারলে বাঁচাও নেই। এ দেশে রোগ যত সুলভ, ডাক্তার তত সুলভ নয়।...

গ্রামে যদি কোথাও এক আধজন জনহিতৈষী শিক্ষিত লোক থাকেন তাঁরাও এই রকম বইয়ের সাহায্যে উপস্থিত অনেক উপকার করতে পারবেন,—আর আমার মতো সাহিত্য-ডাক্তার যাকে দায়ে পড়ে ভিষক্-ডাক্তার হতে হয় তার তো কথাই নেই। কিসের দায়? তার দৃষ্টান্ত দিই। সাঁওতাল পাড়ার মা এসে আমার দরজায় কেঁদে পড়ল, তার ছেলেকে ওষুধ দিতে হবে। যতই বলি আমি ডাক্তার নই, ততই তার জিদ বেড়ে যায়। জানি, যদি তাকে নিতান্তই বিদায় করে দিই, সে তখনি যাবে ভূতের ওঝার কাছে, তার ঝাড়ার চোটে রোগ ও রোগী দুইই দেবে দৌড়। বই খুলে বসতে হোলো,—বড়াই করতে চাইনে কেন না পসার বাড়াবার ইচ্ছে মোটেই নেই,—সে রোগী আজও বেঁচে আছে। আমার গুণে বা তার ভাগ্যের গুণে সে তর্কের শেষ মীমাংসা কোনো উপায়েই হতে পারে না। বহুকাল পূর্বে রামগড় পাহাড়ে গিয়েছিলুম। সেখানেও রোগীরা আমাকে অসাধ্য রোগের মতোই পেয়ে বসেছিল—ঝেড়ে ফেলবার অনেক চেষ্টা করেছিলুম, শেষকালে তাদেরই হোলো জিৎ। যাদের সাধ্যগোচরে কোথাও কোনো চিকিৎসার উপায় নেই তারা যখন কেঁদে এসে পায়ে ধরে পড়ে, তাদের তাড়া করে ফিরিয়ে দিতে পারি এত বড় নিষ্ঠুর শক্তি আমার নেই। এদের সম্বন্ধে পণ করে বসতে পারিনে যে পুরো চিকিৎসক নই বলে কোনো চেষ্টা করব না। আমাদের হতভাগ্য দেশে আধা-চিকিৎসকদেরও যমের সঙ্গে যুদ্ধে আড়কাঠি দিয়ে সংগ্রহ করতে হয়।...

উপস্থিত বইখানি ঘরের কোনো কোনো লোক যদি পড়ে রাখেন তবে তাঁদের শুশ্রূষায় হৃদয়ের সঙ্গে জ্ঞানের যোগ হয়ে তার মূল্য অনেক বেড়ে যাবে। আর যাই হোক, ডাক্তার পশুপতিকে আশীর্বাদ করে আমি মাঝে মাঝে এই বইখানি পড়ব এবং সেই পড়া নিশ্চয়ই কাজে লাগবে।

ভূমিকার শেষে যা লিখেছিলেন, সত্যই উনি তাই করতেন। অনেকবার দেখা করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি, আমার বইখানি ওঁর বিছানার কাছে রয়েছে। ঘরের লোকদের কাছেও শুনেছি, কোনও রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে উনি প্রায়ই এই বইখানি খুলে পড়তেন।

বই ছাপিয়ে আমার লেখবার সাহস আরও বেড়ে গেল। স্বাস্থ্য ও রোগ সম্বন্ধে অমি মাসিক-পত্রাদিতে লিখতে আরম্ভ করলাম।

আমি মনে মনে ভাবলাম যে, এগুলো রবীন্দ্রনাথের নজরে পড়ে না। কিন্তু তা নয়, সমস্তই উনি পড়তেন। বাংলা সাহিত্যে কোথায় কি লেখা হচ্ছে কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়াত না। একদিন হঠাৎ আমাকে বললেন, দেখ, তুমি যা লিখছ অমন ভাবে লিখলে চলবে না। বরং সমস্ত ফিজিওলজিটা একে একে ধারাবাহিকভাবে লিখে যাও, এতে কাজ হবে।

আমি খাদ্য সম্বন্ধে আর পরিপাকক্রিয়া সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে লিখতে লাগলাম। এ সম্বন্ধে লেখা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আমি সেগুলো বন্ধুবর সজনীকান্ত দাসের মারফৎ তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। লেখাগুলি নিয়ে তিনি কালিম্পং চ'লে গেলেন এবং সেখান থেকে ফিরে রোগশয্যা নিলেন। যখন খুবই অসুস্থ তখন একদিন আমাকে হঠাৎ ডেকে পাঠালেন। তখন তিনি চোখেও তেমন দেখতে পান না এবং নিজের হাতেও কিছু লিখতে পারেন না। আমি কল্পনাও করতে পারি নি যে, এই অবস্থায় উনি আমার ঐ সব নীরস লেখা নিয়ে মাথা ঘামাবেন। কিন্তু ওঁর মুখে শুনলাম যে, আমার লেখার সম্বন্ধে বলবার জন্যই আমাকে ডেকেছেন। তিনি বললেন যে, এ অবস্থাতেই তিনি সেই লেখা অপরকে দিয়ে পড়িয়ে নিয়ে শুনেছেন এবং বিশ্বভারতী থেকে লোকশিক্ষা পুস্তক হিসাবে সেগুলো নিজে ছাপিয়ে বই করবার মনস্থ করেছেন। এর পর তিনি কলকাতা থেকে একটু সেরে বোলপুর চ'লে গেলেন। যখন খবরের কাগজে প্রায়ই দেখছি যে, তিনি খুব অসুস্থ, তখন অকস্মাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আবার তাঁর কাছ থেকে এই চিঠিখানি এল—

কল্যাণীয়েষু—

পশুপতি, পরিভাষাবর্জিত সরল প্রণালীতে রচিত পথ্যবিচার সম্বন্ধে তোমার লেখাটি আমার ভালো লেগেছে বলে আমাদের লোকশিক্ষা গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাকে গ্রহণ করবার

জন্যে আমি আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিয়েছি। আমাদের দেশে কুপথ্যজীর্ণ পাকস্থলীর পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আশা করি তোমার এই লেখা দেশের লোকে আহার সম্বন্ধে আপন অভ্যস্ত রুচির সংস্কার সাধনের কাজে শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করবে। তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি, ৬।১।৪১

আশীর্বাদক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই চিঠি পেয়ে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। এত অসুস্থ থেকেও তিনি এই সব কাজ করছেন! আমি ভাবতাম যে, তিনি যেমন চান তেমনই লিখে আমি তাঁকে অবাক ক'রে দিয়েছি, কিন্তু দেখলাম, তিনিই আমাকে অবাক ক'রে দিয়েছেন। এই চিঠিখানির মধ্যে লক্ষ্য করবার জিনিস অনেক আছে। চিঠিখানার সমস্তটাই বাংলা টাইপরাইটার দিয়ে লেখা, অর্থাৎ কথাগুলো তিনি মুখে ব'লে গেছেন, কেউ সেগুলো টাইপ ক'রে দিয়েছে। কিন্তু "আশীর্বাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" এইটুকু তাঁর নিজের কম্পিত হস্তের লেখা। নিতান্ত অসমর্থ হয়েও তিনি ওটুকু নিজের হাতে লিখেছেন। যে হস্তাক্ষর এক সময় ছবির মত সুন্দর ছিল, তা এখন একেবারে বাঁকাচোরা। চিঠিখানির তারিখ ৬।১।৪১, অর্থাৎ মৃত্যুর ঠিক সাত মাস আগে। আমার কাছে তাঁর প্রেরিত এই শেষ হস্তাক্ষর। আমার বইখানা ছাপা হয়ে বেরুল, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর তিন মাস আগে।

এর পরে তাঁর শেষ দর্শন পেলাম তাঁর মৃত্যুশয্যায়। কিন্তু সে কথা ভাষায় বর্ণনা করবার নয়, সে কেবল আপন অন্তরে স্মরণ ক'রে স্তব্ধ হয়ে থাকার কথা। সেই দৃশ্য আর সেই স্মৃতি আমার চিরজীবনের সম্পদ হয়ে রইল। মানুষের জীবনের ইতিহাসে এক একটি স্মৃতিসম্পদ থেকে যায়, আমার জীবনের ইতিহাসে এই একটি অমূল্য সম্পদ।

তাঁর মৃত্যু আজ বাংলা দেশকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছে। তাঁর মৃত্যুর কথা মনে হ'লেই আমার চোখের সামনে বারে বারে একটি মানুষের চিত্র উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে। সে তাঁর পুরাতন চাকর বনমালী। বহুকাল থেকে দেখে আসছি, এই লোকটিই সর্ব্বদা তাঁর কাছে কাছে থাকত, এ ছিল তাঁর সকলের চেয়ে ঘনিষ্ঠ। সকল কাজে একেই তিনি ডাক দিতেন, কারণে অকারণে যখন তখন একে ধমক দিতেন, আবার যখন তখন এর জন্যে তাঁর উদ্বেগেরও অন্ত ছিল না। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময় দেখে এলাম এই বনমালীকে। ঘরের বাইরে সিঁড়ির পাশে হাঁটুতে মুখ রেখে সে একা চুপটি ক'রে ব'সে আছে। কত লোকজন ব্যস্ত হয়ে বারান্দায় আনাগোনা করছে, বনমালীর দিকে কেউ ফিরেও চাইছে না, বনমালীও কারও দিকে চাইছে না। তার দৃষ্টি উদাস, স্তম্ভিত। তার চোখে অশ্রু নেই, মুখে কোনও ভাবান্তর নেই। সমস্ত কাজও আজ তার ফুরিয়ে গেছে, জগতের কাছে সমস্ত পরিচয়ও যেন তার শেষ হয়ে গেল। আমার মনে হয় সমগ্র বাঙালী জাতির মনের অবস্থা আজ ঐ বনমালীর মত।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

যাবার দিন

যাবার দিনে এই কথাটি ব'লে যেন যাই,
যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তা'র নাই।
এই জ্যোতি-সমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই,
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।
বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম দু'টি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা সকল দেহে দিলেন ধরা,
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ ক'রে দিন তাই,
যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী

১৮৭৮—১৯১৬

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত]

রবীন্দ্রনাথ জীবিতকালে যে-সকল বাংলা পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা মোটেই অল্প নহে। এগুলির একটি সঠিক তালিকা প্রণয়ন-কার্য্যে আমরা কিছু দিন হইতে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আপাততঃ ১৮৭৮ হইতে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের শোভন সংস্করণ প্রকাশ পর্য্যন্ত, যে সকল পুস্তক-পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাদের একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিবার চেষ্টা করিলাম।

রবীন্দ্রনাথের বহু রচনাই প্রধানতঃ মাসিকপত্রে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই রচনাগুলির অধিকাংশই তাঁহার কোন-না-কোন গ্রন্থে পরবর্ত্তী কালে স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু সকল পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া যায় নাই; যেগুলির পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই তালিকায় রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত গ্রন্থগুলির (যেমন, 'পদরত্নাবলী' বা 'সংস্কৃত প্রবেশ') উল্লেখ করা হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের অনেক পুস্তকেই প্রকাশকাল দেওয়া নাই। তাহা জানিবার প্রধান উপায় 'ক্যালকাটা গেজেটে'র পরিশিষ্ট-রূপে প্রকাশিত বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা। বর্ত্তমান তালিকায় বন্ধনীমধ্যে যে ইংরেজী তারিখগুলি দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় প্রদত্ত প্রথম সংস্করণের পুস্তকের প্রকাশকাল। এগুলির সাহায্যে, একই বৎসরে প্রকাশিত একাধিক পুস্তকের পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে। এই অত্যাবশ্যক উপাদানটির অভাবে আমার পূর্ব্বগামীদের কেহ কেহ গোলে পড়িয়াছেন। দুঃখের বিষয়, বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি পুস্তকের নাম পাওয়া যায় নাই। উদাহরণস্বরূপ 'আত্মশক্তি', 'বিদ্যাসাগর চরিত', 'গান', 'ইংরাজী শ্রুতিশিক্ষা', 'ইংরাজী পাঠ' ও 'চয়নিকা'র উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে আবার

কয়েকখানি এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত, সুতরাং বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় পাইবার কথা নয়।

১৮৭৮

১। কবি-কাহিনী। সংবৎ ১৯৩৫। পৃ. ৫৩। [৫ নবেম্বর ১৮৭৮]

১৮৮০

২। বন-ফুল। ১২৮৬ সাল। পৃ. ৯৩। [৯ মার্চ ১৮৮০]

১৮৮১

৩। বাল্মীকি প্রতিভা। ফাল্গুন ১৮০২ শক। পৃ. ১৩।

৪। ভগ্নহৃদয়। শকাব্দা ১৮০৩। পৃ. ১৯৬। [২৩ জুন ১৮৮১]

৫। রুদ্রচণ্ড। শকাব্দা ১৮০৩। পৃ. ৫৩। [২৫ জুন ১৮৮১]

৬। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। শকাব্দা ১৮০৩। পৃ. ২৫৬। [২৫ অক্টোবর ১৮৮১]

১৮৮২

৭। সন্ধ্যা সঙ্গীত। সন ১২৮৮। পৃ. ৫+১৩২+৩ উপহার। [৫ জুলাই ১৮৮২]

৮। কাল-মৃগয়া। অগ্রহায়ণ ১২৮৯। পৃ. ৩৮। [৫ ডিসেম্বর ১৮৮২]

১৮৮৩

৯। বৌ-ঠাকুরাণীর হাট। পৌষ ১৮০৪ শক। পৃ. ৵০ উপহার+৩০৪+১ উপসংহার। [১১ জানুয়ারি ১৮৮৩]

১০। প্রভাত সঙ্গীত। বৈশাখ ১৮০৫ শক। পৃ. ১২০। [১১ মে ১৮৮৩]

১১। বিবিধ প্রসঙ্গ। ভাদ্র ১৮০৫ শক। পৃ. ১৪৯। [১১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩]

১৮৮৪

১২। ছবি ও গান। ফাল্গুন ১৮০৫ শক। পৃ. ১০৪। [২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪]

১৩। প্রকৃতির প্রতিশোধ। সন ১২৯১। পৃ. ৮১। [২৯ এপ্রিল ১৮৮৪]

১৪। নলিনী। সন ১২৯১। পৃ. ৩৬। [১০ মে ১৮৮৪]

১৫। শৈশব সঙ্গীত। সন ১২৯১। পৃ. ১৪৯। [২৯ মে ১৮৮৪]

১৬। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। সন ১২৯১। পৃ. ৬০। [১ জুলাই ১৮৮৪]

১৮৮৫

১৭। রামমোহন রায়। পৃ. ৩৪। [১৮ মার্চ ১৮৮৫]

১৮। আলোচনা। পৃ. ১৩৩। [১৫ এপ্রিল ১৮৮৫]

১৯। রবিচ্ছায়া। বৈশাখ ১২৯২। পৃ. ১৭১। [২ জুন ১৮৮৫]

১৮৮৬

২০। কড়ি ও কোমল। সন ১২৯৩। পৃ. ।৶০+২৬৩। [১৭ নবেম্বর ১৮৮৬]

১৮৮৭

২১। রাজর্ষি। সন ১২৯৩। পৃ. ২৪২। [১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭]

২২। চিঠিপত্র। ১৮৮৭। পৃ. ৬৯। [২ জুলাই ১৮৮৭]

১৮৮৮

২৩। সমালোচনা। ১২৯৪ সাল। পৃ. ১৬৭। [২৬ মার্চ ১৮৮৮]

২৪। মায়ার খেলা। অগ্রহায়ণ ১৮১০ শক। পৃ. ৬+৬৪। [২২ ডিসেম্বর ১৮৮৮]

১৮৮৯

২৫। রাজা ও রাণী। ২৫ শ্রাবণ ১২৯৬। পৃ. ১৪৯। [৯ আগস্ট ১৮৮৯]

১৮৯০

২৬। বিসর্জন। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ সাল। পৃ. ৬ উৎসর্গ+২+১৫৪। [১৫ মে ১৮৯০]

২৭। মন্ত্রি অভিষেক। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭। পৃ. ২৪।

২৮। মানসী। ১০ পৌষ ১২৯৭। পৃ. ২২৪। [২৪ ডিসেম্বর ১৮৯০]

১৮৯১

২৯। য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি। বৈশাখ ১২৯৮। পৃ. ৭৮। [৫ মে ১৮৯১]

১৮৯২

৩০। চিত্রাঙ্গদা। ২৮ ভাদ্র ১২৯৯ সাল। পৃ. ৪১। [১৩ মে ১৮৯২]

১৩০১ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত 'চিত্রাঙ্গদা'র ২য় সংস্করণের সহিত 'বিদায়-অভিশাপ' সংযোজিত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়।

৩১। গোড়ায় গলদ্। ৩১ ভাদ্র ১২৯৯। পৃ. ১৩৬। [১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯২]

১৮৯৩

৩২। গানের বহি ও বাল্মীকি-প্রতিভা। ৮ বৈশাখ ১৮১৫ শক। পৃ. ৪০৭। [২০ এপ্রিল ১৮৯৩]

৩৩। য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি। দ্বিতীয় খণ্ড। ৮ আশ্বিন ১৩০০ সাল। পৃ. ৯৭। [২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩]

১৮৯৪

৩৪। সোনার তরী। ১৩০০। পৃ. ২০৯। [২ জানুয়ারি ১৮৯৪]

৩৫। ছোট গল্প। ১৫ ফাল্গুন ১৩০০ সাল। পৃ. ১৮৯। [২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪]

৩৬। বিচিত্র গল্প। প্রথম ভাগ। ১৩০১। পৃ. ১১১। [৫ অক্টোবর ১৮৯৪]

৩৭। বিচিত্র গল্প। দ্বিতীয় ভাগ। ১৩০১। পৃ. ১১১। [৫ অক্টোবর ১৮৯৪]

৩৮। কথা-চতুষ্টয়। ১৩০১। পৃ. ১৩০। [৫ অক্টোবর ১৮৯৪]

১৮৯৫

৩৯। ছেলেভুলানো ছড়া।

ইহা ১৩০১ সালের মাঘ সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত "ছেলেভুলানো ছড়া" প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ মাত্র।

৪০। গল্প-দশক। ১৩০২। পৃ. ২২০। ৩০ আগস্ট ১৮৯৫]

১৮৯৬

৪১। নদী। ২২ মাঘ ১৩০২। পৃ. ৩৪। [৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬]

৪২। চিত্রা। ফাল্গুন ১৩০২। পৃ. ১৫১। [১১ মার্চ ১৮৯৬]

৪৩। সংস্কৃত শিক্ষা, ১ম ভাগ। পৃ. ৪২। ১৮৯৬। [৮ আগস্ট ১৮৯৬]

৪৪। সংস্কৃত শিক্ষা, ২য় ভাগ। ১৮৯৬। পৃ. ৩৪। [৮ আগস্ট ১৮৯৬]

৪৫। কাব্য গ্রন্থাবলী। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রকাশিত। ১৫ আশ্বিন ১৩০৩। পৃ. ৪৭৬। [৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬]

এই 'কাব্য গ্রন্থাবলী'তে "মালিনী" ও "চৈতালি" সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

১৮৯৭

৪৬। বৈকুণ্ঠের খাতা। চৈত্র ১৩০৩। পৃ. ৫৫। [৫ এপ্রিল ১৮৯৭]

৪৭। পঞ্চভূত। ১৩০৪। পৃ. ১৯৫। [১২ মে ১৮৯৭]

১৮৯৯

৪৮। কণিকা। ৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৬। পৃ. ৪৫। [১৯ নবেম্বর ১৮৯৯]

১৯০০

৪৯। কথা। ১ মাঘ ১৩০৬। পৃ. ১১০। [১৪ জানুয়ারি ১৯০০]

৫০। ব্রহ্মোপনিষদ। ৭ মাঘ ১৩০৬। পৃ. ২৪।

৫১। কাহিনী। ২৪ ফাল্গুন ১৩০৬। পৃ. ১৬৪। [১২ মার্চ ১৯০০]

৫২। কল্পনা। ২৩ বৈশাখ ১৩০৭। পৃ. ১১৪। [৫ মে ১৯০০]

৫৩। ক্ষণিকা। পৃ. ২২৫। [২৬ জুলাই ১৯০০]

৫৪। গল্পগুচ্ছ (প্রথম খণ্ড)। ১ আশ্বিন ১৩০৭। পৃ. ৪৪৮। [১১ অক্টোবর ১৯০০]

১৯০১

৫৫। গল্প। ১৩০৭ সাল। .পৃ. ৪৪৯-৯২৯। [৪ মার্চ ১৯০১]

৫৬। ব্রহ্মমন্ত্র। ৮ মাঘ ১৩০৭। পৃ. ২৩।

৫৭। নৈবেদ্য। আষাঢ় ১৩০৮। পৃ. ২০০। [৪ জুলাই ১৯০১]

৫৮। ঔপনিষদ ব্রহ্ম। শ্রাবণ ১৩০৮। পৃ. ৪২।

৫৯। বাঙ্‌লা ক্রিয়া-পদের তালিকা। বঙ্গাব্দ ১৩০৮। পৃ. ২৪+২।

১৯০৩

৬০। চোখের বালি। ১৩০৯। পৃ. ৩৩৮। [৫ এপ্রিল ১৯০৩]

৬১। কাব্য-গ্রন্থ। মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত। ১৯০৩-৪।

"স্মরণ" ও "শিশু" প্রথমে 'কাব্য-গ্রন্থে'র ৬ষ্ঠ ও ৭ম ভাগে প্রকাশিত হয়।

৬২। কর্ম্মফল। । ১৩১০ সন। পৃ. ৯২। [২২ ডিসেম্বর ১৯০৩]

১৯০৪

৬৩। ইংরাজি সোপান, ১ম খণ্ড। পৃ. ২৪+৪১। [৭ মে ১৯০৪]

পরবর্ত্তী কালে 'ইংরাজি সোপানে'র "উপক্রমণিকা" অংশ (পৃ. ১-২৪) স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে 'ইংরাজী শ্রুতিশিক্ষা' নামে (১৩১৬ সালে ?) প্রকাশিত হয়। 'ইংরাজি সোপান', ১ম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণে (১২ পৌষ ১৩২০) "বিশেষ দ্রষ্টব্য" অংশে প্রকাশ, "...প্রথম সংস্করণে এই গ্রন্থের আরম্ভে যে অংশ সন্নিবেশিত হইয়াছিল, তাহা "ইংরাজি শ্রুতিশিক্ষা" নামে পরিবর্দ্ধিত আকারে স্বতন্ত্র গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।"

৬৪। স্বদেশী সমাজ। পৃ. ৩০। [৩১ জুলাই ১৯০৪]

৬৫। রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী। হিতবাদির উপহার। ১৩১১ সাল। পৃ. ১২৯০। [২৯ আগস্ট ১৯০৪]

হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী'র "রঙ্গচিত্র" অংশে 'চিরকুমার সভা' (পরে 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ' ও 'চিরকুমার সভা' নামে পুস্তকাকারে) প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৯০৫

৬৬। আত্মশক্তি। ১৩১২। পৃ. ১৭৪।

ইহা ১৩১২ সালে আশ্বিন মাসের প্রথমে প্রকাশিত হয়।—'বঙ্গদর্শন', আশ্বিন ১৩১২, "বিজ্ঞাপন" দ্রষ্টব্য।

৬৭। স্বদেশ। ১৩১২। পৃ. ১৪৫। [২৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৫]

ইহা সংকল্প ও স্বদেশ—এই দুই ভাগে বিভক্ত। "স্বদেশ" বিভাগে রবীন্দ্রনাথের "শিবাজী উৎসব" কবিতাটি স্থান পাইয়াছিল। ইহা প্রথমে ১৩১১ সালের ভাদ্র মাসে শিবাজী উৎসব উপলক্ষে সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত "শিবাজীর দীক্ষা" প্রবন্ধের সহিত একত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

৬৮। বাউল। পৃ. ৩২। [৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৫]

৬৯। বিজয়া-সম্মিলন। পৃ. ৮। [২৫ ডিসেম্বর ১৯০৫]

১৯০৬

৭০। ভারতবর্ষ। ১৩১২। পৃ. ১৫৪। [২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬]

৭১। রাজভক্তি। পৃ. ১০।

এই পুস্তিকার আখ্যাপত্রবিহীন এক খণ্ড দেখিয়াছি। "রাজভক্তি" প্রথমে প্রবন্ধাকারে রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ১৩১২ সালের মাঘ মাসের 'ভাণ্ডারে' প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাখানি এই প্রবন্ধেরই হুবহু পুনর্মুদ্রণ, কেবল পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১-১০ করা হইয়াছে।

৭২। দেশনায়ক। পৃ. ১৬। [১৮ মে ১৯০৬]

৭৩। ইংরাজি সোপান, ২য় খণ্ড। পৃ. ৩৮+৪৪। [১৫ জুন ১৯০৬]

৭৪। খেয়া। ১৮ আষাঢ় ১৩১৩। পৃ. ১৭৪। [১০ আগস্ট ১৯০৬]

৭৫। নৌকাডুবি। ১৩১৩। পৃ. ৪০২। বসুমতী সং. [২ সেপ্টেম্বর ১৯০৬]

'নৌকাডুবি' প্রথমে ১৩১৩ সালের (ইং ১৯০৬) শ্রাবণ মাসে মজুমদার লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল, মনে হইতেছে। ১৩১৩ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত মজুমদার লাইব্রেরির বিজ্ঞাপনে প্রকাশ :— "নূতন পুস্তক।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নৌকাডুবি বাঁধাই (উপন্যাস) মায় ডাক মাশুল ২।০।" কিন্তু বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা হইতে জানা যাইতেছে, ঐ বৎসরের ২ সেপ্টেম্বর বসুমতীর স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'নৌকাডুবি' প্রকাশ করেন। সম্ভবতঃ একই বৎসরে দুইটি স্বতন্ত্র সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯০৭

৭৬। বিচিত্র প্রবন্ধ। বৈশাখ ১৩১৪। পৃ. ৩২০। [১৬ এপ্রিল ১৯০৭]

৭৭। চারিত্রপূজা। পৃ. ১০৪। [২৮ মে ১৯০৭]

৭৮। প্রাচীন সাহিত্য। পৃ. ৮৭। [১৩ জুলাই ১৯০৭]

৭৯। লোকসাহিত্য। পৃ. ৮৭। [২৬ জুলাই ১৯০৭]

৮০। আধুনিক সাহিত্য। পৃ ১৬০। [১০ অক্টোবর ১৯০৭]

৮১। সাহিত্য। পৃ. ১৬৩। [১১ অক্টোবর ১৯০৭]

৮২। হাস্য-কৌতুক। পৃ. ৮৫। [১০ ডিসেম্বর ১৯০৭]

৮৩। ব্যঙ্গকৌতুক। পৃ. ৯৯। [২৮ ডিসেম্বর ১৯০৭]

১৯০৮

৮৪। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। পৃ. ১৮৯। [২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮]
নং ৬৫ দ্রষ্টব্য।

৮৫। সভাপতির অভিভাষণ পাবনা সম্মিলনী। ১৩১৪ সাল। পৃ. ৫০ [১১ এপ্রিল ১৯০৮]

৮৬। প্রহসন। পৃ. ৯৯+৪১। [১৬ এপ্রিল ১৯০৮]

৮৭। পথ ও পাথেয়। জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫। পৃ. ২১।

৮৮। রাজা প্রজা। পৃ. ১৬২। [৩০ জুন ১৯০৮]

৮৯। সমূহ। পৃ. ১২১। [২৫ জুলাই ১৯০৮]

৯০। স্বদেশ। পৃ. ১১৯। [১২ আগস্ট ১৯০৮]

৯১। সমাজ। পৃ. ১৫৮। [৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]

৯২। কথা ও কাহিনী। পৃ. ২+১২২+২+৩৫ [১০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]

৯৩। গান। পৃ. ১৬+৪০০। যোগীন্দ্রনাথ সরকার-প্রকাশিত। [২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]

৯৪। শারদোৎসব। পৃ. ১৬৭। [২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]

৯৫। শিক্ষা। পৃ. ১৪২। [১৭ নবেম্বর ১৯০৮]

৯৬। মুকুট। পৃ. ৬০। [৩১ ডিসেম্বর ১৯০৮]

১৯০৯

৯৭। ব্রহ্ম সঙ্গীত। পৃ. ৭। [২০ জানুয়ারি ১৯০৯]

৯৮। শান্তিনিকেতন, ১ম ভাগ। পৃ. ৮৯। [২৪ জানুয়ারি ১৯০৯]

৯৯। ধর্ম্ম। পৃ. ১৯৪। [২৫ জানুয়ারি ১৯০৯]

১০০। শব্দতত্ত্ব। পৃ. ১২০। [২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৯]

১০১। শান্তিনিকেতন, ২য় ভাগ। পৃ. ৯০। [২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০৯]

১০২। ঐ ৩য় ভাগ। পৃ. ৮২। [৫ মার্চ ১৯০৯]

১০৩। ঐ ৪র্থ ভাগ। পৃ. ৮৫। [১২ মার্চ ১৯০৯]

১০৪। ঐ ৫ম ভাগ। পৃ. ৭৫। [১৫ এপ্রিল ১৯০৯]

১০৫। ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ। পৃ. ৯৮। [১৫ এপ্রিল ১৯০৯]

১০৬। ঐ ৭ম ভাগ। পৃ. ৯৮। [২ জুন ১৯০৯]

১০৭। ঐ ৮ম ভাগ। পৃ. ১৪১। [১৫ জুন ১৯০৯]

১০৮। চয়নিকা। ১৯০৯। পৃ. ৪৫৯।

১৩১৬ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী'তে সমালোচিত।

১০৯। গান। ১৯০৯। পৃ. ৪০৬। ইণ্ডিয়ান প্রেস।

১৩১৬ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী'তে সমালোচিত। ১৩১৪ সালে ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, বিবিধ সঙ্গীতগুলি 'গান' নামে প্রকাশিত হয়। অপর খণ্ডটির নাম হয়—'ধর্ম্মসঙ্গীত'।

১১০। ইংরাজি পাঠ। পৃ. ৪২। [১০ সেপ্টেম্বর ১৯০৯]

১১১। ছুটির পড়া। পৃ. ১১৪। [১২ অক্টোবর ১৯০৯]

১১২। প্রায়শ্চিত্ত। পৃ. ১১৬। [১৫ অক্টোবর ১৯০৯]

১১৩। বিদ্যাসাগর-চরিত। পৃ. ৪৮।

১৩০২ ও ১৩০৫, ১৩ই শ্রাবণ শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত। ইহা ঠিক কোন্ সালে প্রকাশিত হয় জানিতে পারি নাই। ১৯০৭ সনে ইহা 'চারিত্রপূজা'

পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয়। মনে হয়, ১৯০৯ সনে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ইহা সর্ব্বপ্রথম পুস্তিকাকারে।০ আনা মূল্যে প্রকাশ করেন।

১১৪। শিশু। ১৯০৯। পৃ. ১৬১।

নং ৬১ দ্রষ্টব্য।

১১৫। ইংরাজী শ্রুতিশিক্ষা। পৃ. ৩০।

আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল দেওয়া নাই। নং ৬৩ দ্রষ্টব্য।

১৯১০

১১৬। রাজা। পৃ. ১২৮। [৬ জানুয়ারি ১৯১০]

১১৭। ব্রহ্ম সঙ্গীত। ১১ মাঘ, ৮০ ব্রহ্মসংবৎ। পৃ. ৭। [১৬ জানুয়ারি ১৯১০]

১১৮। শান্তিনিকেতন, ৯ম ভাগ। পৃ. ১১১। [২৫ জানুয়ারি ১৯১০]

১১৯। ঐ ১০ম ভাগ। পৃ. ১০৩। [২৯ জানুয়ারি ১৯১০]

১২০। গোরা, ১ম ও ২য় খণ্ড। পৃ. ৫৯৭। [১ ফেব্রুয়ারি ১৯১০]

৩ এপ্রিল ১৯০৯ তারিখে 'গোরা' আংশিকভাবে (পৃ. ১৭০) 'প্রবাসী' হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ।৶০ মূল্যে প্রচারিত হইয়াছিল। পর-বৎসর সম্পূর্ণ গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

১২১। গীতাঞ্জলি। ৩১ শ্রাবণ ১৩১৭। পৃ. ১৭৮। [৫ সেপ্টেম্বর ১৯১০]

১২২। শান্তিনিকেতন, ১১শ ভাগ। পৃ. ১১৪। [৮ অক্টোবর ১৯১০]

১৯১১

১২৩। শান্তিনিকেতন, ১২শ ভাগ। পৃ. ১০৭। [২৪ জানুয়ারি ১৯১১]

১২৪। ঐ ১৩শ ভাগ। পৃ. ১১৯। [১০ মে ১৯১১]

১২৫। আটটি গল্প। পৃ. ১৩৬। [২০ নবেম্বর ১৯১১]

১৯১২

১২৬। ডাকঘর। পৃ. ৫৬। [১৬ জানুয়ারি ১৯১২]

১২৭। ধর্ম্মশিক্ষা। ১৩১৮। পৃ. ১৪। [১৭ জানুয়ারি ১৯১২]

১২৮। ধর্ম্মের অধিকার। পৃ. ৪৩। [২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১২]

১২৯। গল্প চারিটি। পৃ. ১২০। [১৮ মার্চ ১৯১২]

১৩০। মালিনী। পৃ. ৪৯। [২৩ মার্চ ১৯১২]
নং ৪৫ দ্রষ্টব্য।

১৩১। চৈতালি। পৃ. ৬৬। [২৩ মার্চ ১৯১২]
নং ৪৫ দ্রষ্টব্য।

১৩২। বিদায়-অভিশাপ। পৃ. ২০। [১০ মে ১৯১২]
নং ৩০ দ্রষ্টব্য।

১৩৩। পাঠ সঞ্চয়। ১৩১৯। পৃ. ১৯৯। [২০ মে ১৯১২]

১৩৪। জীবন-স্মৃতি। ১৩১৯। পৃ. ১৯৫। [২৫ জুলাই ১৯১২]

১৩৫। ছিন্নপত্র। ১৩১৯। পৃ. ২৩৩। [২৮ জুলাই ১৯১২]

১৩৬। অচলায়তন। পৃ. ১৩৮। [২ আগস্ট ১৯১২]

১৯১৪

১৩৭। স্মরণ। পৃ. ৩৪। [২৫ মে ১৯১৪]
নং ৬১ দ্রষ্টব্য।

১৩৮। উৎসর্গ। ১ বৈশাখ ১৩২১। পৃ. ১১৬। [২৮ মে ১৯১৪]

১৩৯। গীতিমাল্য। পৃ. ১৩৪। [২ জুলাই ১৯১৪]

১৪০। গান। পৃ. ১৬৮। [২৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৪]
নং ১০৯ দ্রষ্টব্য।

১৪১। গীতালি। ১৯১৪। পৃ. ১১৭।

১৪২। গীতাঞ্জলি। ১৮ নভেম্বর ১৯১৪।

ইংরেজী গীতাঞ্জলির মূল গান ও কবিতাগুলি দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত।

১৪৩। ধর্ম্মসঙ্গীত। পৃ. ২০১। [২৭ ডিসেম্বর ১৯১৪]

নং ১০৯ দ্রষ্টব্য।

১৯১৫

১৪৪। শান্তিনিকেতন, ১৪শ ভাগ। ১৯১৫। পৃ. ১১৭।

১৪৫। বিচিত্র-পাঠ। ১৯১৫। পৃ. ৯২ (?)

১৪৬। কাব্যগ্রন্থ। ১৯১৫-১৬। ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।

১৯১৬

১৪৭। শান্তিনিকেতন, ১৫শ ভাগ। ১৯১৬। পৃ. ৯৪।

১৪৮। ঐ ১৬শ ভাগ। ১৯১৬। পৃ. ৮০।

১৪৯। ঐ ১৭শ ভাগ। ১৯১৬। পৃ. ৯৮।

১৫০। ফাল্গুনী। ১৯১৬। পৃ. ৮৪।

১৫১। ঘরে বাইরে। ১৯১৬। পৃ. ২৯৪।

১৫২। সঞ্চয়। ১৯১৬। পৃ. ১২৬।

১৫৩। পরিচয়। ১৯১৬। পৃ. ১৭১।

১৫৪। বলাকা। বৈশাখ ১৩২৩। পৃ. ১১৮।

১৫৫। চতুরঙ্গ। ১৯১৬। পৃ. ১২৩।

১৫৬। গল্পসপ্তক। পৃ. ২০৪।

ইহার আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল নাই। ১৩২৩ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ :— "গল্পসপ্তক :— ... পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে।"

১৯১৭—১৯৪১

[শ্রীপুলিনবিহারী সেন-সঙ্কলিত]

১৯১৭

কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। পৃ. ২০ [২২ আগস্ট]

অনুবাদ-চর্চ্চা [বাঙলা হইতে ইংরাজি]। ১৩২৪। পৃ. ১৪০।

১৯১৮

গুরু। ১লা ফাল্গুন ১৩২৪। পৃ. ৫১।

পলাতকা। অক্টোবর ১৯১৮। পৃ. ৮৮।

১৯১৯

জাপান-যাত্রী। শ্রাবণ ১৩২৬। পৃ. ১১৯। [২১ জুলাই]

১৯২০

পয়লা নম্বর। বৈশাখ ১৩২৭। পৃ. ৭১। [৫ এপ্রিল]

অরূপ রতন। মাঘ ১৩২৬। পৃ. ৭৩। [১৪ জুন]

১৯২১

শিক্ষার মিলন। ১৩২৮। পৃ. ২৩। [১৪ আগস্ট]

ঋণশোধ (শারদোৎসব)। ১৯২১। পৃ. ৯৬। [২ অক্টোবর]
নং ৯৪ দ্রষ্টব্য।

সত্যের আহ্বান।

১৯২২

মুক্তধারা। বৈশাখ ১৩২৯। পৃ. ১৩৬। [২৮ জুন]

বর্ষা-মঙ্গল। শ্রাবণ ১৩২৯। পৃ. ১৫।

লিপিকা। ১৯২২। পৃ. ১৮২। [১৭ আগস্ট]

শিশু ভোলানাথ। ১৯২২। পৃ. ৮৬। [১৫ সেপ্টেম্বর]

১৯২৩

বসন্ত। ফাল্গুন ১৩২৯। পৃ. ৩২। [৩ অক্টোবর]

১৯২৫

পূরবী। শ্রাবণ ১৩৩২। পৃ. ২৫৪।

বর্ষা-মঙ্গল। শ্রাবণ ১৩৩২। পৃ. ১২।

শেষ বর্ষণ। ভাদ্র ১৩৩২। পৃ. ১৬।

গৃহপ্রবেশ। আশ্বিন ১৩৩২। পৃ. ১০২। [১২ অক্টোবর]

সঙ্কলন। ৯ আগস্ট ১৯২৫। পৃ. ৩৮৫। [১৭ নবেম্বর]

১৯২৬

আচার্য্যের অভিভাষণ (বিশ্বভারতী বার্ষিক পরিষৎ)। ৯ পৌষ। পৃ. ৯। [১৮ ফেব্রুয়ারি]

প্রবাহিণী। অগ্রহায়ণ ১৩৩২। পৃ. ১৮০। [৫ মার্চ]

চিরকুমার সভা (নাটক)। ফাল্গুন ১৩৩২। পৃ. ২২০। [১২ এপ্রিল]

নং ৬৫ দ্রষ্টব্য।

শোধ-বোধ। পৃ. ৭৮। [১৯ জুন]

নটীর পূজা। ১৩৩৩ সাল। পৃ. ৮২। [১৫ সেপ্টেম্বর]

ঋতু-উৎসব। ১৩৩৩। পৃ. ২১৬। [২৯ সেপ্টেম্বর]

রক্তকরবী। ১৩৩৩ সাল। পৃ. ১০৩। [২৭ ডিসেম্বর]

লেখন। ৭ নবেম্বর ১৯২৬। পৃ. ৩৩।

১৯২৭

ঋতুরঙ্গ। ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪। পৃ. ৪২ ও পৃ. ৪৪।

একই তারিখে দুই আকারে বাহির হয়।

১৯২৮

পল্লিপ্রকৃতি। ফেব্রুয়ারি ১৯২৮। পৃ. ৮।

শেষ রক্ষা। জুলাই ১৯২৮। পৃ. ১৩৩। [২৫ সেপ্টেম্বর]

১৯২৯

সমবায়নীতি। (বর্দ্ধমান বিভাগীয় সমবায় সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনের অভিভাষণ)। ২৭ মাঘ ১৩৩৫। পৃ. ১৩।

যাত্রী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬। পৃ. ৩১৫। [২০ সেপ্টেম্বর]

পরিত্রাণ। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬। পৃ. ১৪১। [২৪ সেপ্টেম্বর]

যোগাযোগ। আষাঢ় ১৩৩৬। পৃ. ৪৭১। [২৮ সেপ্টেম্বর]

১৯৩০

তপতী। ভাদ্র ১৩৩৬। পৃ. ১৮৫+৩ (পরিশিষ্ট)+৯২ স্বরলিপি [২৯ জানুয়ারি]

স্বরলিপি ছাড়াও বাহির হইয়াছিল।

শেষের কবিতা। ভাদ্র ১৩৩৬। পৃ. ২৩২। [৩১ জানুয়ারি]

ইংরেজি সহজ শিক্ষা, ১ম ভাগ। পৌষ ১৩৩৬। পৃ. ৪৮।

ঐ ২য় ভাগ। চৈত্র ১৩৩৬। পৃ. ৫৮।

সহজ পাঠ, ১ম ভাগ। বৈশাখ ১৩৩৭। পৃ. ৫৩। [১০ মে]

ঐ ২য় ভাগ। বৈশাখ ১৩৩৭। পৃ. ৫১। [১০ মে]

পাঠপ্রচয়, ২য়-৪র্থ ভাগ। চৈত্র ১৩৩৬। [২৬ মে]

মহুয়া। আশ্বিন ১৩৩৬। পৃ. ১৭৫। [৫ জুন]

ভানুসিংহের পত্রাবলী। চৈত্র ১৩৩৬। পৃ. ১৫৮। [২ আগস্ট]

১৯৩১

নবীন। ৩০ ফাল্গুন ১৩৩৭। পৃ. ২৮। [১০ মার্চ]

রাশিয়ার চিঠি। বৈশাখ ১৩৩৮। পৃ. ২১৮। [২২ জুন]
গীতোৎসব। ২৮ ভাদ্র ১৩৩৮। পৃ. ২১। [১৮ সেপ্টেম্বর]
সঞ্চয়িতা। পৌষ ১৩৩৮। [৩০ ডিসেম্বর]
প্রতিভাষণ। ১১ পৌষ ১৩৩৮। পৃ. ২১।
শাপ-মোচন। পৃ. ২৭। ১৫ পৌষ ১৩৩৮।

১৯৩২

বন-বাণী। আশ্বিন ১৩৩৮। পৃ. ১৬৩। [২ জানুয়ারি]
গীতবিতান, ১ম খণ্ড। আশ্বিন ১৩৩৮। পৃ. ৩৬৪। [১০ জানুয়ারি]
ঐ ২য় খণ্ড। ঐ । পৃ. ৩৬৫-৬৬৯। ঐ
দেশের কাজ। ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২। পৃ. ৫। [২০ মার্চ]
কালের যাত্রা। ভাদ্র ১৩৩৯। পৃ. ৩৯।
গীতবিতান, ৩য় খণ্ড। শ্রাবণ ১৩৩৯। পৃ. ৬৭১-৮৬৪ [৫ সেপ্টেম্বর]
৪ঠা আশ্বিন। পৃ. ৭। [২০ সেপ্টেম্বর]
মহাত্মাজীর শেষ ব্রত। পৃ. ৮। [২৩ সেপ্টেম্বর]
পরিশেষ। ভাদ্র ১৩৩৯। পৃ. ১৬২। [২৬ নবেম্বর]
পুনশ্চ। আশ্বিন ১৩৩৯। পৃ. ১২৩। [৩০ নবেম্বর]

১৯৩৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ। জানুয়ারি ১৯৩৩। পৃ. ৩০। [১৫ মার্চ]
দুই বোন। ফাল্গুন ১৩৩৯। পৃ. ৯২। [৩০ মার্চ]
শিক্ষার বিকিরণ। পৃ. ২১। [৯ জুন]
মানুষের ধর্ম্ম। ১৯৩৩। পৃ. ১১৯। [৫ জুলাই]
চণ্ডালিকা। ভাদ্র ১৩৪০। পৃ. ৪৫। [৪ অক্টোবর]
তাসের দেশ। ভাদ্র ১৩৪০। পৃ. ৬৯। [৪ অক্টোবর]

বিচিত্রিতা। শ্রাবণ ১৩৪০। পৃ. ৬০। [৪ অক্টোবর]

ভারতপথিক রামমোহন। ২৯-৩১ ডিসেম্বর ১৯৩৬। পৃ. ৯

১৯৩৪

বাঁশরী। অগ্রহায়ণ ১৩৪০। পৃ. ১৩০। [২৫ জানুয়ারি]

মালঞ্চ। চৈত্র ১৩৪০। পৃ. ১১৩। [৩ এপ্রিল]

শ্রীভবন সম্বন্ধে আমার আদর্শ। শ্রাবণ ১৩৪১। পৃ. ৬।

শ্রাবণ-গাথা। শ্রাবণ ১৩৪১। পৃ. ২২। [১১ আগস্ট]

চার অধ্যায়। অগ্রহায়ণ ১৩৪১। পৃ. ১৩৮। [২২ ডিসেম্বর]

১৯৩৫

শেষ সপ্তক। ২৫ বৈশাখ ১৩৪২। পৃ. ১৭০। [৮ মে]

সুর ও সঙ্গতি। পৃ. ১০২। [১ আগস্ট]

ধূর্জ্জটী মুখোপাধ্যায়ের সহিত পত্রালাপ।

বীথিকা। ভাদ্র ১৩৪২। পৃ. ২৩২। [১৯ সেপ্টেম্বর]

১৯৩৬

শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ। ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬। পৃ. ৩৯।

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (স্বরলিপি সহ)। বৈশাখ ১৩৪৩। পৃ. ১০৯। [১১ মার্চ]

প্রান্তিকনী। পৌষ ১৩৪৩। পৃ. ৪৫।

পত্রপুট। ২৫ বৈশাখ ১৩৪৩। পৃ. ৬৪। [৫ মে]

ছন্দ। আষাঢ় ১৩৪৩। পৃ. ২৩৯। [১০ জুলাই]

জাপানে—পারস্যে। শ্রাবণ ১৩৪৩। পৃ. ২০৪। [২০ আগস্ট]

'জাপান-যাত্রী' পুস্তকখানি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

শ্যামলী। ভাদ্র ১৩৪৩। পৃ. ৭৭। [১৫ সেপ্টেম্বর]

সাহিত্যের পথে। আশ্বিন ১৩৪৩। পৃ. ১৭৪। [২৮ সেপ্টেম্বর]

পাশ্চাত্য ভ্রমণ। আশ্বিন ১৩৪৩। পৃ. ১৩৭। [২ অক্টোবর]

ইহাতে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর-পত্র' পরিবর্ত্তিত আকারে ও 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

১৯৩৭

খাপছাড়া। মাঘ ১৩৪৩। পৃ. ১৪৪। (২০ ফেব্রুয়ারি)

কালান্তর। বৈশাখ ১৩৪৪। পৃ. ২৪৯। (২৭ মে)

সে। বৈশাখ ১৩৪৪। পৃ. ১৪৮। (১৫ জুলাই)

ছড়ার ছবি। আশ্বিন ১৩৪৪। পৃ. ৯২। (৫ অক্টোবর)

বিশ্ব-পরিচয়। আশ্বিন ১৩৪৪। পৃ. ৯৫। (৮ অক্টোবর)

১৯৩৮

প্রান্তিক। পৌষ ১৩৪৪। পৃ. ৩৩। (৮ ফেব্রুয়ারি)

চণ্ডালিকা। নৃত্যনাট্য। ফাল্গুন ১৩৪৪। পৃ. ৩১।

পত্রধারা। ১৩৪৫ সাল। পৃ. ৩৪৯+১৫৮+১৪৮।

'ছিন্নপত্র', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' ও 'পথে ও পথের প্রান্তে'র একত্র মুদ্রণ।

পথে ও পথের প্রান্তে। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫। পৃ. ১৪৮। (৩১ জুলাই)

সেঁজুতি। ভাদ্র ১৩৪৫। পৃ. ৬২। (১০ সেপ্টেম্বর)

অভিভাষণ (শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার উদ্বোধন)। ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫। পৃ. ৮।

১৯৩৯

আকাশ-প্রদীপ। বৈশাখ ১৩৪৫। পৃ. ৭০। (৪ মে)

প্রহাসিনী। পৌষ ১৩৪৫। পৃ. ৬৫।

নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (স্বরলিপি সহ)। চৈত্র ১৩৪৫। পৃ. ১১০। (১৫ মে)

বাংলাভাষা পরিচয়। ১৯৩৮। পৃ. ১৮০। (৩০ মে)

পথের সঞ্চয়। ভাদ্র ১৩৪৬। পৃ. ৮৬।

"মহাজাতি সদন" বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিভাষণ। ১৯ আগস্ট ১৯৩৯। পৃ. ৪।

বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দির প্রবেশ-উৎসব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাণী। ৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৪৬। পৃ. ৫।

রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড। আশ্বিন ১৩৪৬। পৃ. ৬৪৫। [২৪ অক্টোবর]

শ্যামা। ভাদ্র ১৩৪৬। পৃ. ৯২। (১০ নবেম্বর)

অন্তর্দেবতা। ৭ পৌষ ১৩৪৬। পৃ. ১৩।

প্রসাদ। পৃ. ১৩। (২০ ডিসেম্বর)

১৯৪০

রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড। পৌষ ১৩৪৬। পৃ. ৬৬৪।

রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড। ২৫ বৈশাখ ১৩৪৭। পৃ. ৬৫২।

নবজাতক। বৈশাখ, ১৩৪৭। পৃ. ৯৬।

সানাই। আষাঢ় ১৩৪৭। পৃ. ১০৬।

রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড। শ্রাবণ ১৩৪৭। পৃ. ৫৬৭।

চিত্রলিপি। সেপ্টেম্বর ১৯৪০। প্লেট ১৮+১৯।

ছেলেবেলা। ভাদ্র ১৩৪৭। পৃ. ৮৭।

রবীন্দ্র-রচনাবলী—অচলিত সংগ্রহ। আশ্বিন ১৩৪৭। পৃ. ৫৫২।

রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৫ম খণ্ড। অগ্রহায়ণ ১৩৪৭। পৃ. ৫৭১।

তিন সঙ্গী। পৌষ ১৩৪৭। পৃ. ১৫১।

রোগশয্যায়। পৌষ ১৩৪৭। পৃ. ৪৭।

আরোগ্য। ৭ পৌষ ১৩৪৭। পৃ. ৬।

১৯৪১

রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড। ফাল্গুন ১৩৪৭। পৃ. ৬৭৪।

আরোগ্য। ফাল্গুন ১৩৪৭। পৃ. ৩৯।

জন্মদিনে। ১ বৈশাখ ১৩৪৮। পৃ. ৪৫।

সভ্যতার সঙ্কট। ১ বৈশাখ ১৩৪৮। পৃ. ১০।

গল্পসল্প। বৈশাখ ১৩৪৮। পৃ. ৮৪।

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। আষাঢ় ১৩৪৮। পৃ. ১৪।

রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৭ম খণ্ড। আষাঢ় ১৩৪৮। পৃ. ৫৬৩।

ইংরেজী পুস্তক-পুস্তিকা

1912

GITANJALI (Song Offerings); A Collection of Prose Translations Made By the Author From the Original Bengali with an Introduction by W. B. Yeats. London Printed at the Chiswick Press For The India Society 1912, pp. 64. Pub. by Macmillan & Co., London in March 1913.

1913

THE GARDENER : Poems tr. by the author, pp. 150.

THE CRESCENT MOON : Child-poems tr. by the author. Illustrated.

CHITRA : a drama tr. by the author from *Chitrangada.*

GLIMPSES OF BENGAL LIFE : Short stories tr. by Rajani Ranjan Sen. G. A. Natesan and Co., Madras. June 1913, pp. 240.

1914

THE KING OF THE DARK CHAMBER : a drama tr. by Kshitish Chandra Sen, I. C. S. from *Raja.*

THE POST OFFICE : a drama tr. by the Devabrata Mukherji from *Dakghar,* with a preface by W. B. Yeats. First printed at the Cuala Press, Dundrum 1914. Macmillan & Co., March 1914.

SADHANA : The Realisation of Life : Lectures delivered at the Harvard University, U. S. A., in 1912-13. Macmillan & Co., Ltd. 1920.

ONE HUNDRED POEMS OF KABIR : Tr. by Rabindranath Tagore. Introduction by Evelyn Underhill. Pub. by the India Society. London 1914. Macmillan & Co., [Feb.] 1915.

1915

THE MAHARANI OF ARAKAN : a romantic comedy in one Act, adapted by George Calderon, from the Bengali short story *Daliya* by Rabindranath Tagore. With a character sketch of Rabindranath Tagore compiled by Kedarnath Das Gupta. Illust. Pub. by Francis Griffiths, London.

1916

FRUIT GATHERING : Poems trans. The Macmillan Company, N. Y. 1913, pp. 123.

HUNGRY STONES & OTHER STORIES.

STRAY BIRDS : [Epigrams.] The Macmillan Company, N. Y. 1916, pp. 91. Illustrated by Willy Pogany.

1917

THE CYCLE OF SPRING : a drama tr. from *Phalguni.*

MY REMINISCENCES : Tr. by Surendra Nath Tagore from *Jiban Smriti.* The Macmillan Co., N. Y. [April] 1917, pp. 273.

SACRIFICE AND OTHER PLAYS.

PERSONALITY : Lectures delivered in America (1916). The Macmillan Co., N. Y. 1917, pp. 220.

NATIONALISM : Lectures delivered in Japan and the U. S. A. The Macmillan Co., N. Y.

SELECTED PASSAGES FOR BENGALI TRANSLATION : [From English into Bengali]

1918

GITANJALI AND FRUIT-GATHERING : With illustrations by Nandalal Bose, Surendranath Kar, Abanindranath Tagore and Nobendranath Tagore. The Macmillan Co., N. Y. pp 221.

LOVER'S GIFT AND CROSSING : The Macmillan Company, N. Y. January 1918, pp. 158.

MASHI AND OTHER STORIES : By Sir Rabindranath Tagore. Macmillan and Co., Ltd., London. 1918.

STORIES FROM TAGORE : The Macmillan Co., N. Y.

THE PARROT'S TRAINING : a satire on educational methods. Tr. by the author. Thacker Spink and

Co., Calcutta, 1918. With 8 drawings by Abanindranath Tagore. pp. 7.

AT THE CROSS ROADS : pp. 12. [10 July]

THE FUGITIVE : [Political Musings of the author on various topics in prose.] Santiniketan. pp. 91. [10 Dec.]

1919

THE CENTRE OF INDIAN CULTURE : Essay. Pub. by the Socy. for the Promotion of National Education, Adyar, Madras.

THE HOME AND THE WORLD : A Novel tr. by Surendranath Tagore from *Ghare-Baire.*

MOTHER'S PRAYER : pp. 6. [10 July]

THE TRIAL OF THE HORSE : pp. 7 [14 Aug.]

1921

GREATER INDIA : Essays. Tr. by Surendranath Tagore. S. Ganesan, Madras.

THE WRECK : a novel tr. from *Nauka Dubi.* Macmillan and Co., Ld., London, 1921. pp. 414.

POEMS FROM TAGORE : Introduction by C. F. Andrews. Macmillan and Co., Calcutta, pp. 117.

GLIMPSES OF BENGAL : Selected from the Letters of Sir Rabindranath Tagore 1885 to 1895. Tr. by Surendranath Tagore from *Chhinna Patra.* pp. 166.

THOUGHT RELICS : The Macmillan Co., N. Y. 1921. pp. 112.

THE FUGITIVE : Poems. The Macmillan Co., N. Y,

1922

CREATIVE UNITY : Essays and Lectures.

1924

LETTERS FROM ABROAD : Ganesan, Madras.

GORA : a novel trans. from *Gora* by W. W. Pearson.

THE CURSE AT FAREWELL : a drama, translation of *Bidaya-abhisap* in verse by Edward Thompson. pp. 64.

1925

TALKS IN CHINA : Lectures delivered in China in April and May, 1924. Visva-Bharati, pp. 157.

RABINDRANATH TAGORE : Poems tr. by Edward Thompson in verse. Ernest Benn Ltd., London. (The Augustan Books of Modern Poetry), pp. 31.

RED OLEANDERS : a drama tr. from *Rakta-Karabi.*

BROKEN TIES AND OTHER STORIES.

1926

THE MEANING OF ART : Dacca University Bulletin No. XII. Oxford University Press. pp. 16.

1928

FIREFLIES : Decorations by Boris Artzybasheff. The Macmillan Co., N. Y. pp. 274.

LETTERS TO A FRIEND : Ed. with two Introductory Essays by C. F. Andrews. Revised edn. of *Letters from Abroad,* 1924. George Allen and Unwin Ltd.

THE TAGORE BIRTHDAY BOOK : Selected from the English Works of Rabindranath Tagore. Ed. by

C. F. Andrews. Illust. Macmillan and Co, Ltd., London 1928.

LECTURES AND ADDRESSES : Ed. by Prof. Anthony X. Soares of Baroda College.

A POET'S SCHOOL : Visva-Bharati Bulletin No. 9. December, 1928, pp. 39.

1929

THOUGHTS FROM TAGORE : Ed. by C. F. Andrews. With 4 Portraits.

ON ORIENTAL CULTURE AND JAPAN'S MISSION : A Lecture delivered to the Members of the Indo-Japanese Association, at the Industrial Club, Tokyo, May 15, 1929.

1930

THE RELIGION OF MAN : The Hibbert Lectures for 1930. Septr. 1930. pp. 239.

1931

THE CHILD : A Prose-poem. George Allen and Unwin.

1932

THE GOLDEN BOAT : Poems tr. by Bhabani Bhattacharya. G. Allen and Unwin. pp. 121.

MAHATMAJI AND THE DEPRESSED HUMANITY : Visva-Bharati.

1934

MY IDEALS WITH REGARD TO THE SREE-BHAVANA : Santiniketan, July 1934, pp. 6.

1935

EAST AND WEST : Two open letters on international problems by Gilbert Murray and Rabindranath Tagore.

TWENTY-SIX SONGS OF TAGORE : Noted by Arnold A. Bake with an introduction by Arnold A. Bake and Philippe Stern together with a literal trans. from the original Poems and the free trans. of the same by Rabindranath Tagore. Paris 1935, pp. 130.

1936

EDUCATION NATURALIZED : Eng. tr. by Surendranath Tagore of a Lecture delivered under the auspices of the New Education Fellowship at the Senate Hall, Calcutta. Feb. 1936.

AN ADDRESS : At a Conference held in Calcutta on the 15 July 1936 to discuss the Communal Award. pp. 6.

COLLECTED POEMS AND PLAYS OF RABINDRANATH TAGORE. Macmillan and Co., Limited, London. 1936, pp. 578.

1937

MAN : a lecture. Andhra University Series No. 16.

CHINA AND INDIA : Pp. 6 [14 April]

SRI RAMKRISHNA CENTENARY : Parliament of Religions : Address by Rabindranath Tagore Town Hall, Calcutta 3rd March, 1937, pp. 9.

1938

CHINA AND INDIA : pp. 16 [5 May]

1940

MY BOYHOOD DAYS : An Autobiographical Sketch tr. from Bengali by Miss Marjorie Sykes, pp. 54.

রবীন্দ্রনাথ ও সেন্সাস

এবারকার সেন্সাসে (১৯৪১) কর্ত্তৃপক্ষ প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধে ২২টি প্রশ্ন করেন। তন্মধ্যে তৃতীয় প্রশ্নটি Race, Tribe or Caste বা জাতি সম্বন্ধে। বাংলা সরকার রাজনৈতিক কারণে আদেশ দেন যে, মুসলমানদের বেলায় জাতি লেখা হইবে না—যদিও বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ৫৫টি জাতি আছে। যাঁহারা মুসলমানদের মধ্যে জাতিভেদের কথা জানিতে চাহেন, তাঁহারা সার্ এডওয়ার্ড গেট প্রণীত ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের বাংলার সেন্সাস-রিপোর্ট পাঠ করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন। বাংলা সরকার আরও আদেশ দেন যে, হিন্দুদের বেলায় জাতি লিখিতে হইবে। উদ্দেশ্য—সমস্ত মুসলমানদের এক জাতি এবং হিন্দুরা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত, ইহাই প্রমাণ করা। ইহারই প্রতিকারকল্পে নিখিল-বঙ্গীয় সেন্সাস-বোর্ড নির্দ্দেশ দেন যে, সকল হিন্দু তাঁহাদের জাতিবাচক ৩নং প্রশ্নের উত্তরে নিজেদের হিন্দু-জাতি বলিয়া পরিচয় দিবেন। বহু হিন্দু নিজেদের "হিন্দু" বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলে নানা বাধা উপস্থিত হয় এবং ৩নং প্রশ্নের উত্তরে "হিন্দু"র স্থলে "জাতি নাই" বসানো হয়। অনেক স্থলে গণনাকারীদের নিজ জ্ঞানমত জাতি বসাইয়া দিতে আদেশ দেওয়া হয়। তাঁহারা সেন পদবী দেখিলেই বৈদ্যজাতিভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লইলেন। দাস পদবী দেখিলেই মেদিনীপুর জিলার মাহিষ্য, চব্বিশ পরগণায় পোদ ইত্যাদি ধরিয়া লইতে লাগিলেন। তথাপি এবারকার সেন্সাসে প্রায় শতকরা ৪০।৪৫ জন হিন্দুর তাঁহারা কোনও জাতি নির্ণয় করিতে পারেন নাই, অর্থাৎ সরকারী বাধা সত্ত্বেও অন্ততপক্ষে

শতকরা ৪০।৪৫ জন হিন্দু নিজেদের কেবলমাত্র "হিন্দু" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথকে লইয়া সেন্সাস-কর্ত্তৃপক্ষগণ বিষম গোলে পড়িলেন। তিনি নিজেকে "হিন্দু" বলিয়া পরিচয় দিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে জাতিতে "ব্রাহ্মণ" বলিয়া লিখিতে বা তাঁহার "জাতি নাই" বলিতে সাহস করিলেন না। তাঁহার enumeration slip-এ তিনি "হিন্দু"ই রহিয়া গেলেন। তাহার পর তাঁহার enumeration slip আসিল sorting centre-এ। এখন তাঁহার কি জাতি হইয়াছে, তাহা আমরা জানি না, তবে তাঁহাকে "জাতি নাই"র কোঠায় ফেলা হইবে বলিয়া চেষ্টা হয়তো হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষগণ কি রবীন্দ্রনাথের enumeration slip আলাদা করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাইবেন?

রবীন্দ্রনাথকে লইয়া সেন্সাস-কর্ত্তৃপক্ষগণ বড়ই গোলে পড়িয়াছিলেন। ২১ নং প্রশ্ন—"আপনি কতদূর পড়িয়াছেন? যে সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন বা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাহা বলুন।" রবীন্দ্রনাথ কতদূর অবধি পড়িয়াছেন? কর্ত্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথকে ব্যতিক্রমের মধ্যে ফেলিয়া সমস্যা এড়াইলেন। তাঁহারা গণনাকারীকে উপদেশ দিলেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেলায় তাঁহার বহু সম্মানসূচক উপাধির মধ্যে যে কোনও একটি লিখিলেই হইবে।"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে—

কাল চিরকুমার সভা শেষ করিয়া ফেলিয়া হাড়ে বাতাস লাগাইতেছি—এমন সময় বঙ্গদর্শনের সম্পাদকী লইবার জন্য শ্রীশ, শৈলেশ দুই ভাইয়ের নিকট হইতে বন্দুকের দুই চোঙভরা অনুরোধ আমার মস্তকে বর্ষিত হইয়াছে—কিন্তু ধরাশায়ী হই নাই। তোমাকে সম্পাদক পাকড়াও করিবার জন্য শৈলেশকে উত্তেজিত করিয়া পত্র লিখিয়াছি।
১১ই চৈত্র, ১৩০৭

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-সৃষ্টি

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বাংলা গানের ইংরেজী তর্জ্জমা দেখিয়া ইউরোপের মুগ্ধ মনীষীরা যখন তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতার সম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার এখানকার একজন ভক্তকবি দৃপ্ত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছিলেন—

জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব্ব।
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব্ব ॥

গর্ব্ব করিবার কথাই তো। কিন্তু ইউরোপের এই প্রতিভা-বিচার-সভার দুর্ভাগ্য সদস্যেরা রবীন্দ্রনাথের গানের কতটুকু বুঝিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের রসাল-সঙ্গীতের কতটুকু রস তাঁহারা আস্বাদন করিতে পারিয়াছিলেন? তাঁহারা পাইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের গানের অনবদ্য অনুবাদ এবং অমৃতনিস্যন্দী ভাবের নূতন সম্পাত-ধারা। কিন্তু ভাষা, ভাব, সুর ও ছন্দের লীলায়িত ভঙ্গিমায় রবীন্দ্রনাথের গান যেখানে দিব্য সুষমায় অপরূপ রূপে স্বপ্রকাশ হইয়াছে, সে মোহন রূপ-মাধুরীর পরিচয় কি তাঁহারা পাইয়াছিলেন? রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পূর্ণ পরিচয় তাঁহারা পান নাই—অংশত যেটুকু পাইয়াছিলেন, মাত্র সেইটুকুতেই বিস্ময়বোধ করিয়া তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে যুগশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য প্রতিভা বাংলা সঙ্গীতে নবযুগ-প্রবর্ত্তনা করিয়াছে। কীর্ত্তন, বাউল, ভাটিয়ালের মত এ সঙ্গীত বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ বহু ধ্রুপদ-খেয়াল রচনা করিয়াছেন, প্রচলিত পদ্ধতিতে সুর-সংযোজিত বহু ভক্তিমূলক গানে বাংলা দেশের সঙ্গীত-সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন, এবং সেগুলি সুরের মাধুর্য্যে, ভাবের নিবিড়তায়

ও ভাষার প্রসাদ-গুণে অপূর্ব্বসুন্দর। কিন্তু এই শ্রেণীর সঙ্গীত তাঁহার সৃষ্টি নহে, এগুলি যেন অপরের ভূখণ্ড জয় করিয়া তাহার উপর নন্দন-কানন-রচনা। এই শ্রেণীর সঙ্গীতের সুরের বহিরাবরণ গতানুগতিক ধারাকেই অবলম্বন করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার পরবর্ত্তী কালে। পরবর্ত্তী কালে তাঁহার যে শ্রেণীর সঙ্গীত গতানুগতিক ধারা অতিক্রম করিয়া স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ভাষা, ভাব ও সুরকে একাঙ্গ ও একাত্ম করিয়া আপনাকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে, প্রয়োজন বোধ করিলে চিরাচরিত প্রথার সহিত বিদ্রোহ করিয়া আপনার স্বকীয়ত্ব সকলের উপরে তুলিয়া ধরিয়াছে, সেই সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি।

এই সৃষ্টিতে তিনি যে রসের বন্যা বহাইয়াছেন, তাহা বিশদরূপে বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। সে মৃদু-সঞ্চরমান সুখ-শীতল স্রোতে ভাসমান হইয়া বাঙালী জাতি তাহার দেহ-মন পরিতৃপ্ত করিয়া ধন্য হইয়াছে। ভাবপ্রবণ, রস-পিপাসু, পুরাতন-বিতৃষ্ণ বাঙালীর কাছে রবীন্দ্রনাথের এই সঙ্গীত পরম সম্পদরূপে গণ্য হইয়াছে। এ সঙ্গীত এত আদরণীয় হইবার মূলে রহিয়াছে গান-রচনা ও সুর-রচনা—উভয় ক্ষেত্রেই রবীন্দ্র-প্রতিভার সমান স্ফুরণ। তিনি সুরের অন্তর্নিহিত রস আহরণ করিয়া ভাষা ও ভাবের আধারে ওতপ্রোত করিয়া তুলিয়াছেন। সুরের প্রতি এই অন্তর্দৃষ্টিই তাঁহার সঙ্গীতকে এইরূপ রস-সমৃদ্ধ করিয়াছে।

রাগ-রাগিণীর একটা বাঁধা-ধরা রাস্তা আছে, এই রাস্তায় চলিবার নিয়ম-কানুন না মানিলে অপরাধী হইতে হয়। এই নিয়ম না মানিয়া যে-সঙ্গীতনায়কেরা খেয়াল ও ঠুংরী গানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা সঙ্গীতের একদেশ দর্শন করিয়াছিলেন—মাত্র সুরের বৈচিত্র্যই ছিল তাঁহাদিগের লক্ষ্য, সুরের রাজত্বে তাঁহাদের যেমন ছিল প্রবল প্রতাপ—ভাষার দিকে তাঁহাদের তেমনই ছিল দীনাতিদীনের নিঃসম্বলতা। রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাই এই দুইয়ের সামঞ্জস্যে অসাধ্য সাধন করিতে পারিয়াছে।

বেহাগ বা খাম্বাজ রাগিণীতে কোমল ধৈবত প্রয়োগ করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, কিন্তু

আমার নিশীথ-রাতের বাদল-ধারা
এস হে গোপনে,
আমার স্বপন-লোকে দিশাহারা

গাহিতে গাহিতে সুর-কার কবি কোমল ধৈবতের প্রয়োগ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না, তাহা না হইলে যে তাঁহার "স্বপন-লোক"-সৃষ্টি সার্থক হয় না। ঠিক এই কারণেই তিনি যখন গাহিয়াছেন—

নিয়ো গো, নিয়ো গো,
আমার ঘুম নিয়ো গো হরণ ক'রে,

তখন ভাষা, ভাব ও সুরের ত্রিদিবে সঙ্গীত অপার্থিব সুষমার সৃষ্টি করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ জানিতেন, কোন্ রাগিণীর কোন্ অংশটুকুর মধ্যে কোন্ ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই ভাব-দ্যুতি তিনি রাগ-রাগিণীর মর্ম্মতলে প্রবেশ করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। "গানের সুরের আসনখানি" গানটিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তিনি কেদারা রাগিণীর মণি-মঞ্জুষা যেন উজাড় করিয়া দিয়াছেন।

আজ সকালে মেঘের ছায়া
লুটিয়ে পড়ে বনে,
জল ভরেছে ঐ গগনের
নীল নয়নের কোণে।

"আজ সকালে মেঘের ছায়া" যখন বনে লুটাইয়া পড়িয়াছে, তখন সুরও যেন সেই সঙ্গে বারম্বার ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে। গগনের নীল নয়নের কোণে যখন জল ভরিয়া উঠিয়াছে, কেদারা রাগিণীর নয়নের মধ্যমণিও তখন অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া গগনের প্রতি দরদী হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যম ও কড়ি মধ্যম দুইটি সুর যে কেদারা রাগিণীর দুইটি নেত্র এবং সে নেত্র-যুগলে যে অন্তঃসলিলা স্রোতোধারা প্রবহমান, কবির দৃষ্টি তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের গানে ভাব, ভাষা ও সুরের সঙ্গতি সঙ্গীত-রাজ্যে এক অভিনবত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। বর্ষা-প্রকৃতিকে কবি পূব-সাগরের পার হইতে আগত সাপুড়িয়া-রূপে দেখিয়া যে গানটি রচনা করিয়াছেন, তাহার সুরের লীলা-বৈচিত্র্য দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। সাপুড়িয়ার সাপ খেলানোর সঙ্গে সঙ্গে সাপ ও সাপুড়িয়া দুইই যেন সুরের রূপে শ্রোতার মানস-পটে মূর্ত্ত হইয়া উঠে। সাপের ধ্বনি সুরের ধ্বনির মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে, সাপের তির্য্যগ্ গতি—সুরের সরীসৃপ-গতিচ্ছন্দে রূপায়িত হইয়াছে। এমন কি সাপের ছোবলটিও "সাপ খেলানোর বাঁশি"তে অবিকৃতরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। "কুলু কুলু কুলু কুলু কল কল স্রোত"-ধ্বনি, "গভীর গুরু গুরু" মেঘের "ডমরু-রব", "অগ্নিবরণ নাগ নাগিনী"র চপল চপলা-গতি, সমুদায়ই নিখুঁতভাবে রূপপরিগ্রহ করিয়া সঙ্গীতের নবপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরে যেন একটি নূতন বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ যে কেবল প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়াই এই রস-পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা নহে ; নানা ভাবের সঙ্গীতে তাঁহার এই সৃজনী প্রতিভা ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যেখানে "সকল দুখের প্রদীপ জেলে" "ব্যথার পূজা সমাপন" করিয়াছেন, সেখানে তিনি ভীমপলশ্রী রাগিণীর করুণ-মধুর বৈশিষ্ট্যটুকুকে কৌশলে কথার উপরে কারু-কলায় সজ্জিত করিয়াছেন ; "দূরদেশী সেই রাখাল ছেলের গান" শুনিয়া মুগ্ধা অনুরাগিণীর পূর্ব্বরাগ-কাহিনী কবি যে সুরে শুনাইয়াছেন, সে শান্ত-মধুর রস সারঙ্গ রাগিণীর ভাণ্ডার হইতে বহিয়া আনিয়া ভাবের ঘরে স্থাপন করিয়াছেন ; এইরূপে তিনি ভৈরব ও বাউলে মিশাইয়া রঙ্গরসের সৃষ্টি করিয়াছেন "জয়-যাত্রায় যাও গো" সঙ্গীতে।

ছন্দোবৈচিত্র্যে, সুর-মাধুর্য্যে ও ভাব-সমৃদ্ধিতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বাংলা দেশে এক অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে। এই অভিনবত্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবার কারণ—তাঁহার মধ্যে হইয়াছিল সর্ব্বরসের সমন্বয়—তাঁহার মানস-নেত্রে ছিল সত্যদর্শী ঋষি-দৃষ্টি—এবং তাহা প্রকাশ করিবার উপযোগী লোক-বিরল প্রতিভা।

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ

ভাবিয়াছিলাম, সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের একটি জীবনী লিখিব। কিন্তু লিখিতে বসিয়া দেখিলাম, শুধু সন তারিখের হিসাব দিতে গেলেই একটা বৃহৎ অবাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়ে; আমাদের সম্পূর্ণ একটা সংখ্যাতেও কুলায় না। সুতরাং এই অতিকায় জীবনকে গণ্ডূষ-বদ্ধ করিবার বৃথা প্রয়াস না করিয়া তাঁহার আত্মজীবনী ও প্রচলিত জীবনচরিতগুলিতে যে সকল বিষয় নাই, অথবা থাকিলেও সংক্ষেপে উল্লেখমাত্র আছে, শুধু সেই সকল বিষয় সম্পর্কে নূতন এবং বিস্তৃততর উপকরণ যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিব। এই কার্য্যও কয়েক সংখ্যা ধরিয়া করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে যৌবনের মাঝামাঝি একটা বয়স পর্য্যন্ত নিজ জীবনের আংশিক সংবাদ সাহিত্য-রূপায়িত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; উক্ত স্মৃতি-পুস্তকখানি তাঁহার সাহিত্য-জীবনের ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই লিখিত হইয়াছে; আনুষঙ্গিক ভাবে অন্যান্য খবরও কিছু কিছু আসিয়া পড়িয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে 'সখা ও সাথী' (শ্রাবণ, ১৩০২, পৃ. ৭৬-৭৯) পত্রিকায় তাঁহার একটি ক্ষুদ্র জীবনী প্রকাশিত হয়, তিনি স্বয়ং পরবর্ত্তী ভাদ্র সংখ্যায় (পৃ. ১০৩-৪) উক্ত চরিত-কথার ভুলগুলি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সাধারণের দরবারে উহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম জীবনী। সেকালে যাঁহারা সঙ্গীত-চর্চ্চা করিতেন, তাঁহারা ইহারও পূর্ব্বে 'সঙ্গীত মুক্তাবলী' নামক সঙ্গীত-সংগ্রহের পরিশিষ্টে তখন-পর্য্যন্ত-বৈচিত্র্যহীন এই জীবনের পরিচয় সংক্ষেপেই জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এযুগের কৌতূহলী

পাঠকের কাছে তাহা কৌতুককর মনে হইতে পারে। এই পুস্তক ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র ২৩।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।—এই যুবক কবি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। সঙ্গীত রচনাতে কলিকাতার ঠাকুর বংশ বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। ইঁহার ব্রহ্মসঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত এবং প্রণয় সঙ্গীত শিক্ষিত বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে গীত হয়। ইঁহার সঙ্গীতে অনেক রকম নূতন সুর ও নূতন ভাব সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। ধন্য রবীন্দ্রনাথের লেখনী! কত যে সুন্দর জিনিষ ইহা হইতে বাহির হইয়াছে, এবং আরো কত যে বাহির হইবে কে বলিতে পারে। বিশুদ্ধ প্রণয় সঙ্গীত রচনা করিয়া রবীন্দ্র বাবু দেশের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ উত্তম সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়াই বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ এমত নহে; সুগায়ক বলিয়াও বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

সম্ভবত ইহাই ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের আদিমতম পরিচয়।

'সখা ও সাথী'র জীবনীটি নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম জীবনী; দুই একটি ভুল সংশোধনের দ্বারা তিনি স্বয়ং ইহার অনুমোদনও করিয়া গিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র রচনাটিতে যে সকল তথ্য আছে, অনেক পরে তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে তাহার অধিকাংশই ব্যবহার করিয়াছেন। যে দুই একটি বাদ পড়িয়াছে বা বদল হইয়াছে তাহা নিম্নে দিতেছি।

নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষক সাতকড়ি দত্তের ফরমাসে রবীন্দ্রনাথ বর্ষা-বিষয়ক যে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন, 'জীবন-স্মৃতি'তে তাহার এইরূপ পাঠ আছে—

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

'সখা ও সাথী'র পাঠ এইরূপ—

মীনগণ দীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জলে ক্রীড়া করে।

ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইহাই আদিমতম দুইটি পংক্তি বলিয়া পাঠভেদ দিলাম।

আর একটি সংবাদ এই। 'জীবন-স্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ নর্মাল স্কুলের একজন শিক্ষকের কথা এইরূপ লিখিয়াছেন—

...শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে তিনি এমন কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশতঃ তাঁহার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না।—১ম সংস্করণ, পৃ. ২৩

ইহার পর পরীক্ষাসম্পর্কীয় একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। 'সখা ও সাথী'তে এই ব্যাপারেরই এইরূপ পরিচয় পাই—

হরনাথ পণ্ডিত নামে একজন শিক্ষক এই সময়ে নর্ম্মাল স্কুলে ছিলেন। এই লোকটির প্রকৃতি বড় ভাল ছিল না; ছেলেদের সঙ্গে তিনি বড় ভাল ব্যবহার করিতেন না। রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষকের উপর হাড়ে চটা ছিলেন; কখনো ইহার সহিত কথা কহেন নাই, ক্লাসে পড়া জিজ্ঞাসা করিলেও রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তর করিতেন না। ইহার জন্য অনেক সময় তাঁহাকে খুব কঠিন শাস্তি পাইতে হইয়াছে, অনেক সময়ে উঠানে রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। সে আবার সোজা দাঁড়ান নয়, মাথা হেঁট করিয়া পিঠ বাঁকাইয়া অনেকক্ষণ এক ভাবে থাকিতে হইত। কিন্তু এত কঠিন শাস্তি দিয়াও হরনাথ পণ্ডিত রবিকে কথা বা পড়া বলাইতে পারেন নাই। তিনি মনে করিতেন, ছেলেটার কিছু হইবে না; কিন্তু যখন বৎসরের শেষে পরীক্ষায় মধুসূদন স্মৃতিরত্নের* নিকট রবীন্দ্র খুব বেশী নম্বর পাইয়া ক্লাসে ১ম কি ২য় হইলেন, তখন হরনাথ পণ্ডিত তাহা বিশ্বাসই করিলেন না। তিনি বলিলেন, 'পরীক্ষক পক্ষপাত করিয়া বেশী নম্বর দিয়াছেন। যে সারা বৎসরই কিছু পড়ে নাই সে কেমন করিয়া এত নম্বর পাইল।' রবীন্দ্রনাথের পুনরায় পরীক্ষা দিতে হইল। এবার অন্যান্য শিক্ষকদের সমক্ষে পরীক্ষা হইল। রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বের অপেক্ষাও এবার বেশী নম্বর পাইলেন।

রবীন্দ্রনাথ মুখে আমাদের বলিয়াছিলেন যে, অধ্যক্ষ খোঁড়া গোবিন্দ-বাবু স্বয়ং এই পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

'সখা ও সাথী'র এই জীবনী-প্রসঙ্গে আরও একটু কথা আছে, যাহা এখানেই লিপিবদ্ধ না করিলে হারাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এই

---

* রবীন্দ্রনাথ পরবর্ত্তী সংখ্যায় লেখকের ভুল সংশোধন করিয়াছেন; স্মৃতিরত্ন নয়, বাচস্পতি হইবে।

জীবনী পাঠ করিয়া তিনি পত্রিকার সম্পাদক ভুবনমোহন রায়কে লিখিয়াছিলেন—

আধুনিক কালের শাস্ত্র অনুসারে পিণ্ডদানের পরিবর্ত্তে জীবনবৃত্তান্ত রচনা প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু অনুরাগী ব্যক্তিগণ যখন তাঁহাদের প্রীতিভাজনের জীবদ্দশাতেই উক্ত বন্ধুকৃত্য আগেভাগে সারিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন, তখন সজীব সশরীরে তাঁহাদের প্রদত্ত সেই অন্তিম সংকার গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। প্রেতলোকের প্রাপ্য ইহলোকেই আদায় করিতে বসিলে মনে হয় ফাঁকি দেওয়া হইতেছে। ফলতঃ, এখনো আমার জীবন আমারই হস্তে আছে; আশা করি, আরও কিছুকাল থাকিবে। যখনই ইহার অধিকার ত্যাগ করিব তখন সেই পরিত্যক্ত জীবনটাকে লইয়া যাঁহার ধর্ম্মে যাহা বলে তিনি তাহাই করিতে পারেন। আপনারা যখন আমার বাল্যবিবরণ লিখিবেন বলিয়া আমাকে শাসন করিয়া গিয়াছিলেন, তখন তাহার গুরুত্ব আমি উপলব্ধি করিতে পারি নাই—এবং নিশ্চিন্ত চিত্তে সম্মতি দিয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি আপনাদের মাসিকপত্রে প্রবন্ধের শিরোভাগে নিজের নাম ছাপার অক্ষরে দেখিয়া সবিশেষ লজ্জা অনুভব করিতেছি। ছাপার কালিতে ম্লান না দেখায় এমন উজ্জ্বল নাম অল্পই আছে।—'সখা ও সাথী', ভাদ্র, ১৩০২, পৃ. ১০৩

দশ বৎসরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয়, কারণ আমরা দেখি বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে (১৩১১, পৃ. ৯৬৪-৯৮৪) তিনি স্বয়ং "কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে" লিখিয়াছিলেন। এই কাব্য-জীবনটি নানা দিক দিয়া অতিশয় মূল্যবান।

ইহারই সাত বৎসর পরে ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র হইতে ১৩১৯ সালের শ্রাবণ পর্য্যন্ত পূরা এক বৎসর কাল (১২ সংখ্যায়) 'প্রবাসী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি' বাহির হয়। 'কড়ি ও কোমল' পর্য্যন্ত আসিয়া তিনি থামিয়া যান। ইহার পর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল তিনি জীবিত ছিলেন, কিন্তু নিতান্তই দুঃখের বিষয় জয়ন্তী-'প্রতিভাষণ' (১১ই পৌষ ১৩৩৮) ও 'ছেলেবেলা'য় (ভাদ্র, ১৩৪৭) বাল্যজীবনের কয়েকটি বিস্তৃততর চিত্রাঙ্কণ ছাড়া নিজের বৈচিত্র্যময় জীবনের কাহিনী তিনি

আর শোনান নাই। দুই একটি প্রবন্ধে বা বক্তৃতায় সামান্য যেটুকু আত্মকথা উঁকি মারিতেছে, কৌতূহল নিবারণ তো দূরের কথা, তাহা আমাদের প্রয়োজনের পক্ষেই যৎসামান্য।

সুখের বিষয়, এদেশের ও বিদেশের অসংখ্য সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় ছাড়াও তাঁহার বিচিত্র জীবনের একটা ধারাবাহিক কাহিনী বাংলা-ইংরেজী অসংখ্য চিঠিপত্রে ছড়াইয়া আছে। মানুষের ইতিহাসের গোড়া হইতে আজ পর্য্যন্ত চিঠি-লিখিয়ে হিসাবে তিনি শ্রেষ্ঠ; জীবনে স্বহস্তে কত চিঠি লিখিয়াছেন, এখনও তাহার সীমা-সংখ্যা করা সম্ভব নয়। ইহার অনেকগুলিই তিনি কাটছাঁট করিয়া 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১), 'ছিন্নপত্র' (১৯১২) 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' (১৯৩০), 'পথে ও পথের প্রান্তে' (১৩৩৮), ও 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (শেষ সংস্করণ) প্রভৃতিতে মুদ্রিত করিয়াছেন। ইংরেজীতেও চিঠির সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া বহু সাময়িক-পত্রে তাঁহার এমন অনেক চিঠি ছাপা হইয়াছে, যেগুলি পুস্তকাকারে এখনও বাহির হয় নাই। 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি'-জাতীয় পুস্তকেও তাঁহার অনেক চিঠি আছে। তাহা ছাড়া, এখনও মুদ্রিত হয় নাই এমন অসংখ্য চিঠিপত্র বহু ব্যক্তির সংগ্রহে রহিয়াছে। সেগুলি একত্র হইলে রবীন্দ্রনাথের একটা ধারাবাহিক জীবনী খাড়া করা কঠিন হইবে না। কিন্তু ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে। যিনি অপেক্ষা করিবেন না, তাঁহার রবীন্দ্র-জীবনী অসম্পূর্ণ হইতে বাধ্য। সুখের বিষয় ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় অসম্পূর্ণতার ভয় উপেক্ষা করিয়াই সাময়িক-পত্রের প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, বিভিন্ন স্মৃতিকথা ও ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সাহায্যে তাঁহার 'রবীন্দ্র-জীবনী' দুই খণ্ড খাড়া করিয়াছেন। এইটিকে আশ্রয় করিয়া পরবর্ত্তী জীবনীকারদের বিশেষ

সুবিধা হইতে পারে। গত ১৭ মে তারিখের 'কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যাল গেজেটে'র বিশেষ রবীন্দ্র-জন্মদিন সংখ্যায় এবং ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি'র রবীন্দ্র-জন্মদিন সংখ্যায় রবীন্দ্র-জীবনীর যে সংক্ষেপ বিবৃতি বাহির হইয়াছে, প্রভাতবাবুর জীবনীর সংক্ষিপ্তসার হইলেও আমরা সেগুলিকেও অত্যন্ত মূল্যবান বিবেচনা করি। প্রভাত-বাবুর পুস্তক প্রকাশের পরে আবিষ্কৃত অনেক তথ্য এগুলিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'গোল্ডেন বুক অব টেগোর'-এ শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহলানবিশ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত জীবন-কাহিনীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক যে, 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা (১৩০৮ বৈশাখ ও ১৯০৭ জানুয়ারি) হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত সকল সংখ্যায়, 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি'র সকল সংখ্যায়, অধুনালুপ্ত 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার সকল সংখ্যায় এবং বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত বুলেটিনগুলিতে রবীন্দ্র-জীবনীর যে সকল উপকরণ আত্মগোপন করিয়া আছে, সেগুলি জীবনী-লেখকদের পক্ষে অপরিহার্য্য। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর যাঁহারা তাঁহার জীবনী রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহারা পূর্ব্বগামীদের সম্পত্তি আত্মসাৎ বা চর্ব্বিতচর্ব্বণ না করিয়া যদি প্রত্যেকেই এই সকল চিঠিপত্র সংগ্রহ করিয়া সেগুলি হইতে নূতন কোনও তথ্য দিবার চেষ্টা করেন, তবেই সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় একটি নির্ভরযোগ্য জীবনী রচিত হইতে পারিবে। রবীন্দ্রনাথ নানা সময়ে নানা জনের কাছে মুখে মুখে নিজের জীবনের কাহিনী বলিয়াছেন, ব্যক্তিগত রঙে রঙিন করিবার চেষ্টা না করিয়া সেগুলিও লিখিত হওয়া উচিত; প্রমাণ করিতে পারিলে ভালই, না পারিলেও ক্ষতি নাই। আমাদের হাতেও কিছু উপকরণ আছে এবং ক্রমশ আসিয়া জুটিতেছে। আমরা একে একে সেগুলি প্রকাশ করিব।

'জীবন-স্মৃতি'র ৭৬ পৃষ্ঠায় আছে—

…সেণ্টজেবিয়ার্সে আমাদের ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল, সেখানেও কোনো ফল হইল না।

উক্ত কলেজের পুরাতন খাতাপত্র হইতে সন্ধান লইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। 'রবীন্দ্র-জীবনী', 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি' ও 'ম্যুনিসিপ্যাল গেজেটে'র জন্মদিন সংখ্যায় এ বিষয়ে বিশেষ কোনও উল্লেখ নাই। প্রভাতবাবু লিখিয়াছেন, "১৮৭৫ অব্দের গোড়ায় তাঁহাকে সেণ্টজেভিয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়।" শেষোক্ত পত্রিকা দুইটিতে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ভর্ত্তি হইবার কথা আছে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের খাতাপত্র কলেজ হইতে খোয়া গিয়াছে, তবে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের খাতায় নূতন ভর্ত্তি হওয়ার সংবাদ না থাকাতে মনে হয়, তিনি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দেই ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। ১৮৭৫-৭৬ এই দুই বৎসরের রেকর্ডে সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভ্রমক্রমে "নবীন্দ্রনাথ" লেখা আছে) এই উভয় ভ্রাতার নাম পাইতেছি। দুই জন ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে একই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, তখনকার নাম ছিল ফিফ্‌থ ইয়ার বা প্রিপ্যারেটরি এণ্ট্রান্স ক্লাস। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত "ইর্‌রেগুলার" ছিলেন, প্রায়শই কামাই করিতেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের খাতায় দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রোমোশন পান নাই, সোমেন্দ্রনাথ পাইয়াছেন। সম্ভবত ইহার পরই তিনি ক্ষান্ত দিয়াছেন। অল্পদিন-পূর্ব্বে-পরলোকগত একজন বৃদ্ধ অধ্যাপক বলিতেন, দুই ভাইয়ে খুব সাজগোজ করিয়া গাড়িতে চাপিয়া স্কুলে আসিতেন।

এবারে আমাদের এই প্রসঙ্গ বিশেষভাবে লিখিবার কারণ, আমরা রবীন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনের এমন একটি পরিচয় পাইয়াছি, যাহার খবর তাঁহার কোনও জীবনী অথবা ক্রনিক্‌লে নাই। ইহা তাঁহার জীবনের সম্পূর্ণ নূতন দিক। দেশকর্ম্মী ও বাগ্মী শ্রীযুক্ত অতুল সেন আমাদিগকে

এই উপকরণ যোগাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই কর্ম্মযজ্ঞে তিনি স্বয়ং ছিলেন হোতা; এই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত চিঠিগুলিও তাঁহারই নিকট লিখিত। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সত্য প্রচারে তিনি যেরূপ অকুণ্ঠচিত্তে তৎপরতার সহিত আগাইয়া আসিয়াছেন, ওয়াকিবহাল সকল ব্যক্তিই যদি সেইরূপ তৎপরতা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে জীবনীকারদের কাজ অনেকটা সহজ হইয়া পড়ে।

গত বৎসর (১৩৪৭) বৈশাখ মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত কর্ম্মী "রবীন্দ্রনাথ" প্রসঙ্গে তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তিটি মনে হইতেছে—

দেশের জন্যে আমার যত কিছু ভাবনা, সুদূর বাল্যকাল থেকে যা আমার মনকে অবিরত আচ্ছন্ন ক'রে ছিল, ছন্দোবদ্ধরূপেই শুধু তা প্রকাশ পায়নি। আমি বরাবরই সেই ভাবনাকে রূপ দিতে চেয়েছি কাজে। এর জন্যে সর্ব্বস্ব পণ করেছিলাম। আমার সর্ব্বস্ব খুব বেশি ছিল না; যতটুকু ছিল, ততটুকুই নিঃশেষে উজাড় ক'রে পরীক্ষার কাজ চালিয়েছি। সমধর্ম্মী ব্যক্তির সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাব হয়নি। ভিক্ষাপাত্র হাতে খালি পায়ে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছি পথে পথে, দেশের লোকের প্রাণে সাড়া জাগাবার জন্যে দিনের পর দিন কত অজ্ঞাত অখ্যাত জায়গায় সভা ক'রে বক্তৃতা দিয়ে ফিরেছি। এক মুহূর্ত্ত নিশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না।...আমাদের কাজ ছিল কি? কি ছিল না, তাই ভাবি। জাতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগে দৃষ্টি ছিল আমাদের। দেশীয় বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ ক'রে দেশীয় সমবায় ভাণ্ডার পর্য্যন্ত সব কিছুরই পত্তন করেছিলাম। শিল্প ও সাহিত্যের প্রসারচেষ্টা তো ছিলই, পল্লীমঙ্গল, পল্লীসংগঠন, বৈজ্ঞানিক শিক্ষাবিস্তার, কুটীরশিল্প ও কলকারখানার সাহায্যে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের যাবতীয় দ্রব্যনির্ম্মাণ—আমরা করিনি কি?

এই উক্তিটি নিতান্তই কথার কথা থাকিয়া যাইত, যদি না আমরা প্রমাণ পাইতাম। শেষ-জীবনের প্রমাণ—শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন ও বিশ্বভারতী; স্বদেশী যুগের প্রমাণ—রাখিবন্ধন, শিবাজি উৎসব, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রভৃতি। কিন্তু "ব্যাধি ও প্রতিকার" * লিখিয়া যে দিন তিনি উগ্র স্বাদেশিকতা বর্জ্জন করিয়া আত্মস্থ হইয়াছিলেন, যখন রাষ্ট্রমঞ্চে তাঁহার নীরবতা ও

* প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩১৪, পৃ. ২৩৫-২৪৩।

নিষ্ক্রিয়তাকে লোকে বিশ্বমুখিতা ও স্বদেশবিমুখতা বলিয়া ভুল করিয়াছিল, সেই পরিণত প্রৌঢ় বয়সে "স্বদেশী সমাজে"র লেখক কি সত্যই দেশের কাজ হইতে নিরস্ত হইয়াছিলেন? এই প্রশ্নের জবাব নিম্নে পাওয়া যাইবে।

কোনও বিষয়েই অতিরিক্ত বাড়াবাড়িকে শান্ত সংযত ভদ্র রবীন্দ্রনাথ অপছন্দ করিতেন। আতিশয্য বস্তুটিকে তিনি আজীবন পরিহার করিয়া চলিয়াছিলেন। স্বদেশী যুগের উগ্র মাদকতায় বস্তু অপেক্ষা ফেনা, কাজ অপেক্ষা বচনের আধিক্য যখন প্রকাশ পাইল, তখন রবীন্দ্রনাথ আপন স্বভাববশেই জনগণের পথ পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র পথ ধরিলেন; সে পথ কর্ম্মবিমুখতা বা নিষ্ক্রিয়তার পথ নয়। শান্তিনিকেতন আশ্রমকেই কেন্দ্র করিয়া তিনি স্বদেশ সম্বন্ধে আপন কর্ত্তব্য পালন করিবার চেষ্টা পাইলেন। ইহার পূর্ব্বেই দেশের হিতকর নানা বিফল প্রযত্নে তিনি বহু অপব্যয় করিয়া বসিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনে ধীরে সুস্থে একেবারে গোড়া বাঁধিয়া কাজ সুরু করিলেন। "ব্যাধি ও প্রতিকারে" তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন—

> দেশের যে সকল যুবক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি একটি মাত্র পরামর্শ এই আছে, সমস্ত উত্তেজনাকে নিজের অস্থিমজ্জার মধ্যে নিস্তব্ধভাবে আবদ্ধ করিয়া ফেল, স্থির হও, কোনো কথা বলিয়ো না, অহরহ অত্যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা নিজের চরিত্রকে দুর্ব্বল করিয়ো না। আর কিছু না পারো খবরের কাগজের সঙ্গে নিজের সমস্ত সম্পর্ক ঘুচাইয়া যে কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনো দিন ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা কর, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎসংসারের অবজ্ঞার অধিকারী নহে। অজ্ঞান তাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে; সেই সকল ভয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও। তাহাকে অন্যায় হইতে, অনশন হইতে, অন্ধসংস্কার হইতে রক্ষা কর।... আমরা শিক্ষিত কয়েকজন এবং আমাদের দেশের বহু কোটি লোকের মাঝখানে একটা মহাসমুদ্রের ব্যবধান। ত্রেতাযুগের সেতু বন্ধনে কাঠবিড়ালী যতটুকু কাজ করিয়াছিল আমাদের মাঝখানের এই সমুদ্রে সেতু বাঁধিতে আমরা ততটুকুও করি নাই।

তিনি নিজেই ছোট আকারে এই কাজ আরম্ভ করিলেন এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর পাবনা অধিবেশনের সভাপতিরূপে যুবকদিগকে বাংলা দেশের হিন্দু-মুসলমান মিলন ও বাংলা দেশের পল্লীর উন্নতির জন্য হাতে কলমে কাজ করার উপদেশ দিলেন, এবং সর্ব্বশেষে স্বয়ং জমিদার হইয়া বাংলা দেশের জমিদারদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

তাই দেশের জমিদারদিগকে বলিতেছি, হতভাগ্য রায়ৎদিগকে পরের হাত এবং নিজের হাত হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত শিক্ষিত, সুস্থ ও শক্তিশালী করিয়া না তুলিলে কোনো ভাল আইন বা অনুকূল রাজশক্তির দ্বারা ইহারা কদাচ রক্ষা পাইতে পারিবে না। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র সকলেরই জিহ্বা লালায়িত হইবে। এমনি করিয়া দেশের অধিকাংশ লোককেই যদি জমিদার, মহাজন, পুলিস, কানুনগো, আদালতের আমলা, যে ইচ্ছা সেই অনায়াসেই মারিয়া যায় ও মারিতে পারে তবে দেশের লোককে মানুষ হইতে না শিখাইয়াই রাজা হইতে শিখাইব কি করিয়া?

ইহার পর কেমন একটা ওলট-পালট হইয়া গেল; কবি কাব্য-সৃষ্টির আনন্দে আত্মহারা হইলেন; সাহিত্য-সৃষ্টির এমন প্রচণ্ড প্রেরণা ও বেগ তিনি নিজের জীবনে আর কখনও এরূপ ভাবে অনুভব করেন নাই। 'গীতাঞ্জলি'র যুগ সুরু হইল এবং দেশপ্রেমিক কবি ধীরে ধীরে পশ্চিমের দিকে, বিশ্বের দিকে মুখ ফিরাইলেন। এই যুগের সাধনার পুরস্কার লাভ করিয়া যখন তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন দেশও শান্ত হইয়াছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মন হইতে বাংলা দেশের পল্লীর উন্নতির কথা একদিনের জন্যও যে মুছে নাই, তাহার প্রমাণ তিনি লণ্ডনে বসিয়াই সুরুল-শ্রীনিকেতনের পত্তন করিয়াছিলেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ (১৯১৪ এপ্রিল) শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা হইল এবং পাবনা সম্মিলনীতে তিনি বাংলা দেশের জমিদার-সম্প্রদায়কে যে কাজের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, নিজেই তাহার পথপ্রদর্শক হইলেন। কিন্তু

যে কারণেই হউক, তিনি যাহা করিতে চাহিতেছিলেন, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে তাহা বাধাগ্রস্ত হইতে লাগিল; সম্ভবত এই দুই স্থান তাঁহার জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল না বলিয়া তাঁহার কল্পনা কর্ম্মে স্ফূর্ত্তি পায় নাই। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে আমরা তাঁহাকে কলিকাতার বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সহিত যুক্ত দেখিতে পাই। ইঁহাদের উদ্যোগে ১৩২১ বঙ্গাব্দের ১২ মাঘ (জানুয়ারি ১৯১৫) ও ১ ফাল্গুন (১৩ ফেব্রুয়ারি) ও ১৪ চৈত্র (২৮ মার্চ) পর পর তিনটি সভা হয়। দ্বিতীয় বক্তৃতাটি "কর্ম্মযজ্ঞ" নামে ফাল্গুনের (১৩২১) 'সবুজপত্রে' এবং তৃতীয় বক্তৃতাটি "পল্লীর উন্নতি" নামে বৈশাখের (১৩২২) 'প্রবাসী'তে বাহির হয়। বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কর্ম্মপদ্ধতি রবীন্দ্রনাথ এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া দেন—

> ১। নিরক্ষরদিগকে অন্ততঃ যৎসামান্য লেখাপড়া ও অঙ্ক শিখানো। ২। ছোট ছোট 'ক্লাস' ও পুস্তিকা প্রচার দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা, সেবাশুশ্রূষাদি সম্বন্ধে শিক্ষাদান। ৩। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, নানাবিধ অজীর্ণ ও উদরাময় রোগ প্রভৃতির প্রতিষেধের জন্য সমবেত চেষ্টা। ৪। শিশুমৃত্যু নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ ও অবলম্বন। ৫। গ্রামে উৎকৃষ্ট পানীয় জলের ব্যবস্থা। ৬। গ্রামে গ্রামে যৌথ ঋণদান সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও দরিদ্র লোকদিগকে ইহার উপকারিতা প্রদর্শন। ৭। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মড়ক প্রভৃতির সময়ে দুঃস্থদিগকে বিবিধপ্রকারে সাহায্য।

"কর্ম্মযজ্ঞে" তিনি বলিলেন—

> আজ পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যশালী জাতিরা ঐশ্বর্য্য ভোগ করচে, কিন্তু তিনি আমাদের জন্ম দিয়েচেন জীর্ণ কন্থার উপরে—আমাদের তিনি ভার দিয়েচেন দুঃখ দারিদ্র্য দূর করবার। তিনি বলেচেন—অভাবের মধ্যে তোমাদের পাঠালুম, অজ্ঞানের মধ্যে পাঠালুম, অস্বাস্থ্যের মধ্যে পাঠালুম, তোমরা আমার বীরপুত্র সব।

শ্রীযুক্ত অতুল সেন ঠিক এই সময়ে এক দল এই-জাতীয় "বীরপুত্রে"র নেতাস্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা একদিন হৃদয়াবেগবশতই অগ্নিবীণার তারে ঝঙ্কার তুলিয়াছিলেন। অতুলবাবু তখন বাগনান উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। দীর্ঘকাল স্বদেশীয়ানার চর্চ্চা করিয়া শান্ত হইয়া তিনিও একটা কিছু করিবার জন্য চটফট করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ "পল্লীর উন্নতি"তে যখন বলিতেছিলেন—

এই হচ্চে সেই গ্রামের মাটি, যে আমাদের মা, আমাদের ধাত্রী, প্রতিদিন যার কোলে আমাদের দেশ জন্মগ্রহণ করচে। আমাদের শিক্ষিত লোকদের মন মাটি থেকে দূরে দূরে ভাবের আকাশে উড়ে বেড়াচ্চে—বর্ষণের যোগের দ্বারা তবে এই মাটির সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক হবে। যদি কেবল হাওয়ায় এবং বাষ্পে সমস্ত আয়োজন ঘুরে বেড়ায় তবে নূতন যুগের নববর্ষা বৃথা এল। বর্ষণ যে হচ্চে না তা নয়, কিন্তু মাটিতে চাষ দেওয়া হয়নি। ভাবের রসধারা যেখানে গ্রহণ করতে পারলে ফসল ফল্‌বে সেদিকে এখনো কারো দৃষ্টি পড়চে না। সমস্ত দেশের ধূসর মাটি, এই শুষ্ক তপ্ত দগ্ধ মাটি, তৃষ্ণায় চৌচীর হয়ে ফেটে গিয়ে কেঁদে ঊর্দ্ধপানে তাকিয়ে বলচে, তোমাদের ঐ যা-কিছু ভাবের সমারোহ, ঐ যা-কিছু জ্ঞানের সঞ্চয় ওত আমারই জন্যে—আমাকে দাও; আমাকে দাও!—সমস্ত নেবার জন্যে আমাকে প্রস্তুত কর। আমাকে যা দেবে তার শতগুণ ফল পাবে। এই আমাদের মাটির উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস আজ আকাশে গিয়ে পৌঁচেছে, এবারে সুবৃষ্টির দিন এল বলে, কিন্তু সেই সঙ্গে চাষের ব্যবস্থা চাই যে।

তখন কর্ম্মী অতুলচন্দ্রও 'চাষের ব্যবস্থা'র জন্য উন্মুখ হইয়া ছিলেন।

এই কর্ম্মপদ্ধতি এবং মনোবৃত্তি লইয়া রবীন্দ্রনাথ তখন 'সবুজ পত্রে'র নিরেট সাহিত্যিক আবেষ্টনীর মধ্যেও সুখ পাইতেছিলেন না; 'বলাকা'র কবিতা এবং 'ঘরে বাইরে'র কাহিনীর মধ্যে কোথায় যেন অতৃপ্তি থাকিয়া যাইতেছিল। সুবৃষ্টির দিন আসা সত্ত্বেও শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতনের মাটিতে চাষের ব্যবস্থা না হওয়াতে তিনি মনে মনে বেদনা বোধ করিতেছিলেন। প্রভাতবাবু লিখিয়াছেন—

শান্তিনিকেতনের উপর মনের বিরূপতা খুবই তীব্র।...তিনি আশ্রয় লইলেন শিলাইদহে, সঙ্গে পিয়ার্সন।...প্রজাদের মধ্যে আসিলেন বহুবৎসর পরে। দিন বারো শিলাইদহে কাটাইলেন (১৬ই জুলাই—২৮শে জুলাই [১৯১৫])।

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় ইতিমধ্যেই ভাবের সঙ্গে কর্ম্মের যোগ-সাধন ঘটিয়া গিয়াছে; কবি ও কর্ম্মী মিলিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অতুল সেন তাঁহার দলবল সহ রবীন্দ্রনাথের জমিদারি কালিগ্রাম পরগণায় রবীন্দ্রনাথের আদর্শে পল্লীর উন্নতিসাধন করিতে আসিয়াছেন। "স্বদেশী সমাজে"র আদর্শ, হিতসাধন মণ্ডলীর আদর্শ এতদিনে রবীন্দ্র-নাথের উদ্যোগে তাঁহার জমিদারিতেই রূপগ্রহণ করিতে চলিয়াছে।

কবির মনে নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। এই উৎসাহের বশে রবীন্দ্রনাথ একবার কাশ্মীর পর্য্যন্ত সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহে, শান্তিনিকেতনে না গিয়া একেবারে শিলাইদহে উপস্থিত হইলেন। পল্লী-উন্নয়নের কাজ তখন আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহাদের বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ শুধু বাক্‌সর্ব্বস্ব কবি, পৃথিবীর কবিসম্প্রদায়ের মত পদ্ম-খাদক (Lotus-Eater) তাঁহারা শুনিলে আশ্বস্ত হইবেন যে, তিনি কেবল "স্বদেশী সমাজ" লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, "স্বদেশী সমাজে"র রূপ দিবারও প্রয়াস করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে সেদিন যিনি তাঁহার প্রধান সহযোগী ছিলেন, তাঁহার প্রদত্ত খসড়া হইতেই এই অনুষ্ঠানের ব্যাপকতা ও পরিধি সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিব। এই খসড়া ও তাঁহাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি হইতেই আমরা এই বিস্তৃত ব্যাপারের একটা পরিচয় দিতে চেষ্টা করিতেছি। হিতসাধন-মণ্ডলীর কর্ম্মপদ্ধতি সাত দফা এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে।

কালিগ্রাম পরগণা ঠাকুরবাবুদের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত—রাজশাহী ও বগুড়া জিলার আত্রাই, রঘুরামপুর, রাণীনগর, সান্তাহার, তিলকপুর, আদমদীঘি, নসরৎপুর ও তালোরা—এই কয়টি রেল-স্টেশনকে ঘিরিয়া এই পরগণা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে অনেক শত মাইল ব্যাপিয়া। অতুল সেন হইলেন প্রধান কর্ম্মী, শ্রীযুক্ত উপেন ভদ্র, বিশ্বেশ্বর বসু প্রভৃতি ছিলেন তাঁহার সহকারী। সঙ্গে অতুলবাবুর কর্ম্মীসঙ্ঘ। কবিনির্দ্দিষ্ট কাজের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত পাঁচটি : (১) যথাযোগ্য চিকিৎসা-বিধান, (২) প্রাথমিক শিক্ষাবিধান, (৩) পাবলিক ওয়ার্ক্‌স অর্থাৎ কূপ খনন, রাস্তা প্রস্তুত ও মেরামত, জঙ্গল সংস্কার প্রভৃতি, (৪) ঋণদায় হইতে দরিদ্র চাষীকে রক্ষা, ও (৫) সালিশীবিচারে কলহের নিষ্পত্তি।

প্রথমে কাজ আরম্ভ হয় তিনটি কেন্দ্রে; পতিসর, কামতা ও

রাতোয়ালে। তিনটি হাসপাতাল ও ঔষধালয় স্থাপন করিয়া বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ চলিতে থাকে, হাসপাতালে যথারীতি ডাক্তার ও দুই একটি "বেডে"রও ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল সৎকার্য্যের ব্যয়ভার অংশত জমিদার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ও অংশত প্রজারা বহন করিতেন; খাজনার টাকা-পিছু এক আনা তিনি দিতেন, প্রজারা দিত এক আনা। আর এক উপায়েও অর্থসংগ্রহ হইত। আমাদের দেশের রীতি এই যে (হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে) কোনও ব্যক্তি সামাজিক কোনও অপরাধ করিলে তাহাকে সামাজিকভাবে বেশ কিছু অর্থদণ্ড দিয়া নিষ্কৃতি পাইতে হয়। সেই অর্থে একটা সামাজিক ভোজের আয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথের ব্যবস্থায় সাধারণ ফণ্ডে সামান্য কিছু চাঁদা দিয়াই এই বিরাট ব্যয়ের হাত হইতে অপরাধীরা নিষ্কৃতি পাইত। সাধারণ ফণ্ডের টাকা এই সকল সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইত।

দুই শতাধিক অবৈতনিক নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিভিন্ন কেন্দ্রে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ আরম্ভ হয়। রাত্রির এবং দিনের (Day and Night) উভয়বিধ বিদ্যালয়েরই বন্দোবস্ত হয়; শিশু এবং বয়োবৃদ্ধ সকলেরই জন্য ব্যবস্থা করা হয়। নিরক্ষরতা দূর করার কাজ শেষ হইলেই পড়া, লেখা ও পাটিগণিত (Reading, Writing, Arithmetic) শিক্ষার কাজে হাত দেওয়া হইত। এই শিক্ষা কিছু অগ্রসর হইলেই বক্তৃতা দ্বারা ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতির পাঠ দেওয়া চলিত। প্রধান লক্ষ্য থাকিত ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোল, আনুষঙ্গিকভাবে পৃথিবীর ইতিহাস ভূগোলও তাহাদিগকে শিখানো হইত। ইহার সঙ্গে মুখে মুখে আকস্মিক বিপদে প্রাথমিক সাহায্য (first aid), কৃষিকর্ম্মের সুবন্দোবস্ত, অগ্নিনির্ব্বাপণ, বন্যার সময় কর্ত্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কেও তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। অবসরসময়ে পৃথিবীর খবরাখবর শোনানোর ব্যবস্থা ছিল।

তৃতীয় উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাবলিক ওয়ার্ক্‌স সম্বন্ধে দরিদ্র পল্লীবাসীদের সজাগ করিয়া কাজে নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই কার্য্যে ব্যয় অত্যন্ত অধিক। পুকুর প্রতিষ্ঠা, কূপ খনন, রাস্তা মেরামত ও প্রস্তুত, জঙ্গল সাফ—প্রত্যেকটিই ব্যয়সাধ্য কাজ। চাঁদা তুলিয়া যে এই কার্য্য করা যাইবে, চাষীদের অবস্থা তেমন সঙ্গতিপন্ন নহে। সুতরাং অতুলবাবু একটি সুচিন্তিত স্কীমের আশ্রয় লইলেন। স্কীমটি কবির সানন্দ সমর্থন লাভ করিল। প্রজাদের নিকট হইতে কায়িক পরিশ্রমরূপ চাঁদা লওয়া হইতে লাগিল, অর্থাৎ এই সকল কাজে তাহারা "জন" খাটিতে লাগিল। যাহাদের সেইরূপ সামর্থ্য ছিল না অথচ সঙ্গতি ছিল, তাহারা প্রত্যেকে এক একজন "জনে"র মজুরি দিতে লাগিল। এইরূপে মাত্র সাত আট মাসের মধ্যেই কালিগ্রাম পরগণায় বহু সহস্র টাকার কাজ করা সম্ভব হইয়াছিল। বাংলা দেশের কোথায়ও ইতিপূর্ব্বে প্রজাদের সমবেত চেষ্টায় আর এইরূপ হয় নাই।

চতুর্থ উদ্দেশ্য—ঋণদায় হইতে বিপন্ন প্রজাদের রক্ষা; ইহাও কালিগ্রামে সম্ভব হইয়াছিল। ইহার স্কীমটি সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথের। অথচ বাংলা দেশে একটা জনশ্রুতি আছে, রবীন্দ্রনাথ অতিশয় অত্যাচারী জবরদস্ত জমিদার ছিলেন, ঋণের দায়ে প্রজার ফসল পর্য্যন্ত গায়ের জোরে ঘরে তুলিতেন। ইহা অপেক্ষা নির্লজ্জ মিথ্যা আর কিছু হইতে পারে না। এই মিথ্যা অপবাদ রটিবার একটা হেতু ছিল। তাহাই বলিতেছি। প্রজারা স্বভাবতই নিঃস্ব; এক বৎসরের ফসলে পর-বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদের চলে না; কারণ মাঝখানে কাবুলী অথবা কাবুলীপ্রবৃত্তিসম্পন্ন মহাজন বসিয়া থাকে। শুধু সুদের দায়ে ফসল যায়, ঋণ যেমনকার তেমনই রহিয়া যায়। চাষী প্রজা বৎসরের কয়েক মাসই প্রায় অনশনে কাটায়। ইহার প্রতিকারার্থ রবীন্দ্রনাথ

এক উপায় উদ্ভাবন করেন। স্টেট হইতে প্রজাদিগকে ঠিক প্রয়োজন মাফিক শতকরা নয় টাকা হারে ঋণ দেওয়া হইতে লাগিল। প্রয়োজন মাফিক এইজন্য যে, অনেক সময় তাহারা বুঝিতে না পারিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঋণ লইয়া বিলাসে তাহা ব্যয় করিয়া বিপন্ন হইয়া পড়ে। যেমন, পূর্ব্বে উল্লিখিত সামাজিক দণ্ডের ব্যাপারে প্রজারা অনেক সময় ধোপা নাপিত বন্ধ হইবার ভয়ে বেহিসাবীরূপ ভোজনদক্ষিণা দিতে স্বীকৃত হইয়া বিপন্ন হইত। অতুল সেনের কর্ম্মীসঙ্ঘ হিসাব করিয়া এই প্রয়োজন নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন; এবং ভোজনদক্ষিণার পরিবর্ত্তে সাধারণ ফণ্ডে কিছু চাঁদা লইয়াই তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দিতে লাগিলেন। বেতনভোগী নায়েবদের হাতে ছাড়িয়া দিলে অনাচার হইবার সম্ভাবনা ছিল। ঋণ লইয়া চাষী চাষ করিল। ফসল কিন্তু তাহার ঘরে উঠিল না, ঋণশোধ বাবদ স্টেট তাহা গ্রহণ করিল; এই সময়ে শতকরা তিন টাকা সুদ সর্ব্বক্ষেত্রেই মাফ করা হইত অর্থাৎ প্রজাকে শতকরা ছয় টাকা সুদ দিতে হইত। ফসলের দাম হিসাব করিয়া ঋণ শোধ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, প্রজা তাহা ঘরে লইয়া যাইতে পারিত। যদি টান পড়িত, তাহা হইলে তাহা প্রায়ই মাফ করা হইত। ইহার পর ঋণমুক্ত প্রজা পুনরায় প্রয়োজনমত ঋণ লইবার অধিকারী থাকিত। ইহাতে চক্রবৃদ্ধি হারে সর্ব্বনাশা সুদের কবল হইতে তাহারা সর্ব্বদাই রক্ষা পাইত। এই স্কীম এতদূর পর্য্যন্ত সফল হইয়াছিল যে, কালিগ্রাম পরগণায় অন্যান্য মহাজনদের, বিশেষ করিয়া কাবুলীপন্থী মহাজনদের ব্যবসায় অচল হইয়াছিল। স্টেটের এমনই সুনাম হইয়াছিল যে, কোনও প্রজা অন্য কোনও মহাজনের নিকট টাকা ধার করিতে গেলেই মহাজন বলিত, বাপ রে, স্টেট হইতে যে ঋণ পায় নাই, তাহাকে ঋণ দিব কোন্ সাহসে? অর্থাৎ স্টেট যাহাকে ঋণ না দেয়, তাহার নিশ্চয়ই

কোনও গলদ আছে। এই ব্যবস্থার ফলে কালিগ্রাম পরগণার প্রজারা বহুদিনের দুঃসহ ঋণের বোঝা হইতে ধীরে ধীরে মুক্তি পাইতেছিল। রবীন্দ্রনাথের যে অপবাদ রটিয়াছিল, তাহা জমিদারের বাড়িতে ওই ফসল উঠানো লইয়া।

পঞ্চম উদ্দেশ্য—সালিশী দ্বারা কলহের নিষ্পত্তি। এইরূপ সালিশীর ব্যবস্থা ঠাকুর স্টেটে অল্পবিস্তর পূর্ব্ব হইতেই ছিল। এবারে এই কার্য্যের ভার অতুলবাবু গ্রহণ করিলেন। প্রজাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে ব্যাপারটা তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করা হইত। তিনি বিচারবুদ্ধিমত সুরাহা করিয়া দিতেন। এই কার্য্যে প্রজারা এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিল, সম্ভবত মামলার অপব্যয়ের হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছিল বলিয়াই, যে, তাহারা অতুলবাবুকে হিন্দু মুসলমান ভেদে যথাক্রমে অতুলবাবু মশাই—রাজাবাবুর প্রতিনিধি এবং মৌলানা রতুলবাবু বলিত। রবীন্দ্রনাথই রাজাবাবু ছিলেন। এই স্কীম যতদিন চলিয়াছিল, ততদিন এবং তাহার পরেও অনেক বৎসর এই পরগণা হইতে একটি মামলাও সদরে যাইতে পারে নাই। ১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী কাগজপত্র হইতে ইহা প্রমাণিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু স্বপ্নই দেখেন নাই, সুবৃহৎ পরিসরে তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজও আরম্ভ করিয়াছিলেন—এই সংবাদটি নানা কারণে তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার এই দিকটি অজ্ঞাত থাকায় আমাদেরই ক্ষতি হইয়াছে; বাংলা দেশ তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার সুযোগ পায় নাই। অজ্ঞাত থাকার আর একটি কারণ, যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনাকে রূপ দিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, বৎসরাধিক কালের মধ্যে নেতা অতুল সেন সহ তাঁহারা সকলেই রাজরোষে পতিত হইয়া

অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এখানে ওখানে অন্তরায়িত ও নজরবন্দী হইয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের এই কর্ম্মযোগের দিকটা দেশের লোকের কাছে প্রচারের সুযোগ পান নাই। তাঁহাদের শৃঙ্খল যখন উন্মোচিত হইয়াছিল অর্থাৎ তাঁহারা যখন দেশের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিয়াছিলেন, দেশের আবহাওয়া তখন আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; নন্-কো-অপারেশনের বন্যায় দেশ প্লাবিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে পাড়ি দিয়াছে।

এই যুগের কিছু দলিল অতুল সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র-গুলির মধ্যে আছে। এবারে সেগুলি দাখিল করিতেছি। এই পত্রগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কর্ম্মস্পৃহা, কর্ম্মপদ্ধতি ও স্বদেশের কল্যাণের জন্য যে ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথেরই উপযুক্ত, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা—তাঁহার স্বদেশবাসীরা—নিজেদের দোষে সেই কল্যাণকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছি।

(১)

ওঁ

[পদ্মাচর]
[অগ্রহায়ণ, ১৩২২]

কল্যাণীয়েষু

কালিগ্রামের কাজ সম্বন্ধে আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল—এমন কি রাত্রে ঘুম থেকে জেগে আমি ঐ কথা আলোচনা করে ঘুমতে পারিনি। তোমার চিঠি পেয়ে মনটা সুস্থ হল। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহ নিয়ে এখানে এসেচি তাই কয়েকদিন নদীর উপরে থেকে একটু সুস্থ হয়ে নেবার চেষ্টায় আছি। এখানেও প্রজাদের নানা দরবার উপস্থিত

হয়েছে তাই সমস্ত না সেরে নড়তে পারচিনে। কাজকর্ম্মের প্রণালী সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে মোকাবিলায় বসে ঠিক করা যাবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২)

ওঁ

পদ্মাচর

কল্যাণীয়েষু

অতুল, হঠাৎ আমার অন্যত্র ডাক পড়েছে। কলকাতায় এক জায়গায় আমি বক্তৃতা করতে প্রতিশ্রুত ছিলুম সে কথা কিছুই মনে ছিল না, কিন্তু যাদের কাছে আমি প্রতিশ্রুত এ সম্বন্ধে তাদের স্মরণশক্তি আমার চেয়ে প্রবল তাই যেতে হচ্চে। তার পরে বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আমার একটি প্রস্তাব আছে, সেটি কোনো একটি সভায় পাঠ করতে হবে।* কোনো ফল হবে কিনা জানিনে কিন্তু ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কাজ করবার উপদেশ আছে—অন্তত একটা ফল পাবার আশা আছে। সেটা হচ্চে গালি।

তার পর আমার বিদ্যালয়। ৭ই পৌষ আসচে—সে কাজটি এড়াবার জো নেই। অতএব ৭ই পৌষের পর তোমাদের কাছে শীতভোর থাকবার কথা রইল। তাড়াতাড়ি দুচারদিন গিয়ে কোনো কাজ হবে না।

এ কয়দিন যাবার উদ্যোগ করছিলুম বলে চিঠির জবাব দিতে পারিনি।

* "শিক্ষার বাহন" বক্তৃতা, ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩২২ (১০ ডিসেম্বর, ১৯১৫)—রামমোহন লাইব্রেরি।

উপেন লিখেছিল সে আমাকে Strindburgএর কোন একটি বই পাঠাচ্চে। আশা করি পাঠায়নি। কারণ পাইনি। ডাকঘরে সাহিত্যানুরাগী লোক অনেক আছে, বার বার তার পরিচয় পাওয়া গেছে—সেটা আনন্দের বিষয়—কিন্তু সেই সঙ্গে ধর্ম্মানুরাগী হলে আমাদের সুবিধে হত।

তোমরা শুক্রবার ওখানে রওনা হলে। তখন কাছারিতে আমাদের বড়লাটের দল ত কেউ ছিলেন না—তোমাদের রসদের কি রকম জোগাড় হল তাই ভাবচি। কোথাও একটু মাথা গোঁজবার জায়গা পেয়েছ ত? বিদ্যুৎ যদি হঠাৎ আর কোথাও স্থান না পান তাহলে আপাতত তাঁকে আমাদের বোটে থাকতে দিয়ো। আমি যখন যাব এখানকার বোট সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

তোমাদের সঙ্গে মেলবার জন্যে উৎসুক আছি জেনো। সমস্ত টানাটানি সেরে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চাই। বুধবার অর্থাৎ পর্শু কলকাতায় রওনা হচ্চি। ইতি ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩২২

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩)

ওঁ

[কলিকাতা]

কল্যাণীয়েষু

তোমার অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিলাম।

তোমাদের হিসাবের খাতা পরিষ্কার করিয়া রাখিয়ো অর্থাৎ যাহাতে কাজের অঙ্গ কোনোমতে অসম্পূর্ণ না হয় সেটার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। তোমাদের হিসাব যখন audit হইবে তখন সকলপ্রকার

ব্যয়ের voucher যেন থাকে এবং মোটা মোটা খরচ সম্বন্ধে সুরেনের হুকুম আদায় করিয়া রাখিয়ো—হিসাব সম্বন্ধে কোনো ত্রুটি রাখিলে সেই ছিদ্র দিয়া নৌকাডুবি হইতে পারে। আসল কাজটা যে তোমরা করিয়া তুলিবে সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহমাত্র নাই। আজ অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। ইতি ৬ই মাঘ ১৩২২

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৪)

ওঁ

[কলিকাতা]

কল্যাণীয়েষু

আজ মাঘোৎসবের ব্যাপারে ব্যস্ত আছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ঈশ্বর তোমার কর্ম্মের মধ্যে তাঁহার শান্তি, কল্যাণ, ও প্রেমকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলুন। আমি কয়েকটি ওলাওঠার ঔষুধের বাক্স শীঘ্র পাঠাইতেছি এবং যদি হোমিয়োপ্যাথি ডাক্তার পাঠাইতে পারি চেষ্টা দেখিব। ইতি ১১ই মাঘ ১৩২২

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৫)

ওঁ

শিলাইদা

কল্যাণীয়েষু

আমি পর্শু রেলযোগে যাবার উদ্যোগ করছিলেম এমন সময় আজ খবর এল পিয়ার্সন আমার এখানে আজ রাত্রের গাড়িতেই আসচেন। তাই ঠিক করেচি কাল তাঁকে নিয়ে বোটে করে ঈশ্বরদি পর্য্যন্ত গিয়ে

সেখান থেকে রেলে করে যাব। তাঁর শরীর খারাপ বলেই তিনি একটু বায়ু পরিবর্ত্তনের প্রয়াসী।

তা হলে বোধ হয় মঙ্গল কিম্বা বুধবারে গিয়ে পৌছব। যদি পিয়ার্সন যেতে পারেন ত ভালই—তিনি খুসি হয়ে আস্‌বেন। ওখানে গিয়ে সব কথা পাকা করে আসা যাবে।

প্রজাদের ডেকে তোমার যা বোঝাবার বুঝিয়ে রেখো—আমি গিয়ে উত্তরকাণ্ড সমাপ্ত করে আসব। ইতি ৮ই ফাল্গুন ১৩২২

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৬)

ওঁ

আত্রাই

কল্যাণীয়েষু

তুমি এণ্ট্রান্স স্কুলের হেডমাষ্টার রূপে মাসিক আশি টাকা বেতন পাইবে স্থির হইয়াছিল এইজন্য বেতন সম্বন্ধে প্রজাদিগকে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। এণ্ট্রান্স স্কুল উঠিয়া যাওয়াতেই এ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইল। সাধারণ ফণ্ড হইতে পঞ্চাশ ও ষ্টেট হইতে ত্রিশ টাকা বেতন স্থির করিলাম। কারণ, সাধারণ ফণ্ডে মাসিক আশি টাকার ভার কিছুতেই সইবে না। একথা লইয়া প্রজাদের মধ্যে কিছু আলোচনা চলিতে পারে কিন্তু অন্য উপায় নাই। যদি বিদ্যালয়ের কোনো একটা ভার গ্রহণ করিয়া কতকটা ব্যয়ভার লাঘব করিতে পার তবে মন্দ হয় না। সর্ব্বদা মফস্বলে ঘুরিয়া কাজ দেখিবার কাজে তোমার কোনো একজন ছাত্রকে লাগাইতে পারিলে খরচ কম হইবে। কেবল মাসে এক একবার গিয়া বিভাগীয় সভার অধিবেশন সম্পন্ন করিয়া

আসিলেই চলিতে পারিবে। হিতৈষী সভা ও সাধারণ ফণ্ডের কাজে যাঁহারা প্রবৃত্ত থাকিবেন তাঁহারা অন্য কোনো একটা কাজের উপলক্ষ্য লইয়া এটাকে অতিরিক্ত কাজের মত চালাইতে থাকিলেই তবে জোর পৌঁছিবে। যিনি এই কাজেই কর্ম্মচারীরূপে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত তাঁহাকে সেই কারণেই দুর্ব্বল হইয়া থাকিতে হইবে। এই জন্যই আমি মনে করি যে, যদি স্কুল প্রভৃতি সংক্রান্ত কোনো একটা কাজে স্বতন্ত্র নিযুক্ত থাকিয়া নিরপেক্ষভাবে সাধারণ কার্য্যে যোগ দিতে পার তবে অধিক ফল পাইবে এবং সগৌরবে ও সবলে কাজ করিতে পারিবে। নতুবা প্রজাদের কাছে কিছু কুণ্ঠিত হইয়া থাকিতেই হইবে। সম্পূর্ণ সময় যদিবা না দিতে পার সম্পূর্ণ জোর দেওয়া আরো অনেক বেশি আবশ্যক। সাধারণের কাজ মনিবের কাজ না হওয়া উচিত। তোমার মাসিক বেতনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে অন্য ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি ১৬ই ফাল্গুন ১৩২২

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৭)

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

সমস্ত হৃদয়মন উৎসর্গ করিয়া লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া লও তাহা হইলেই সমস্ত বাধা কাটিয়া যাইবে। টাকা সম্বন্ধে তখনি মনে খটকা বাধিবে যখনি মন বিমুখ হইবে। অবশ্য কর্ত্তব্য সাধন করিতে বসিলে সকলের মন পাওয়া যায় না এবং মন যোগাইবার দিকেই দৃষ্টি রাখিলেও চলিবে না কিন্তু ওখানকার লোকদের স্পষ্ট বুঝিতে পারা দরকার হইবে

যে তুমি অক্ষুণ্ণ শ্রদ্ধার যোগ্য, তাহাদের সেবায় তোমার পরিপূর্ণ শক্তি পরিপূর্ণ আনন্দে কাজ করিতেছে। তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে সমস্ত ছোট কথা সুদূরে চলিয়া যাইবে। অতএব কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাও, একদিন তোমার পূর্ণ আসন তুমি অধিকার করিয়া বসিতে পারিবে। কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মনকে একান্ত সহজ কর—ক্ষোভকে দমন কর, যথাসম্ভব শান্ত ও নীরব হও—নম্র হইয়া আপনার শক্তিকে প্রচ্ছন্নভাবে প্রয়োগ কর, কর্ম্মকে ধর্ম্মসাধনার ও মুক্তিসাধনার অঙ্গ জানিয়া তপস্যাকে বিশুদ্ধ কর এবং মনকে অনন্তের মধ্যে সমাহিত করিবার অভ্যাস কর; আঘাতকে আনন্দে গ্রহণ করিবার শক্তি লাভ কর, অন্তরের পূর্ণতায় প্রতিদিন অচলপ্রতিষ্ঠ হইতে থাক। ইতি ২১ ফাল্গুন, ১৩২২

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৮)

ওঁ

[ঠিকানা ও তারিখ নাই]

কল্যাণীয়েষু

তোমাদের কাজ যেরূপ চলিতেছে তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম। সাধারণের হিতের জন্য প্রত্যেককে নিজের সামর্থ্যে খাটাইবার অভ্যাসটি যদি কোনোমতে পাকা হইয়া যায় তাহা হইলেই তোমার সকল চেষ্টার সার্থকতা হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস একবার কোথাও ইহার সুরু হইলেই ইহা দেখিতে দেখিতে গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িবে।

আমার একটি কথা বলিবার আছে। কাজের সঙ্গে সঙ্গে একটি আনন্দের সুর বাজাইয়া তুলিতে হইবে। আমাদের গ্রামের জীবনযাত্রা

বড়ই নিরানন্দ হইয়া পড়িয়াছে। প্রাণের শুষ্কতা দূর করা চাই। হিতানুষ্ঠানগুলিকে যথাসম্ভব উৎসবে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়ো। বৎসরে একদিন বৃক্ষরোপণের উৎসব করিবে। বৈশাখের শেষে কোনো একদিন ইস্কুলের ছুটি দিয়া সব ছেলেদের লইয়া বনভোজন ও বৃক্ষরোপণ করিবার আয়োজন করিলে ভাল হয়। রাস্তা প্রভৃতির কাজ আরম্ভ করিবার প্রথম দিনটায় একটু উৎসবের ভাব থাকিলে এগুলো ধর্ম্মকর্ম্মের চেহারা পাইবে। আর একটি কথা মনে রাখা চাই। চাষী গৃহস্থদের মনে ফুলগাছের সখ প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে উপকার হইবে। প্রত্যেক কুটীরের আঙিনায় দুই চারিটি বেলফুল গোলাপ ফুলের গাছ লাগাইতে পারিলে গ্রামগুলি সুন্দর হইয়া উঠিবে। দেশে এই সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা অত্যাবশ্যক একথা ভুলিলে চলিবে না।

বিচালিভরা যে মাদুরের নমুনা পাইয়াছিলাম তাহার মধ্যে বিচালি আরো ঘন করিয়া ঠাসিয়া দেওয়া দরকার—নহিলে বসিতে বসিতে মাঝে মাঝে গর্ত্ত হইয়া যাইবে।

ম্যানেজার আমাকে আরো কিছু কাঁথা আলপনা প্রভৃতি পরে পাঠাইবেন আশা দিয়াছিলেন—সে আশা যদি চ কালক্রমে দুর্ব্বল হইয়া আসিয়াছে কিন্তু এখনো মরে নাই সে কথা তাঁহাকে জানাইবে। ওখানে বাখারির চাঙারি চুপড়ি প্রভৃতি বিশেষ কোনো দ্রব্য বা মাটির কোনো পাত্র যদি পাও তবে পাঠাইয়া দিয়ো। কুঁড়ে ঘরের নমুনা পাঠাইবার কথা ছিল ম্যানেজারবাবুর তাহা মনে নাই কিন্তু আমার মনে আছে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৯)

ওঁ

[ঠিকানা ও তারিখ নাই]

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠি পেয়ে মনের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ অনুভব করচি। আমি আর বেশি বিলম্ব করব না। হয়ত ১০।১২ নবেম্বরের মধ্যেই ফিরব। এখান থেকে আর দুতিন দিনের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। ইতিমধ্যে তোমাদের সমস্ত কার্য্যপ্রণালী আনুপূর্ব্বিক ঠিক করে রেখো। বিশুকে বিস্তারিত সমস্ত লিখেচি, দেখা হলে আলোচনা করা যাবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১০)

ওঁ

শিলাইদা

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পড়ে আনন্দিত হয়েচি। আমি পতিসরে এসে পৌঁছবার পূর্ব্বে তুমি ওখানকার ক্ষেত্রটি বেশ দখল করে বসবে এইটে হলেই সুন্দর হয়। কেননা আমি মাঝখানে পড়ে যা কিছু করব সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হবে না। আমার মন জোগাবার জন্যে কিম্বা আমার হুকুমে যা হবে সেটা হয়ত একেবারে অন্তরের জিনিস হবে না—এবং তার থেকে ঈর্ষা বিরোধের সৃষ্টি হতেও পারে। আমরা যে পক্ষে থাকি সে পক্ষের প্রতি অন্য সকলে অনেক সময় বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করে—তার প্রধান কারণ ক্ষমতানাশের আশঙ্কা। এটা আমি বারম্বার দেখেচি সেইজন্য কারো আনুকূল্য করতে দ্বিধা হয় পাছে সেটা প্রতিকূলতা হয়ে

দাঁড়ায়। তোমরা একবার ওখানকার হৃদয় অধিকার করে দাঁড়ালেই আর কোনো ভয় থাকবে না। সে তোমরা নিশ্চয় পারবে আমি জানি। সেই পারাটা তোমাদের নিজের কৃতিত্বে হলেই তোমাদের যথার্থ জয় হবে। যে কাজে তোমরা প্রবৃত্ত হচ্ছ সেটা তোমাদেরি যথার্থ সৃষ্টিকার্য্য হয় এই আমার ইচ্ছা; তোমরা তার মধ্যে নিজের স্বাধীনতা এবং নিজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ পরিমাণে অনুভব করবে—যখন মূর্ত্তিটি গড়া হয়ে যাবে তখন তোমরা তার ভিতর নিজের জীবনের সাধনার প্রতিমূর্ত্তি দেখতে পাবে। আমি কেবল তোমাদের ক্ষেত্র দিয়েচি এই পর্য্যন্ত—এবং যদি কখনো তোমরা আমাকে কোনো বিষয়ে তোমাদের সহযোগী করতে চাও তাহলে আমাকে পাবে।

হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় হে—
ওহে বীর, হে নির্ভয়।

ইতি সোমবার

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১১)

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

এই ত চাই। এমনি করিয়া এক জায়গায় কাজ আরম্ভ হইলে সব জায়গাতেই হইবে। এই বৎসর প্রজারা প্রচুর ফসল পাইয়াছে বলিয়া স্ফূর্ত্তিতে আছে—এখনি তোমার কাজের আসর জমিবে ভাল। ভবিষ্যতের ব্যবস্থা ভবিষ্যতে হইবে—এখন পালে হাওয়া লাগিয়াছে—হুহু করিয়া চলিয়া যাও। কোনো বাধাই টিঁকিবে না। কিন্তু মনটাকে

ঠাণ্ডা রাখিয়ো—উন্মাদনাও ভাল নয় অবসাদও ভাল নয়—যাহা ঘটিতেছে তুমি তাহার উপলক্ষ্য মাত্র এ কথা মনে রাখিয়ো। আবার যদি গড়া জিনিস কখনো ভাঙে তখনো অবিচলিত থাকিতে হইবে। মনটাকে কাজের ক্ষেত্রের বহু উর্দ্ধে রাখিলে তবেই কাজ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হইতে পারিবে। লেশমাত্র অহমিকা যেন তোমাকে না আক্রমণ করে। যে ব্যক্তি নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া কাজ করে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আনন্দের সঙ্গে তাহার সাহায্য করে। যেই তুমি বলিবে আমি করিতেছি অমনি একলা পড়িবে।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন প্রসন্ন হইয়াছেন, কালগ্রামের ভাগ্যাকাশে তখন এক খণ্ড কালো মেঘ দেখা দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে নিমেষ মধ্যে সেই মেঘ বৃহদায়তন হইয়া আকাশ গ্রাস করিল, প্রায় সকল কর্ম্মী সহ নেতা অতুল সেন অন্তরায়িত হইলেন। ইহাতে এই কাজের ভরা পালে যে ফুটা হইল, নৌকাডুবি তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। গড়া জিনিস যখন ভাঙিল, স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ তখনও অটল রহিলেন। পরবর্ত্তী পত্রখানি তিনি শ্রীযুক্ত অতুল সেনের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা কিরণবালা দেবীকে লিখিয়াছেন।

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার স্বামীর অন্তরায়ণ সংবাদ আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। কি কারণে তাঁহার এই বিপত্তি ঘটিল তাহা কিছুই জানি না। এ সম্বন্ধে রাজপুরুষদের নিকট আমি পত্র লিখিয়াছি। তাহার কোনো ফল হইবে কি না তাহা বলা যায় না। তোমরা যে দুঃখ ভোগ করিতেছ

ভগবান তোমাদের সেই দুঃখকে কল্যাণে পরিণত করুন এই কামনা করা ছাড়া আর আমাদের কিছু করিবার নাই। ইতি ২৬ পৌষ ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

*　　　*　　　*

এই প্রসঙ্গ আমরা পরেও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিব। যদি কোনও পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত কোনও চিঠিপত্র বা অন্য কোনও উপকরণ থাকে এবং যদি তিনি স্বয়ং সেগুলির ব্যবহার না করেন, তাহা হইলে প্রকাশের জন্য সেই সকল উপকরণ ব্যবহার করিতে দিলে বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ কবির একটি সঠিক জীবনী প্রকাশিত হইতে পারে।

বাংলার তাঁতশিল্প

বাংলার তাঁত থেকে যে কাপড় উৎপন্ন হচ্ছে যথাসম্ভব একান্তভাবে সেই কাপড়ই বাঙালী ব্যবহার করবে বলে যেন পণ করে। একে প্রাদেশিকতা বলে না, এ আত্মরক্ষা। উপবাসক্লিষ্ট বাঙালীর অন্নপ্রবাহ যদি অন্য প্রদেশের অভিমুখে অনায়াসে বইতে থাকে তবে মোটের উপর তাতে সমস্ত ভারতেরই ক্ষতি।

বাঙালীর ঔদাসীন্যকে ধাক্কা দিয়ে দূর করা চাই। কলিকাতার ও অন্যান্য প্রাদেশিক নগরের মিউনিসিপ্যালিটীর কর্তব্য হবে প্রদর্শনীর সাহায্যে বাংলার সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের সংবাদ নিয়ত প্রচার করা এবং বাঙালী যুবকদের মনে সেই উৎসাহ জাগানো, যাতে বিশেষ করে তারা বাঙালীর হাতের ও কলের জিনিষ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়।

১৯শে ভাদ্র, ১৩৪৭　　　রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্তরীক্ষে

[এই নাটিকায় সন্নিবিষ্ট পাত্রপাত্রীগণ বিদগ্ধসমাজে এতই সুপরিচিত যে, তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। মধ্যে মধ্যে যে সকল প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে, সেগুলিও বিদ্বৎসমাজে সুবিদিত। বিদেশী নাম বাংলায় লিখিতে গিয়া হয়তো বহুস্থলে আমি উচ্চারণ ভুল লিখিয়াছি। বলিতে পারি না, হয়তো ঠিকও হইয়া থাকিতে পারে। মোট কথা, এ বিষয়ে আমার সংশয় আছে এবং সময়ের স্বল্পতাহেতু তাহা নিরসন করিয়া লইতে পারি নাই। যদি কোন পাঠক-পাঠিকার মনে ভুল উচ্চারণ দেখিয়া ক্রোধ জন্মে, তাঁহারা উপরোক্ত হেতু স্মরণ করিয়া আমাকে যেন ক্ষমা করেন।]

অন্তরীক্ষে গ্রীক দেবী এথেনা দাঁড়াইয়া আছেন। চতুর্দ্দিকে বিরাট মহাশূন্য, ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু জ্যোতিষ্ক জ্বলিতেছে; দক্ষিণে রজতশুভ্রজ্যোতি একটি নীহারিকা বাষ্পীয় দেহ বিস্তার করিয়া অসীম শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে; পিগেসাস নক্ষত্রমণ্ডলীতে একটা ধূমকেতু দেখা যাইতেছে; কাছে দূরে উল্কাপাত হইতেছে। এথেনার পদতলে বহুনিম্নে পৃথিবী-গ্রহ। এথেনা মানবী হইলে দেখিতে পাইতেন না, কিন্তু দেবী বলিয়া সৌরচক্রের দ্বাদশ রাশিকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন। দেখিতে পাইতেছেন যে, মকররাশিতে পূর্ণিমার চন্দ্র, মীনরাশিতে প্রবালবর্ণ মঙ্গল, বৃষরাশিতে প্রদীপ্ত বৃহস্পতি নীলকান্ত শনি, সিংহ রাশিতে দ্যুতিমান শুক্র এবং কর্কট রাশিতে জ্যোতিষ্মান সূর্য্য দেদীপ্যমান। সূর্য্যকে একটি নক্ষত্রের মত প্রতীয়মান হইতেছে। দেহহীন রাহু কন্যারাশিকে এবং কবন্ধ কেতু মীনরাশিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। পৃথিবীর খানিকটা অংশে ঘনকৃষ্ণ মসীরেখার মত শ্রাবণের পুঞ্জীভূত মেঘমালা, তাহাতে বিসরণশীল বিদ্যুৎ-স্ফুরণ দেখা যাইতেছে। এথেনা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পৃথিবীর দিকেই চাহিয়া আছেন। চিরন্তনী ক্রন্দসীর অবরুদ্ধ ক্রন্দন-ধ্বনি মহাশূন্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে

এথেনা। গ্রীসকে মনে পড়ছে, মনে পড়ছে এথেন্সকে, মনে পড়ছে এথেন্সের এরিওপেগাসকে। [কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া] এথেন্সবাসীরা এখনও প্যান্‌থেনিয়া উৎসব করে কি? এখনও কি আমি তাদের কাছে সত্য?

সহসা মহাশূন্যে উড্ডীয়মান বিহঙ্গমের পক্ষবিধূনন-শব্দ শোনা গেল। ক্ষণপরেই এক বিরাট ময়ূরপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দিব্যকান্তি হেরা দেবী আবির্ভূত হইলেন এবং এথেনাকে দেখিয়া ময়ূরের গতিরোধ করিলেন

হেরা। খবর শুনেছ এথেনা?

এথেনা। কি?

হেরা। আমার সপত্নীরা এখনও কেউ মরে নি।

এথেনা। আকাশ-দেবতা জিউস-পত্নীরা যে অমর! কেন, হ'ল কি?

হেরা। তাঁরা সবাই সদলবলে স্বামীসন্নিধানে এসেছেন।

এথেনা। সদলবলে, মানে?

হেরা। সন্তানসন্ততি-সহ। হোরি মোরিদের নিয়ে থেমিস, চ্যারিটিদের নিয়ে ইউরিনোম, পার্সিফোনকে নিয়ে ডেমেটার, মিউজদের নিয়ে নেমোসাইন, অ্যাফ্রোডাইটকে নিয়ে ডাওনি, এমন কি লেটো—যাকে সবচেয়ে ঘৃণা করি আমি, সেও এসেছে অ্যাপোলো আর আর্টেমিসকে নিয়ে।

এথেনা। কেন, ব্যাপার কি?

হেরা। পৃথিবীতে আবার যুদ্ধ বেধেছে।

এথেনা। যুদ্ধ? একিলিস, হেক্‌টার, অ্যাজাক্‌স, প্যারিস, আগামেম্‌নন এরা তো বহুদিন হ'ল ম'রে গেছে, আবার যুদ্ধ করবে কে?

হেরা। পৃথিবী উর্ব্বরা, নূতন বীর জন্মেছে আবার।

এথেনা। অসম্ভব।

হেরা। অসম্ভব নয় এথেনা, এমন সব বীর জন্মেছে শুনলাম, যারা জলে স্থলে আকাশে সর্ব্বত্র যুদ্ধ করছে। আকাশ-দেবতা জিউস আর জল-দেবতা পোসিডনের কর্তৃত্ব বুঝি আর থাকে না, হেডিসেরও রাজত্ব যায়-যায়, মানুষ পাতালেও প্রতাপ বিস্তার করেছে।

এথেনা। তারাই তা হ'লে আবার জন্মগ্রহণ করেছে। পুরাতনরাই নূতন নাম নিয়ে নূতনত্বের দাবি করছে। [সহসা] আমার যেতে ইচ্ছে করছে আবার।

হেরা। কোথায়?

এথেনা। গ্রীসে। তোমরা আমাকে বাণী-বিদ্যাদায়িনী বানিয়েছ,

কিন্তু জিউসের মস্তক বিদীর্ণ ক'রে যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম, সেদিন আমার কণ্ঠে ছিল যুদ্ধের হুঙ্কার। মনে নেই ট্রয়ের যুদ্ধ ?

হেরা। সব মনে আছে, তার আগের ঘটনা সোনার আপেলের গল্প—তাও মনে আছে। [হাসিলেন] আমি এখন চললাম।

এথেনা। কোথায় ?

হেরা। দূরে, অনেক দূরে—জালের বাইরে।

এথেনা। [সবিস্ময়ে] জালের বাইরে ! মানে ?

হেরা। আমার সপত্নীরা খবর এনেছেন যে, পৃথিবীর বীরদর্পে শুধু মর্ত্ত্য নয়, স্বর্গেরও সমূহ বিপদ আসন্ন, জিউস যদি অবিলম্বে এর কোন প্রতিকার না করেন, কিছু আর থাকবে না।

এথেনা। জিউস কি করছেন ? অ্যাফ্রোডাইটকে পাঠাচ্ছেন মর্ত্ত্যে ?

হেরা। মর্ত্ত্যের যে বীরপুরুষটি সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর, তিনি নাকি নারী-মোহ-মুক্ত, সুন্দরী পাঠালে কোন ফল হবে না।

এথেনা। তা হ'লে তো সত্যিই চিন্তার কথা, কি করছেন তা হ'লে জিউস ?

হেরা। লেটোর পরামর্শে তিনি এক অদ্ভুত কাজ করছেন।

এথেনা। কি ?

হেরা। পৃথিবীর যত বড় বড় কবিদের আমন্ত্রণ ক'রে এক সভার আয়োজন করছেন এর প্রতিবিধানকল্পে।

এথেনা। কবিদের ?

হেরা। হ্যাঁ, কেবল মৃত কবিদের, জীবিতদের নয়, ঔপন্যাসিক, বক্তা, চিত্রকর, ভাস্করদেরও নয়, কেবল যাঁরা ছন্দে বেঁধে কাব্য লিখেছেন তাঁদের সভা হবে।

এথেনা। কেন, ঔপন্যাসিক, বক্তা, চিত্রকর, ভাস্কর এঁরাও তো এক হিসেবে কবিই ?

হেরা। [সশ্লেষে] তোমার হিসেব আর লেটোর হিসেব এক নয়। লেটো বলেছে ছান্দিক কবিদের সভা হোক, সুতরাং তাই হবে, তোমার বা আমার কথা টিকবে না, তুমি যেন বলতে যেও না কিছু,

আমার মত অপমানিত হবে। বহুকাল পরে লেটোকে পেয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন জিউস।

এথেনা। কিন্তু কবিদেরই বা একসঙ্গে পাবেন কি ক'রে জিউস? কে কোন্ লোকে ভেসে বেড়াচ্ছেন তার ঠিক আছে কি!

হেরা। তাই তো জাল পাতা হচ্ছে।

এথেনা। বুঝতে পারছি না ঠিক।

হেরা। আলোর জাল পাতা হবে সারা আকাশ জুড়ে, আর তার বাইরে হবে স্বর্গীয় সঙ্গীত। কবিরা গান শুনে আসবেন আর জালে আটকে যাবেন।

এথেনা। গান গাইবে কে?

হেরা। মিউজরা আর আর্টেমিস।

এথেনা। আর্টেমিস মানে, ডায়ানা?

হেরা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডায়ানা, গ্রীক নাম পছন্দ হচ্ছে না বুঝি? তোমাকে মিনার্ভা ব'লে ডাকতে হবে নাকি? আমাকে কেউ জুনো বললে তো গা জ্বালা করে আমার।

এথেনা। তুমি পালাচ্ছ কেন?

হেরা। সপত্নীদের কৃতিত্ব চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দেখব! চল, তুমিও চল।

এথেনা। সারা আকাশ জুড়ে জাল পাতা হবে বলছ, কোথায় যাব?

হেরা। যত বড় জালই হোক তার সীমা আছে, আকাশ কিন্তু অসীম। আমরা জালের বাইরে গিয়ে দাঁড়াই চল।

এথেনা। কেন?

হেরা। সব পণ্ড ক'রে দেব। জিউস আকাশের সম্রাট, কিন্তু আমিও আকাশের সম্রাজ্ঞী, আমাদের উভয়ের অনুমতি ব্যতীত কোন বিষয়ের শেষ মীমাংসা হতে পারে না।

এথেনা। তার জন্যে বাইরে যাবার দরকার কি?

হেরা। ওই মিউজদের আমি বিশ্বাস করি না, ওরা সাইরেন, ওরা মায়াবিনী, হয়তো হঠাৎ মুগ্ধ ক'রে ফেলবে আমাকে, হয়তো ওদের মতে মত দিয়ে ফেলব।

এথেনা। মত দিয়ে ফেললেই বা ক্ষতি কি? পৃথিবী যদি বিপন্ন হয়ে থাকে, গ্রীসও বিপন্ন হয়েছে। গ্রীসের প্রতি এতটুকু মায়া নেই তোমার?

হেরা। গ্রীসের প্রতি? না, এতটুকু না, গ্রীস কি আমাকে বুঝেছিল কোন দিন? তারা কোথাও আমার পূজো করত তক্তা খাড়া ক'রে, কোথাও বা কাঠের গুঁড়ি, কোথাও বা থাম। আমায় কিছু বুঝেছিল ভাস্কর পলিক্লিটাস, তাও সম্পূর্ণ নয়। [সক্ষোভে] আমার নিজের স্বামীই বুঝলে না আমাকে, অপরে কি বুঝবে! চল যাই, ওরা এসে পড়বে এখনই।

এথেনা। আমি যাব না।

হেরা। তবে থাকো, আমি যাই।

হেরার ইঙ্গিত পাইয়া ময়ূর পাখা বিস্তার করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল। এথেনা কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন

এথেনা। যুদ্ধ হচ্ছে! কেন? হেলেন আবার জন্মাল নাকি? না, চুপ ক'রে থাকলে চলবে না, হেরার ভাবভঙ্গি ভাল নয়, জিউসকে সাবধান ক'রে দেওয়া উচিত।

অন্তর্হিত হইলেন। ক্ষণপরেই বিস্তৃত আকাশপটে সূক্ষ্ম স্বর্ণতন্তুসন্নিভ অসংখ্য আলোক-রেখা পরিস্ফুট হইল এবং দেখিতে দেখিতে এক বিরাট জ্যোতির্ম্ময় জালক অন্ধকার মহাশূন্যে দিগদিগন্ত ব্যাপিয়া দুলিতে লাগিল। জালের বাহিরে রূপসী মিউজগণ ডায়ানা সমভিব্যাহারে একে একে আবির্ভূত হইলেন। প্রত্যেকের হস্তে একটি করিয়া 'লায়ার', প্রত্যেকেরই অঙ্গে সুস্থ গ্রীক সৌন্দর্য্য, প্রত্যেকের পরিধানে নাতিবহুল গ্রীক পরিচ্ছদ, সুন্দর বিশিষ্ট অনাড়ম্বর। ধীরে ধীরে তাঁহারা সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। ক্রমশ সমস্ত অন্তরীক্ষ উদাত্ত গম্ভীর মহৎ এবং মধুর সুরসম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে দূরে কয়েকটি ছায়ামূর্ত্তি অস্পষ্টভাবে দেখা গেল, নিকটবর্ত্তী হইলে বোঝা গেল পাঁচজন, দুইজন আগাইয়া আসিলেন, তিনজন একটু পিছাইয়া রহিলেন। তাঁহাদের আকৃতি যে কি, তাহা বোঝা গেল না। একটা ঘন কুয়াশা যেন প্রত্যেককে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, এবং সেই কুয়াশা ভেদ করিয়া একটা অপরূপ দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইতেছে

প্রথম ছায়ামূর্ত্তি। মহাশূন্যে জ্যোতির্ম্ময় এ কি অপূর্ব্ব প্রকাশ!

দ্বিতীয় ছায়ামূর্ত্তি। যিনি দেবতাগণের জন্ম ও শক্তির হেতু, যিনি হিরণ্যগর্ভের জনক, তাঁরই এ নূতন লীলা।

প্রথম ছায়ামূর্ত্তি। কে আপনি ?

দ্বিতীয় ছায়ামূর্ত্তি। আমি ? আমিও তাঁরই প্রকাশ মাত্র।

প্রথম ছায়ামূর্ত্তি। আপনার পরিচয় পেতে পারি কি ?

দ্বিতীয় ছায়ামূর্ত্তি। অসংখ্য আমার পরিচয়, কোন্‌টা বলব, ব'লে লাভই বা কি ?

প্রথম ছায়ামূর্ত্তি। আপনি মর্ত্ত্যবাসী ছিলেন নিশ্চয় ?

দ্বিতীয় ছায়ামূর্ত্তি। ছিলাম, মর্ত্ত্যে শ্বেতাশ্বেতর নামে একটা উপনিষদও রচনা করেছিলাম, মর্ত্ত্যে তাই আমার পরিচয়। [অর্দ্ধ স্বগত] জানি না, সে গ্রন্থ এখনও আছে কি না !

প্রথম ছায়ামূর্ত্তি। উপনিষদের ঋষি আপনি ! আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

দ্বিতীয় ছায়ামূর্ত্তি। [নমস্কারান্তে] আপনি কে ?

প্রথম ছায়ামূর্ত্তি। আমি দ্বৈপায়ন, কেউ কেউ বেদব্যাসও বলে আমাকে।

দ্বিতীয় ছায়ামূর্ত্তি এ পরিচয়ে বিশেষ বিচলিত হইলেন না, মনে হইল, যেন চিনিতে পারিলেন না। তিনি নীরবে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং একটু দূরে সরিয়া গেলেন। তৃতীয় ছায়ামূর্ত্তি প্রথমের নিকট সরিয়া আসিলেন

তৃতীয় ছায়ামূর্ত্তি। কি অপূর্ব্ব সঙ্গীত ! এই সঙ্গীতের ঠিক সুরটি ধরবার সাধনায় দিবারাত্রি অতিবাহিত করেছিলাম একদিন, কিন্তু কিছুই করতে পারি নি, কিছুই হয় নি।

প্রথম ছায়ামূর্ত্তি। আপনি কে ?

তৃতীয় ছায়ামূর্ত্তি। হোমার।

প্রথম ছায়ামূর্ত্তি চিনিতে পারিলেন না

বেদব্যাস। সত্যিই অপূর্ব্ব সঙ্গীত, আমরা সম্ভবত কিন্নরলোকের সমীপবর্ত্তী হয়েছি।

উপনিষদের ঋষি। [মৃদুকণ্ঠে আপন মনে]

নীলঃ পতঙ্গো হরি তো লোহিতাক্ষস্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ।

হোমার। কি অপূর্ব্ব স্বর!

বেদব্যাস: শুধু স্বর নয়, আকাশপটে বিলম্বিত আলোক-রেখা-রচিত ওই জালটিও অপূর্ব্ব।

হোমার। আমি অন্ধ, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

অসহায়ভাবে ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন। চতুর্থ ছায়ামূর্ত্তি আগাইয়া আসিলেন

চতুর্থ ছায়ামূর্ত্তি। কি অপরূপ দৃশ্য, কি সুমধুর সঙ্গীত! বিরহী শ্রীরামচন্দ্রের দুঃখ-অপনোদন মানসে পম্পাতীরে বসন্তবর্ণনা-প্রসঙ্গে সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীতের অবতারণা করেছিলাম মনে পড়ছে, কিন্তু এ কি দেখলাম আজ, এ কি শুনলাম, এ যে কল্পনাতীত!

বেদব্যাস। পম্পাতীরে! আপনি কি তা হ'লে আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী?

চতুর্থ ছায়ামূর্ত্তি। [সগর্ব্বে] হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, মহেন্দ্রধ্বজসঙ্কাশ গূঢ়জত্রু শ্রীরামচন্দ্রের পদরেণুপবিত্র আর্য্যাবর্ত্তই আমার মর্ত্ত্যবাস ছিল।

বেদব্যাস। আপনার পরিচয় জানতে বাসনা করি। আমিও ভারতবর্ষীয়।

চতুর্থ ছায়ামূর্ত্তি। মর্ত্ত্যলোকে আমি রত্নাকর নামে পরিচিত ছিলাম।

বেদব্যাস। কবিগুরু বাল্মীকি!

সসম্ভ্রমে নমস্কার করিলেন

বাল্মীকি। [প্রতিনমস্কারান্তে] গুরুভার বহন করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা-কীর্ত্তন করবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম একদিন, তাই আমার পরম সৌভাগ্য, আর কিছু কামনা করি না। আপনি কে?

বেদব্যাস। আমি আপনার পরবর্ত্তী, আমার নাম দ্বৈপায়ন। পম্পা হ্রদকে মনে আছে এখনও আপনার?

বাল্মীকি। মনে আছে বইকি। তার তীরে সেই কর্ণিকার, সিন্ধুবার, মাতুলুঙ্গ, কোবিদার পুষ্পের শোভা, তার নীরে মধুকর-ভূষিত কমলকুল, অদূরে শিখী-শিখিনীর নৃত্য, দাত্যুহের করুণ কণ্ঠস্বর,

সেই অঙ্কোল, কুরুণ্ট, চূর্ণক বৃক্ষরাজি, সেই শ্যামকান্তি ঋষ্যমূক পর্ব্বত —এসব কি ভুলতে পারি কখনও ! [একটু থামিয়া] কিন্তু আকাশ-পটে আজ এ কিসের ছবি, ওই সুন্দরীরা কে ? এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতের হেতু কি ?

উপনিষদের ঋষি। [যেন আপন মনে উত্তর দিলেন]

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।

হোমার কান পাতিয়া মিউজদের সঙ্গীত শুনিতেছিলেন

হোমার। [মাথা নাড়িয়া] হেক্‌সা মিটারে ঠিক এই সুর ফোটানো অসম্ভব। না, আমি পারি নি।

পঞ্চম ছায়ামূর্ত্তি নিকটবর্ত্তী হইলেন

পঞ্চম ছায়ামূর্ত্তি। এ কি মনোহর চিত্র, এ কি স্বর্গীয় ঐক্যতান। গন্ধমাদন-বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্যকান্তমণি-নির্ম্মিত পাত্রে কল্পতরুর আসব পান ক'রেও তো এ অভিনব সৃষ্টির কল্পনা করতে পারবেন না। কোন্ শিল্পীর সৃষ্টি এ ?

কেহ উত্তর দিলেন না। বেদব্যাস ফিরিয়া দেখিলেন এবং নিকটে সরিয়া আসিলেন

বেদব্যাস। আপনি কি ভারতভূমি থেকে আসছেন ?

পঞ্চম ছায়ামূর্ত্তি। এসেছি অনেক দিন। এত দিন যে, আমি কবে কোথায় জন্মেছি, তা এখন পণ্ডিতদের তর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেদব্যাস। ও, পণ্ডিতরা শ্রান্ত হন নি এখনও আপনার সম্বন্ধে ! তা হ'লে আপনি আধুনিক। আপনার নামটি জানতে পারি কি ?

পঞ্চম ছায়ামূর্ত্তি। কালিদাস দেবশর্ম্মণঃ।

বেদব্যাস। ভারতভূমির কোন্ অঞ্চলে ছিলেন আপনি ?

কালিদাস। উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছিলাম।

বেদব্যাস কালিদাসকে অর্ব্বাচীন মনে করিয়াই সম্ভবত আর বাক্যালাপ করিলেন না। বাল্মীকি, হোমার এবং উপনিষদের ঋষি ইতিমধ্যে দূরে সরিয়া একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। বেদব্যাসও তাহাই করিতে লাগিলেন। কালিদাস একা দাঁড়াইয়া রহিলেন

কালিদাস। এ দিব্যাঙ্গনাগুলি কে? গন্ধর্ব্বকন্যা, কিন্নরী, দেববালা, না মানবী? আশ্চর্য্য রূপ, আশ্চর্য্য কণ্ঠস্বর!

দেখিতে দেখিতে দূরে সরিয়া গেলেন। ইহার ঠিক পরেই আরও তিনজন আসিলেন। ইঁহাদেরও চারিদিকে একটা কুয়াশার আবরণ, কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ বলিয়া লোকগুলিকে চেনা যায়। শ্যামবর্ণ ছিপছিপে গড়ন দেখিয়া ভার্জিলকে, লম্বা মুখ, ভারী চোয়াল, বহির্ম্মুখী পুরু অধর, সম্মুখে-ঈষৎ-ঝুঁকিয়া-পড়া দেহ, শুকচঞ্চু নাসা, ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ, চাপ-দাড়ি, গম্ভীর বিষণ্ণ বদন, শান্ত গমনভঙ্গি দেখিয়া দান্তেকে এবং 'কলার' দেখিয়া শেক্স্পিয়ারকে চিনিতে বিলম্ব হয় না। শেক্স্পিয়ার আড়চোখে একবার ভার্জিলকে, একবার দান্তেকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। দান্তে গভীর ঔদাসীন্যভরে কাহাকেও এবং কিছুই দেখিতেছিলেন না। ভার্জিল অবাক হইয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ছিলেন

ভার্জিল। বাই থিওক্রিটাস—এ যে—

কথা শেষ করিতে পারিলেন না, চাহিয়া রহিলেন। দান্তে এতক্ষণ কাহারও দিকে চাহিয়া দেখেন নাই, এই উচ্ছ্বাসোক্তিতে তাঁহার দিকে ফিরিয়া দেখিলেন এবং ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন

শেক্স্পিয়ার। [ভার্জিলকে থিয়েটারি কায়দায় অভিবাদন করিয়া] আপনার মত একজন সুরসিক ব্যক্তির পরিচয় লাভ করবার সৌভাগ্য হবে কি আমার?

ভার্জিল। আমার পরিচয়? আমি একজন কেল্‌ট চাষার ছেলে, ইটালির বাইরে মান্টুয়াতে জন্ম হয়েছিল আমার।

দান্তের ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইল

শেক্স্পিয়ার। চাষার ছেলে? হ'লেই বা! অন্যে বলে, আমি নাকি কসাইয়ের ছেলে। [সগর্ব্বে] অথচ আমার বাবার যে কোর্ট অব আর্ম্‌স ছিল, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। আপনি কার ছেলে তা জেনে অবশ্য সুখী হলাম, কিন্তু আপনার পরিচয় জানবার কৌতূহল আমি সম্বরণ করতে পারছি না।

ভার্জিল। [সহাস্যে] আমি গেঁয়ো মানুষ, পিতার পরিচয়েই নিজের পরিচয় দিয়ে থাকি। [একটু চুপ করিয়া থাকিয়া] আমার বাবা চাষা ছিলেন বটে, কিন্তু অবস্থা নেহাত খারাপ ছিল না আমাদের।

আমাদের চাষবাস ছাড়া বনকর ছিল, মৌমাছি পালন করতাম আমরা, বাবা আমাকে লেখাপড়া শিখতে প্রথমে ক্রিমোনা, তারপর মিলানে পাঠান।

শেক্‌স্পিয়ার। [বিস্ময়ের অভিনয় করিয়া] ও, তা হ'লে মস্ত বড় একজন বিদ্বান ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হ'ল আমার!

ভার্জিল। বিদ্বান ব'লে কিন্তু কোন দিন খ্যাতি হয় নি আমার, আমার সামান্য যা খ্যাতি তা কবি হিসেবে।

শেক্‌স্পিয়ার। তাই বলুন।

থিয়েটারি কায়দায় পুনরায় অভিবাদন করিলেন। দান্তের ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইল

শেক্‌স্পিয়ার। আপনি কবি! এর চেয়ে বড় পরিচয় মানুষের আর হতে পারে না।

ভার্জিল। [সসঙ্কোচে] সামান্য গ্রাম্য কবি আমি, আমার এক্‌লোগ্‌স—

দান্তে। এক্‌লোগ্‌স!

ভার্জিল। হ্যাঁ, এক্‌লোগ্‌স ব'লে একটা কবিতাগুচ্ছ আছে আমার, আসেনিয়াস পোলিও অবশ্য প্রশংসা করেছিল বইটার।

দান্তে। জর্জিক্‌স, ইনিড কি আপনারই লেখা?

ভার্জিল। হ্যাঁ, ও বই দুটো পরে লিখি। জর্জিক্‌সটা অক্টেভিয়াসকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে, আর ইনিডটা অগাস্টাসের ফরমাশে লিখতে হয়েছিল, কিন্তু—

দান্তে। আপনি ভার্জিল?

ভার্জিল। [চোখ-মিটমিটি করিয়া] হ্যাঁ? আপনি, আপনাকে তো ঠিক—

দান্তে সহসা নতজানু হইয়া অভিবাদন করিলেন। শেক্‌স্পিয়ার shrug করিয়া একটু সরিয়া গেলেন

দান্তে। আপনি আমার আদর্শ, আপনারই কৃপায় সংসারের জটিল অরণ্যে পথ খুঁজে পেয়েছি আমি, আমার কমেডিয়াতে আপনিই প্রথম পথপ্রদর্শক, বিয়াত্রিচের কাছে আপনিই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছেন আমাকে—

ভার্জিল। আমি! কই, আমার তো কিছুই মনে নেই!

দান্তে। [উঠিয়া দাঁড়াইলেন] মানুষ ভার্জিলকে আমি দেখেছি, শুধু দেখি নি, পূজা করেছি।

শেক্‌স্পিয়ার একটু দূরে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উভয়কে লক্ষ্য করিতেছিলেন। সহসা যেন কি একটা কথা মনে পড়িয়া যাইতে আগাইয়া আসিলেন

শেক্‌স্পিয়ার। যদি অনুমতি দেন—আচ্ছা থাক, আপনাদের আলাপে বাধা দেব না।

ভার্জিল। কি বলুন?

শেক্‌স্পিয়ার। আপনি কি জুলিয়াস সীজারকে দেখেছিলেন?

ভার্জিল। দেখেছিলাম বইকি, তাঁকে যখন খুন করে, তখন আমি রোমে রেটরিক আর ফিলজফি পড়ছি।

শেক্‌স্পিয়ার। লোকটা আসলে কি রকম ছিল বলুন তো?

ভার্জিল। ট্রায়াম্‌ভিরেটের সবাই যেমন তেমনই। বাইরে হিতৈষী জননায়ক, অন্তরে অহঙ্কারী ক্ষমতাপ্রিয় স্বার্থপর।

শেক্‌স্পিয়ার। ও।

ভার্জিল। হঠাৎ তার কথা মনে পড়ল কেন?

শেক্‌স্পিয়ার। শেক্‌স্পিয়ার ব'লে একজন নাট্যকার তাকে মস্ত একটা হিরো খাড়া ক'রে নাটক লিখেছে একখানা। আপনাকে দেখে হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল কথাটা।

দান্তে। [ভার্জিলকে] আপনি এখানে কেন?

ভার্জিল। সুরের টানে চ'লে এলাম। তুমি?

দান্তে। আমি? আমি ঘুরেই বেড়াচ্ছি কেবল। পৃথিবীতে শেষ-জীবনটা এর ওর তার দুয়ারে ঘুরেছি, ম'রেও শান্তি পাই নি, প্রেতের মত মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখানে কেন এসেছি জানি না, হয়তো সুরেরই মোহে, হয়তো—

ভার্জিল। এমন উদ্‌ভ্রান্ত কেন তুমি?

দান্তে। পৃথিবীতে বড় কষ্ট পেয়ে এসেছি। [সহসা] জানেন, কবর থেকে তুলে আমার হাড়গুলো পর্য্যন্ত পুড়িয়ে দিত ওরা, যদি র‍্যাভেনার নাগরিকরা বাধা না দিত?

ভাজ্জিল। [স্নেহভরে শান্তকণ্ঠে] মর্ত্ত্যের কথা ভুলে যাও, চল, গান শুনবে চল, এস।

ভাজ্জিলের পিছু পিছু দান্তে দূরে চলিয়া গেলেন। শেক্‌স্পিয়ার কোমরে হাত দিয়া আকাশের দৃশ্যটা দেখিতে লাগিলেন

শেক্‌স্পিয়ার। মন্দ নয়। যদি সুযোগ থাকত, তা হ'লে—এ আবার কে?

অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে অন্ধ মিল্টন প্রবেশ করিলেন

মিল্টন। [অর্দ্ধ-স্বগত]

A little onward lend thy guiding hand
To those dark steps, a little farther on.

শেক্‌স্পিয়ার। কে আপনি?

মিল্টন। আপনি কে, পাব্লিক অফিসার?

শেক্‌স্পিয়ার। বাই জোভ, না। এখানে পাব্লিক কোথায় যে, পাব্লিক অফিসার থাকবে?

মিল্টন। এটা কি Prison in Gaza নয়?

শেক্‌স্পিয়ার। এখানে prisonও নেই, tavernও নেই। একটা tavern খুঁজে খুঁজে হায়রান হয়ে গেছি, কোথাও কিছু নেই।

মিল্টন। গান শুনে মনে হচ্ছিল, বুঝি Gazaর prisonএর কাছাকাছি festival হচ্ছে। Samson Agonistesএ যা কল্পনা করেছিলাম, তাই বুঝি হঠাৎ বাস্তব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। এ জায়গাটা তা হ'লে কি Chaos?

শেক্‌স্পিয়ার। কি যে তা জানি না ঠিক।

মিল্টন। আপনিও আমার মত অন্ধ নাকি?

শেক্‌স্পিয়ার। অন্ধ নই, কিন্তু মনে হচ্ছে, হ'লে ভাল হ'ত, এমন কল্পনা আর বাস্তবের দোটানায় পড়তে হ'ত না। চোখ থেকে মুশকিল হয়েছে, দেখছি এক রকম, মনে হচ্ছে আর এক রকম।

মিল্টন। কি দেখছেন?

শেক্‌স্পিয়ার। দেখছি, অন্ধকার মহাশূন্যে গ্রহনক্ষত্র জ্বলছে, রূপসী যুবতী কয়েকজন গান গাইছেন, আর তাঁদের সামনে দুলছে বিরাট

একটা আলোর জাল, মনে হচ্ছে, অনেকগুলো বিদ্যুৎ যেন স্থির হয়ে গেছে হঠাৎ একসঙ্গে।

মিল্টন। [সাগ্রহে] আলো! আলোর জাল!

শেক্স্পিয়ার। হ্যাঁ।

মিল্টন। কি মনে হচ্ছে আপনার?

সেক্স্পিয়ার। প্রথমেই মনে হয়েছিল, সুযোগ থাকলে আমার মিড-সামার নাইট্স ড্রীমে এই সীনটা ঢুকিয়ে দিতাম।

মিল্টন। মিড্ সামার নাইট্স ড্রীম! আপনি কে?

শেক্স্পিয়ার। উইলিয়াম শেক্স্পিয়ার।

মিল্টন। শেক্স্পিয়ার! [দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া] কই, কোথা আপনি?

শেক্স্পিয়ার। এই যে, কেন?

একটু সরিয়া আসিতেই মিল্টন তাঁহাকে আবেগভরে জড়াইয়া ধরিলেন

শেক্স্পিয়ার। [স্বগত] আহা, লোকটা যদি মেরী কিটন হ'ত!

মিল্টন। আপনাকে যে এমন ভাবে পাব, তা কোন দিন কল্পনাও করি নি আমি। জানেন, সাহিত্য-জগতে আমার প্রথম প্রবেশ আপনার সেকেণ্ড ফোলিও এডিশনে।

শেক্স্পিয়ার। আমার নাটকের এডিশন হয়? বেন জন্সন বলত—

হঠাৎ উত্তেজিতভাবে গেটে আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং ইঁহাদের উপস্থিতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া লুব্ধদৃষ্টিতে মিউজদের দিকে চাহিয়া রহিলেন

শেক্স্পিয়ার। [অর্দ্ধস্বগত] লোকটি রসিক আছে।

গেটে। [আপন মনে] গ্রেট চেন? ক্যাথারিন? ফ্রেডারিক? বুফ? লারোচে? স্টীন? ভুলপিয়াস? মেরিয়েন? [কিছুক্ষণ দেখিয়া] না, এরা তারা নয়।

শেক্স্পিয়ার আগাইয়া গেটের কাছে গেলেন। মিল্টন কেমন যেন তন্ময় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার ঠোঁট নড়িতে লাগিল, মনে হইল, যেন তিনি মনে মনে কিছু আবৃত্তি করিতেছেন

শেক্স্পিয়ার। [ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতে] যদি অনুমতি করেন—

গেটে। [ঘাড় ফিরাইলেন] আমাকে বলছেন ?

শেক্‌স্পিয়ার। হাঁ।

গেটে। কি বলুন ?

শেক্‌স্পিয়ার। আপনি এখনই যে সুমিষ্ট নামগুলি উচ্চারণ করলেন, সেগুলি কি ওই সুন্দরীদের নাম ? ওঁদের সম্বন্ধে আমারও কৌতূহল কিঞ্চিৎ উদ্রিক্ত হয়েছে।

গেটে। আমি যাঁদের নাম করলাম, তাঁরা মর্ত্ত্যলোকে আমার প্রণয়িনী ছিলেন।

শেক্‌স্পিয়ার। এতগুলি !

গেটে। আপনি বায়োলজি পড়েছেন ?

শেক্‌স্পিয়ার। না।

গেটে। পড়লে বিস্মিত হতেন না। কোথা বাড়ি ছিল আপনার ?

শেক্‌স্পিয়ার। ইংল্যাণ্ডে।

গেটে। ইংল্যাণ্ডে, তাই। জার্ম্মানিতে হ'লে এত বিস্মিত হতেন না। [একটু পরে] অবশ্য ইংল্যাণ্ডে একটি লোক ছিলেন, তিনিও বিস্মিত হতেন না।

শেক্‌স্পিয়ার। কে তিনি ?

গেটে। উইলিয়াম শেক্‌স্পিয়ার।

শেক্‌স্পিয়ার। ও।

গেটে মিউজদের দিকে চাহিতে চাহিতে দূরে সরিয়া গেলেন

শেক্‌স্পিয়ার। চলুন, মিস্টার— ভাল কথা, আপনার নামটাই জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

মিল্টন। জন মিল্টন।

শেক্‌স্পিয়ার। চলুন মিস্টার মিল্টন, একটু অগ্রসর হওয়া যাক। ও কি, আপনি খোঁড়াচ্ছেন কেন ?

মিল্টন। গাউট আছে আমার।

উভয়ে অপসৃত হইলেন। গান করিতে করিতে বিদ্যাপতির প্রবেশ

বিদ্যাপতি। কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়ে আদি অবসানা

তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর-লহরী সমানা।

বিপরীত দিক দিয়া চণ্ডীদাসের প্রবেশ

চণ্ডীদাস। ওই, বিদ্যাপতি নাকি হে ?

বিদ্যাপতি। [সবিস্ময়ে] চণ্ডীদাস !

চণ্ডীদাস। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

বিদ্যাপতি। তার মানে ?

চণ্ডীদাস। এ দেবলোকেও তোমাকে দেখে যতটা আনন্দ পেলাম, এমন আর কিছুতে পাই নি ভাই, এমন কি ওই দেবীদের দেখেও না।

বিদ্যাপতি। তবু চল, তামাসাটা দেখাই যাক।

চণ্ডীদাস। হ্যাঁ, দেখতে হবে বইকি।

উভয়ে সরিয়া গেলেন। গল্প করিতে করিতে শেলী ও কীট্‌স প্রবেশ করিলেন। শেলী তাঁহার দীর্ঘ অবিন্যস্ত চুলে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিয়া সেগুলিকে আরও অবিন্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন

কীট্‌স। সত্যি ?

শেলী। হ্যাঁ, সত্যি। এরিয়েল ডুবে গেল, আমি তলিয়ে গেলাম, তোমার কবিতার বইটা পকেটে ছিল আমার, তারপর কিছুদিন পরে ভেসে উঠলাম ; বায়রন, লে হান্ট, ট্রেলনি সমুদ্রের ধারে চিতা সাজিয়ে আমার শবটাকে মদে ভিজিয়ে পুড়িয়ে ফেললে।

কীট্‌স। পুড়িয়ে ফেললে ?

শেলী। পুড়িয়ে ফেললে।

কীট্‌স। কিন্তু তুমি তো ঠিক তেমনিই আছে দেখছি।

শেলী হাসিয়া উঠিলেন

শেলী। ওরা পাগল, তাই পোড়াবার চেষ্টা করেছিল আমাকে। আগুনকে কখনও পোড়ানো যায় ?

[কীট্‌সের চিবুক ধরিয়া] অ্যাডোনিস কখনও মরে ? [সহসা]

হ্যাঁ, একটা কথা শুনেছ? প্রমেথিউস আবার বন্দী হয়েছে, আবার ঈগলে তার লিভার ছিঁড়ে খাচ্ছে।

কীট্‌স। তাই নাকি?

শেলী। খবরটা পেয়েই আমি জিউসের খোঁজে যাচ্ছিলাম।

কীট্‌স। কেন, জিউসের কাছে কেন?

শেলী। এবার জিউস তাকে বন্দী করে নি, করেছে ম্যামন। আমি ভাবছি, প্রমেথিউস ক্যান নেভার বি বাউণ্ড ব'লে আর একটা কবিতা লিখব।

কীট্‌স। কিন্তু এখানে ছাপাখানা আছে কি?

শেলী। সেইজন্যেই তো জিউসের কাছে যাচ্ছিলাম, তাঁকে বলব একটি সুন্দর পাখী সৃজন করুন আপনি, সোনার মত তার পালকের রং হবে, প্রবালের মত চঞ্চু, নীলকান্তমণির মত চোখ, কণ্ঠস্বর হবে অর্ফিউসের বাঁশীর মত, সেই পাখী আমার কবিতা গেয়ে বেড়াবে পৃথিবীর আকাশে আকাশে।

কীট্‌স। [উৎসাহিত] চমৎকার হবে, কি বললেন জিউস?

শেলী। জিউসের কাছে যাওয়া হ'ল কই, এদের গান শুনে চ'লে এলাম। এরা কে বল তো?

কীট্‌স। জানি না। মনে হচ্ছে, যেন একটা নূতন ধরনের গ্রীসিয়ান আর্ন জীবন্ত হয়ে উঠেছে আকাশপটে।

শেলী। যা বলেছ, চল, আর একটু এগিয়ে ভাল ক'রেই দেখা যাক।

উভয়ে চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ ওমর খৈয়াম প্রবেশ করিলেন। চলনে, দৃষ্টিতে, হাস্যে, গমনভঙ্গিমায় পাকা এপিকিউরানকে চেনা যাইতেছে। আকাশের দিকে চাহিয়া সহাস্য ভ্রূভঙ্গিসহকারে সুন্দরীদের একে একে তিনি নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার পর দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন

ওমর খৈয়াম। শুধু কতকগুলো রঙিন পেয়ালা! সরাব কই?

মাথা নাড়িলেন, শুভ্র দাড়িতে একবার হাত বুলাইলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। ক্ষণপরেই অবনত মস্তকে চিন্তাকুল আননে কালো ফ্রক কোট ও পাঁশুটে রঙের ট্রাউজার পরিহিত আর এক ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রশস্ত শুভ্র উন্নত ললাট, রক্তাভ কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশদাম, রোম-লেশ-হীন পরিচ্ছন্ন মুখমণ্ডল, সুবর্ণ লোহিতাভ প্রতিভা-তীক্ষ্ণ চক্ষু, দৃঢ়নিবদ্ধ বঙ্কিম ওষ্ঠাধর। ভিক্টর হিউগো

হিউগো। রোবেস্‌পেয়ার! রোবেস্‌পেয়ারের মতটাই কি ঠিক?

খানিকক্ষণ আনত-আননে চিন্তা করিলেন

বিদ্রোহ? ভেঙে ফেলাটাই কি সব সময়ে সমীচীন? কিন্তু এ কি—

সহসা মিউজদের সঙ্গীত থামিয়া গেল। একটা দূরাগত গম্ভীর বজ্রনির্ঘোষ ক্রমশ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে এক বিরাট ঈগলবাহিত স্বর্ণ-সিংহাসন ঊর্দ্ধলোক হইতে নামিয়া আসিল। সিংহাসনে সৌম্যমূর্ত্তি বজ্রপাণি আকাশ-দেবতা জিউস বসিয়া আছেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থেমিস, ইউরিনোম, ডেমেটার, পার্সিফোন, নেমোসাইন, লেটো, অ্যাপোলো, ডিওনি, অ্যাফ্রোডাইট এবং এথেনা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অ্যাপোলোর হাতে লরেলের একটি মুকুট (ডায়াডেম) রহিয়াছে। মিউজগণ এবং ডায়ানাও আসিয়া ইঁহাদের সহিত যোগ দিলেন ও জিউসের সিংহাসনের দুই পার্শ্বে সারিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে সমাগত কবিগণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইলেন। হোমার ও মিল্টন কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু সঙ্গীত বন্ধ হইয়া যাওয়াতে তাঁহারা উভয়েই উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন

জিউস। হে শ্রেষ্ঠ কবিগণ, আজ এক বিশেষ কারণে আপনাদের সকলকে একত্রিত করেছি, পৃথিবীর সমূহ বিপদ সমুপস্থিত, ক্ষিপ্ত মানবগণ নৃশংস হিংস্রতায় পুনরায় সভ্যতাকে ক্ষতবিক্ষত ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলছে, জল স্থল অন্তরীক্ষ কোথাও শান্তি নেই। আপনারা কবি, আপনারা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, আপনারা নিয়ামক, আপনারাই মানব-সমাজের প্রকৃত নেতা। আপনারা এক সভা আহ্বান ক'রে এর প্রতিবিধানের চেষ্টা করুন। এ যুদ্ধ নিবারণ করা দেবতার সাধ্যাতীত, কারণ দেবতার প্রতি মানবেরা আস্থা হারিয়েছে। সুন্দরীশ্রেষ্ঠা অ্যাপোলো-জননী লেটোর অভিমত—আপনাদের সাহায্য ব্যতীত এ সমরানল নির্ব্বাপিত করা অসম্ভব। শ্রীযুক্তা লেটোর ধারণা সুস্থ অসুস্থ সর্ব্বপ্রকার মানবই এখনও আপনাদেরই বশীভূত। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা এ বিষয়ে যত্নশীল হোন। এইবার সভাপতি নির্ব্বাচন করা যাক তা হ'লে। এ সভার সভাপতি-পদ কে অলঙ্কৃত করবেন? এথেনা, তুমি কি বল?

এথেনা। হোমার।

নেমোসাইন। হোমারকে এ সভার সভাপতি নির্ব্বাচন করা আমাদের

পক্ষে অশোভন হবে, সকলে বলবে, আমরা পক্ষপাতিত্ব করেছি। আমি বাল্মীকির নাম প্রস্তাব করি।

থেমিস। আমার মতে এ সভায় বাল্মীকি অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি উপনিষদের ঋষি। উনিই ভারতীয় সভ্যতার প্রতীক।

ইউরিনোম। আমি বেদব্যাসকে আহ্বান করছি।

অ্যাফ্রোডাইট। আমার কিন্তু পছন্দ মহাকবি কালিদাসকে। নর-নারীর সুখ-দুঃখের কবি উনি।

ডেমেটার। পৃথিবীর সুখ-দুঃখ, পৃথিবীর সভ্যতা নির্ভর করে কৃষকদের উপর। সুতরাং জর্জিক্সের কবি ভার্জিলকেই আমি সভাপতি-পদে বরণ করতে চাই।

প্রথম মিউজ। চণ্ডীদাসও গ্রাম্য কবি, ওঁর সুমিষ্ট সঙ্গীতে পাষাণও বিগলিত হয়, উনি ইচ্ছে করলে অনায়াসে এ কলহ নিবারণ করতে পারেন, এ সভার উনিই নেতা হোন।

দ্বিতীয় মিউজ। বিদ্যাপতিই বা কিসে কম?

পার্সিফোন। তোমরা একটা বিষয়ে ভুল করছ, মধুরকণ্ঠ হ'লেই হবে না শুধু। যে পৃথিবী নরকে পরিণত হয়েছে, তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে স্বর্গ-সুষমা দান করতে হবে। কমেডিয়ার কবি দান্তে ছাড়া এ কাজ আর কেউ পারবেন না। তিনি শুধু কবি নন, যোদ্ধাও, যুদ্ধেরও অভিজ্ঞতা আছে তাঁর।

ষষ্ঠ মিউজ। জীবন-দর্শনের মহাকবি ওমর খৈয়ামকে আমি অভিবাদন করি। তিনিই এ ভার গ্রহণ করুন।

তৃতীয় মিউজ। স্বর্গ নরক স্বপ্ন বাস্তব বহুবিধ মানবের বহুবিধ সুখ-দুঃখ-আশা-আশঙ্কা বহুকালাবধি যিনি রঙ্গমঞ্চে মূর্ত্ত করেছেন, সেই শেক্স্পিয়ার থাকতে আর কি কারও সভাপতি হওয়া সম্ভব?

চতুর্থ মিউজ। গম্ভীর উদাত্ত সুরে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যিনি স্বচ্ছন্দে বিহার করেছেন, যিনি জীবনে কখনও কোন অন্যায়ের সমর্থন করেন নি, যাঁর নৈতিক আদর্শ মাউণ্ট অলিম্পাসের মতই ঋজু ও সমুন্নত, সেই মহাকবি মিল্টনকেই আমি এই সভায় সভাপতি-পদে বিভূষিত করতে অনুরোধ করি।

লেটো। আমি কিন্তু বরণ করতে চাই, কবি নাট্যকার দার্শনিক গেটেকে। তাঁর নাট্য-প্রতিভা যুগান্তকারী, গীতিকবিতা সুধা-নিষ্যন্দী, দর্শন চিরন্তন সত্য-সন্ধানী। তিনি শুধু ভাব-বিলাসী কবি নন, তিনি কৌতূহলী বৈজ্ঞানিকও। কৃষিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, খনিজবিদ্যা সমস্তই আজীবন চর্চ্চা করেছেন তিনি, বহু দেশে ভ্রমণ করেছেন, যুদ্ধ করেছেন স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে, রাজ্যশাসন করেছেন ডিউকের সহচররূপে—তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি আর কে আছেন এ সভায় ?

পঞ্চম মিউজ। কিন্তু এই যুদ্ধের কারণ বৃদ্ধ কুচক্রীদের স্বার্থপরতা। আমাদের আদর্শ যৌবন, প্রেম, মুক্তি, আর সে আদর্শের ধ্বজাবাহক মহাকবি শেলী। শেলী ছাড়া এ আদর্শ আর কে প্রচার করতে সক্ষম, তা তো আমি জানি না।

ডায়ানা। কীট্‌স।

ষষ্ঠ মিউজ। (সশ্লেষে) কেন, উনি এন্‌ডিমিয়নের কবি ব'লে ?

সপ্তম মিউজ। আমি আহ্বান করছি ওই উন্নতললাট প্রতিভা-প্রদীপ্ত ফরাসী মহাকবি ভিক্টর হিউগোকে। উনি শুধু শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক নন, উনি দীনদরিদ্রের বন্ধু, স্বাধীনতা-মন্ত্রের উদ্গাতা, ফ্রেঞ্চ রেভলুশনের কবি।

ষষ্ঠ মিউজ। ওঁর মতের ঠিক নেই, উনি প্রথমে রয়ালিস্ট ছিলেন।

জিউস। [আদেশের ভঙ্গিতে] তর্ক ক'র না ইরাটো।

ষষ্ঠ মিউজ চুপ করিল

জিউস। [কবিগণকে] আপনাদের কারও যদি কিছু বলবার থাকে বলুন।

উপনিষদের ঋষি। যে অদ্বিতীয় প্রচ্ছন্নাভিপ্রায় পরম পুরুষ নানা শক্তি-যোগে নানা বিষয়ের সৃষ্টি করেন, একমাত্র তিনিই এ বিরোধের অবসান করতে পারেন। সেই পরম পুরুষের প্রেরণা-লাভ সাধনা-সাপেক্ষ, সভা ক'রে তা হবে না।

জিউস। [সবিস্ময়ে] কি ক'রে জানলেন ?

উপনিষদের ঋষি। [দৃঢ় প্রতীতি সহকারে]—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

সকলে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন

জিউস। আর কেউ কিছু বলবেন ?

হোমার। আমি এ দায়িত্ব নিতে অক্ষম। আমার বক্তব্য আমি আমার কাব্যে ব'লে এসেছি, তার বেশি আমার আর বলবার কিছু নেই। মর্ত্ত্যবাসীরা আমাকে অন্ধ ক'রে দিয়েছিল, তাদের সংস্রবে যাওয়ার বাসনাও নেই আমার।

বাল্মীকি। মর্ত্ত্যের যে স্মৃতিটি কাঁটার মত আমার মর্ম্মমূলে বিঁধে আছে, সেটি সুখস্মৃতি নয়।

জিউস। কেন, কি হয়েছিল ?

বাল্মীকি। আমার সীতাকে স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করেছিলাম, তবু সে চিরদুখিনী, তবু তাকে পাতালপ্রবেশ করতে হ'ল। মর্ত্ত্যের ব্যাপারে লিপ্ত থাকতে অনুরোধ করবেন না আমাকে।

বেদব্যাস। কবিগুরু বাল্মীকি যে ভার নিতে পরাঙ্মুখ, আমি সে ভার নিতে যাব কোন্ সাহসে ? আমাকে ক্ষমা করুন আপনারা।

জিউস। কালিদাস ?

কালিদাস। [সকাতরে] পাত্রস্থ তৈল ও বর্ত্তিকা নিঃশেষ হ'লে উষাকালীন দীপশিখা যেরূপ নির্ব্বাণোন্মুখ হয়, আমারও সেই দশা, অন্ধকার বিদূরিত করবার সামর্থ্য নেই আমার।

ভার্জিল। আমারও নেই। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস, মানুষ চিরকালই পৃথিবীতে মারামারি কাটাকাটি করবে, ওসব হট্টগোল থেকে দূরে স'রে থাকাই ভাল।

জিউস। এ ধারণা কেন হ'ল আপনার কবি ?

ভার্জিল। অভিজ্ঞতা থেকে।

জিউস। চণ্ডীদাস, আপনি ?

চণ্ডীদাস। প্রণয়-কলহ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার কলহের সমাধান করবার কৌশল আমার জানা নেই।

বিদ্যাপতি। রাজা শিবসিংহ আর লছিমা দেবী যদি জীবিত থাকতেন, তা হ'লে তাঁদের সাহায্যে হয়তো আমি কিছু চেষ্টা করতে পারতাম। তাঁদের অবর্ত্তমানে মর্ত্ত্যের ব্যাপারে আমি অসহায়।

দান্তে। মর্ত্ত্যের ব্যাপারে আমার বহু অভিজ্ঞতা আছে। ঘিবেলাইনদের পক্ষ নিয়ে গুয়েলফ্‌দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে পোপ অষ্টম বনিফিসের কিছু পরিচয় পেয়েছি, বিয়াঙ্কি আর নেরিদেরও চিনি, নির্ব্বাসনে লর্ড অফ ভেরোনার বাড়িতে পরভৃতের মত সসঙ্কোচে বাস ক'রে এসেছি, গুইডো নোভেলের চাকরিও করেছি কিছুদিন; আমার ডি মনার্কিয়া বইখানাতে লীগ অফ নেশনের আভাস দিয়েছিলাম, সেখানা কার্ডিনাল নোল্‌গেট পুড়িয়ে দিয়েছে শুনেছি, এর পর আমার কাছ থেকে আর কি আশা করেন আপনারা? আমার জীবনের যা আদর্শ, মর্ত্ত্যে তার কোন মূল্য নেই।

শেক্‌স্পিয়ার। মর্ত্ত্যের থিয়েটারে তার মূল্য আছে। আদর্শবাদী ব্রুটাস, আদর্শবাদী হ্যাম্‌লেট নিজেরা মরেছিল বটে, কিন্তু থিয়েটার খুব জমেছিল। কিন্তু আমার দল ভেঙে গেছে, থিয়েটারও আর আমি জমাতে পারব না।

ওমর খৈয়াম। আমারও সেই দশা। সেই সাকী, সেই সরাব, সেই গোলাপ, সেই বুলবুল, সেই সরাইখানা কিছু নেই। হোটেল রেডিও সিনেমার যুগে আমি অচল।

জিউস। মহাকবি মিল্টন?

মিল্টন। মর্ত্ত্যে আমার জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছিল কবিতা লিখে নয়, ক্রম্‌ওয়েলের চিঠির ল্যাটিন তর্জ্জমা ক'রে এবং ধর্ম্ম আর রাজনীতি নিয়ে প্যাম্‌ফ্লেট লিখে। [হাসিলেন] সে সুখও অবশ্য বেশি দিন থাকে নি, প্রোটেক্‌টরেটের পর রেস্টোরেশন এসেছিল, হাতে হাতকড়ি পড়েছিল, জরিমানা দিতে হয়েছিল। [সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া] যেখানে বিবাহিতা স্ত্রী পালিয়ে যায়, মেয়ে বাপকে যন্ত্রণা

দেয়, স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবার যুক্তি দেখিয়ে এরিওপ্যাজেটিকা লেখতে হয়, সেখানে—

> Which way I flie is Hell, my self an Hell
> And in the lowest deep a lower deep
> Still threatening to devour me opens wide.

অভিভূত হইয়া থামিয়া গেলেন

গেটে। আমি এবার উঠি।

জিউস। এ বিষয়ে কিছু ব'লে যান।

গেটে। [হাই তুলিয়া] আমি দার্শনিক স্পাইনোজার শিষ্য, আমি প্রকৃতির উপাসক। প্রকৃতি মানুষকে যে পথে নিয়ে চলেছে, তাতে বাধা দেবার আমার প্রবৃত্তিও নেই, সামর্থ্যও নেই। [শেলীকে দেখাইয়া] এঁরা তরুণ, এঁরা হয়তো কিছু—

শেলী। আমি বর্ত্তমানে বাস করি না, আমি বাস করি ভবিষ্যতে। যে ঝ'ড়ো হাওয়া শুষ্ক শীর্ণ পীত বিবর্ণ পাতার রাশিকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে ধ্বংসের মুখে, সেই ঝ'ড়ো হাওয়াই সঙ্গে সঙ্গে বপন ক'রে চলেছে নূতন সৃষ্টির বীজ। আমি ভবিষ্যতের শ্যামস্নিগ্ধ কোমল কিশলয়দের দেখতে পাচ্ছি। যুদ্ধ নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজনই নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে ভবিষ্যতে।

জিউস। [কীট্‌সকে] আপনিও কি কিছু করবেন না মর্ত্ত্যের জন্যে, যাকে এত ভালবাসতেন একদিন ?

কীট্‌স। ব্ল্যাক্‌উড ম্যাগাজিনখানা কি এখনও আছে মর্ত্ত্যে ?

জিউস। আছে।

কীট্‌স। তা হ'লে আমি মর্ত্ত্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না। আমি দূর থেকেই তার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকব।

হিউগো। সেই ভাল। আমি ওদের মুক্তির জন্যে কি না করেছি ? নাটক, উপন্যাস, কাব্য, বক্তৃতা কিছু বাকি রাখি নি—কিন্তু ফল হয়েছে কি ? আমার একজন জীবনীলেখক বলেছেন যে, আমার

ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশন সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস থিয়েটারি উচ্ছ্বাস মাত্র! আমার আর প্রবৃত্তি নেই ওসবে।

জিউস। আপনারা সকলেই যদি অসম্মত হন, তা হ'লে আমাকে নিজের রাজকীয় ক্ষমতা ব্যবহার করতে হবে। [অ্যাপোলোকে] অ্যাপোলো, তোমার যাকে খুশি সভাপতি কর। দাও, ডায়াডেম পরিয়ে দাও।

ময়ূরের পক্ষবিধূনন-শব্দ শোনা গেল। ঝড়ের বেগে হেরা দেবী প্রবেশ করিলেন

জিউস। অ্যাপোলো, সভাপতি বরণ কর।

হেরা। না, করবে না। আমি আকাশের সম্রাজ্ঞী, আমার আদেশ ব্যতীত অ্যাপোলো কিছু করতে পারে না।

জিউস। বেশ, তুমিই আদেশ দাও।

হেরা। দেব না, এঁদের একজনকেও পছন্দ নয় আমার।

জিউস। একজনকেও না?

হেরা। [তীব্রকণ্ঠে] না না, কাউকে নয়। সার্ব্বজনীন উদার দৃষ্টি এঁদের কারও নেই। একজনের আছে জানি, কিন্তু তিনি—

সহসা চতুর্দ্দিক ইন্দ্রধনুবর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সপ্তাশ্ব-বাহিত হিরণ্ময় অরুণ-রথে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করিলেন। সকলেই সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। অ্যাপোলো নির্নিমেষে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর নির্ভীক পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া তাঁহার মস্তকে লরেলের মুকুট পরাইয়া দিলেন। হেরা মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন, বাধা দিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ। [সবিস্ময়ে] এ কি, এখানেও সভা নাকি!

চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। তাহার পর সহসা এতগুলি বিখ্যাত কবিকে একত্রিত দেখিয়া বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং ক্ষণপরেই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া অভিজাত-সুলভ শ্রদ্ধাভরে সকলকে প্রণাম করিলেন

যবনিকা

"বনফুল"

চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে অল্প পরিসরে কিছু বলা সম্ভব নয়। কিছুদিন পূর্ব্বে এ বিষয়ে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তার মূল কথাগুলি এই।—(১) রবীন্দ্রনাথ ছবি এঁকেছেন খাঁটি ইউরোপীয় পদ্ধতিতে, সুতরাং তাঁর ছবি বোঝবার যাঁরা চেষ্টা করবেন, তাঁদের পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের ক্রমবিকাশ জানতে হবে। (২) ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসরণ করলেও তাঁর সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, শিল্প-ইতিহাসের পর পর স্তরগুলি সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল না, অথচ ছবিগুলি দেখলে বোঝবার উপায় নেই যে, তিনি অনভিজ্ঞ ছিলেন; তাঁর কল্পনার অসামান্য ছন্দোময় শক্তিতে তিনি রেখা ও রঙের ব্যবহার আশ্চর্য্য রকমে আয়ত্ত করেছিলেন। এই নিয়ম-মাফিক শিক্ষার অভাব হেতু কোন কোন ক্ষেত্রে পতন ঘটেছিল তাঁর। যাঁরা তাঁর চিত্র-সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন, এই দিকে তাঁরা সজাগ থাকলে ভাল হ'ত। আশ্চর্য্য সক্ষমতার সঙ্গে অক্ষমতার মিলন দৃষ্টিকটু। সম্পূর্ণ কল্পনা থেকে আঁকা অবাস্তব ছবির মধ্যে এখানে ওখানে রিয়ালিস্টিক ছোঁয়াচ লাগাতে রসাভাস হয়েছে। (৩) রবীন্দ্রনাথের ছবি বড় তাঁর সবলতার জন্যে ছন্দবোধের জন্যে, যে বস্তু দুটির অভাব বাংলা দেশের আজকালকার ছবিতে প্রত্যক্ষ করি। ছবি দেখলেই বোঝা যায় যে, তিনি সতেজ শক্ত শিরদাঁড়া নিয়ে কারবার করেছেন। (৪) রবীন্দ্রনাথের ছবিতে সব চাইতে বিস্ময়কর, তাঁর কল্পনার বিরাটত্ব। সর্ব্বত্রই দেখি, তিনি বৃহৎকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন।

সেই প্রবন্ধে আরও অনেক-কিছু দোষ-গুণের আলোচনা করেছিলাম। তাঁর মৃত্যুর তিন চার মাস আগেকার লেখা হ'লেও আমার সৌভাগ্য এই যে, তিনি সেটি প'ড়ে আনন্দিত হয়েছিলেন এবং পত্রযোগে সে কথা আমাকে জানিয়েছিলেন। সেই পত্রটি আমি এখানে মুদ্রিত করলাম।—

শান্তিনিকেতন, ২৫।৫।৪১

কল্যাণীয়েষু,

এখনো আমি শয্যাতলশায়ী। এই অবস্থায় আমার ছবি সম্বন্ধে তোমার লেখাটি পড়ে আমি বড় আনন্দ পেয়েছি। আমার আনন্দের

বিশেষ কারণ এই যে আমার ছবি আঁকা সম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র নিঃসংশয় নই, আজ সুদীর্ঘকাল ভাষার সাধনা করে এসেছি, সেই ভাষার ব্যবহারে আমার অধিকার জন্মেছে এ আমার মন জানে এবং এই নিয়ে আমি কখনো কোনো দ্বিধা করিনে। কিন্তু আমার ছবির তুলি আমাকে কথায় কথায় ফাঁকি দিচ্ছে কিনা আমি নিজে তা জানিনে। সেইজন্যে তোমাদের মতো গুণীর সাক্ষ্য আমার পক্ষে পরম আশ্বাসের বিষয়। যখন প্যারিসের আর্টিষ্টরা আমাকে অভিনন্দন করেছিলেন তখন আমি বিস্মিত হয়েছিলুম এবং কোন্‌খানে আমার কৃতিত্ব তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। বোধ করি শেষ পর্যন্তই তুলির সৃষ্টি সম্বন্ধে আমার মনে দ্বিধা দূর হবে না। আমার স্বদেশের লোকেরা আমার চিত্রশিল্পকে যে ক্ষীণভাবে প্রশংসার আভাস দিয়ে থাকেন আমি সেজন্য তাঁদের দোষ দেইনে। আমি জানি চিত্রদর্শনের যে অভিজ্ঞতা থাকলে নিজের দৃষ্টির বিচারশক্তিকে কর্তৃত্বের সঙ্গে প্রচার করা যায়, আমাদের দেশে তার কোনো ভূমিকাই হয়নি। সুতরাং চিত্রসৃষ্টির গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে পারেন না বলেই মুরুব্বিয়ানা করে সমালোচকের আসন বিনা বিতর্কে অধিকার করে বসেন। সেজন্য এদেশে আমাদের রচনা অনেকদিন পর্যন্ত অপরিচিত থাকবে। আমাদের পরিচয় জনতার বাহিরে তোমাদের নিভৃত অন্তরের মধ্যে। আমার সৌভাগ্য এই বিদায় নেবার পূর্বেই নানা সংশয় এবং অবজ্ঞার ভিতরে আমি তোমাদের সেই স্বীকৃতি লাভ করে যেতে পারলুম এর চেয়ে পুরস্কার এই আবৃত দৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না, এই জন্যে তোমাকে অন্তরের সঙ্গে আশীর্বাদ করি এবং কামনা করি তোমার কীর্তির পথ জয়যুক্ত হোক। ইতি

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে যথোপযুক্ত আলোচনা এখনও হয় নি। সে কাজ করতে হ'লে ইউরোপীয় শিল্প সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ব্যক্তির প্রয়োজন। যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন অন্ধভক্তি এবং অকারণ বিরূপতা এই দুয়ের মধ্যে শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে দোল খেতে হবে।

শ্রীযামিনী রায়

রবীন্দ্রনাথের ছবি

পূর্ণিয়া

২৭শে ভাদ্র ১৩৪৮

প্রিয় সজনী ভায়া

লেখার দিন ত' শেষ হয়ে গেছে—দেখাটা এখনো যায় নি। আজ 'শনিবারের চিঠি'র ভাদ্র সংখ্যায়—তোমার "সংবাদ সাহিত্য" শেষ করে বড়ই শান্তি পেলুম। তোমার ৭ দফা যেমন সময়োচিত, তেমনি সুন্দর, সুষ্ঠু ও সুলিখিত। এটি যে কত দরকার ছিল তা, বেশ বুঝতে পারছি। মস্ত কাজ করেছ,—বড় সুখী হলাম। তুমিও সুখী হও।

তোমার "রবীন্দ্র সংখ্যা"র বিজ্ঞাপনটি "গণ্ডীর" মধ্যে থাকায়, এড়িয়ে গিয়েছিল। এ বয়সে বেড়া দেখলে—এড়িয়ে চলাই সামর্থ্যহীনের উচিত, আইনেরও ভয় থাকে। পাতা ওলটাতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ে গেল। লেখা আছে—"রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি ছবিও থাকবে যা কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।"

সম্ভবত তাঁর নিজের আঁকা ছবির কথা। তা যদি হয়, আমার কাছে তাঁর নিজের আঁকা ছবি সম্বন্ধে লেখা একখানি পত্র আছে। যদি কাজে লাগে মনে করো এবং সময় থাকে, তো ব্যবহার করতে পারো,—পাঠালুম। অন্য সামর্থ্য তো নেই।—ভালোবাসাই জানাই।

তোমাদের

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন

প্রীতিনমস্কার

শরীর সম্বন্ধে তুমি যে আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে লেগেছ এটা আমার একটুও ভালো লাগল না। আমার অনুপস্থিতি কালে তুমি শান্তিনিকেতনে এসেছিলে এতে তোমার কর্ত্তব্য অসমাপ্ত রয়ে গেল—আমি বর্ত্তমান থাকতে আর একবার এসে পালাটা সাঙ্গ করে যাও। আমার কাছে ছবির দরবার জানিয়েচ—এটা অভাবনীয়। হঠাৎ একটা খ্যাতি লাভ করেছি কিন্তু সেটা রক্ষা করতে হলে অত্যন্ত সাবধান হওয়া চাই। যতক্ষণ না আমার এই শেষ বয়সের আকস্মিক খেয়ালের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় ততক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারব—তারপর থেকে আর পালাবার পথ থাকবে না। তবু চেষ্টা করে দেখতুম কিন্তু আমার ছবি আঁকার কলম আমার হুকুম মেনে চলে না—আমার আঙুলকে তার হাতে নিবেদন করে বলি "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" তার পর আপন খেয়ালে যা হয় কিছু একটা করে বসে।

তোমার কোষ্ঠির ফলাফল সম্বন্ধে তোমাকে একখানা পত্র নিশ্চয়

লিখেছিলুম—পেলে খুসি হ্তে, তোমার কোষ্ঠিতে ওটা কোন গ্রহের কবলে বিলুপ্ত হয়েচে। কাশীর কিঞ্চিৎ অমিয়র হাত ঘুরে আমার হাত পর্য্যন্ত পৌচেছে বলে বিশ্বাস করিনে।

ডাক্তার বৈদ্য আমার প্রতি নানাবিধ নিষেধের ব্যবস্থা করেচে—না মেনেও বেঁচে আছি, মানলেও মৃত্যুর হাত এড়াবার জো নেই—সান্ত্বনা এই যে সত্তর পর্য্যন্ত টিঁকে আছি—আরো যদি মেয়াদ না বাড়ে তো নালিশের কারণ নেই। ইতি ৭ মার্চ্চ ১৯৩১

অনুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিজ্ঞপ্তি

'পিনাঙে রবীন্দ্রনাথ' ছবিটি শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কে অনেক ভাল রচনা ও উপকরণ আমাদের হাতে আসিয়াছে, এই সংখ্যায় তাহার সকলগুলির ব্যবহার সম্ভব হইল না। সুতরাং 'শনিবারের চিঠি'র আগামী কার্ত্তিক সংখ্যা প্রধানত "রবীন্দ্র-সংখ্যা" হইবে। "প্রসঙ্গ কথা" ও "সংবাদ-সাহিত্য" বিভাগে আমরা অশৌচান্তে নিয়মভঙ্গ করিব।

"রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী"তে তাড়াতাড়ির জন্য অনবধানতাবশত কয়েক ক্ষেত্রে ক্রমের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। আরও কয়েকটি পুস্তিকা আমরা পাইয়াছি। আগামী সংখ্যায় সংশোধন ও সংযোজন দিব। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন অনেকগুলি সংশোধন ও সংযোজন পাঠাইয়াছেন।

এই সংখ্যায় 'শনিবারের চিঠি'র ত্রয়োদশ বর্ষ শেষ হইল। কার্ত্তিক সংখ্যা পূজার পর ১লা কার্ত্তিক (ইংরেজী ১৮ই অক্টোবর) বাহির হইবে। এই আশ্বিন সংখ্যায় যাঁহাদের চাঁদা শেষ হইল, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক সডাক বার্ষিক মূল্য ৪৲ অথবা ষাণ্মাসিক মূল্য ২৲ কার্ত্তিক সংখ্যা বাহির হইবার পূর্ব্বেই পাঠাইয়া দিবেন। যাঁহারা টাকা পাঠাইবেন না, তাঁহাদের নামে কার্ত্তিক সংখ্যা এক বৎসর অথবা ছয় মাসের (যিনি যে ভাবে দিয়া আসিতেছেন) চাঁদার দাবিতে ভি. পি.-তে প্রেরিত হইবে। ভি. পি.-র দরুন গ্রাহকগণের অতিরিক্ত ৵০ খরচ পড়িবে। ব্রহ্মদেশবাসী গ্রাহকগণ দয়া করিয়া বার্ষিক ৪।০ অথবা ষাণ্মাসিক ২৵০ মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইবেন। ভি. পি.-তে পাঠাইলে আরও।৵০ অতিরিক্ত লাগিবে।

দ্বাদশ বর্ষের শেষ ছয় মাসের অর্থাৎ বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ষাণ্মাসিক সূচী কার্ত্তিক সংখ্যার সহিত প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস। শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত